আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
প্রবীর ঘোষ

ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের মধ্যে ফুটপাতের ভিখারি থেকে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী—সবই উপস্থিত। এঁদের যুক্তি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুব। আটপৌরে থেকে বিজ্ঞানের কূট-কচালি, সবই হাজির। গ্রন্থটিতে লেখক দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর থেকে অসাধারণ, তামাম যুক্তিকে সংগ্রহ ও হাজির করেছেন। তারপর, প্রতিটি ঈশ্বর-পক্ষীয় যুক্তিকে আবেগশূন্য নির্লিপ্ততায় শাণিত যুক্তি ও বিশ্লেষণে নস্যাৎ করেছেন।

'ভাববাদী' বা 'আধ্যাত্মবাদী' অথবা 'অলীক-কল্পনাবাদী'দের 'প্রাণ-ভোমরা' তিনটি 'মায়া পেটিকা'য় এতদিন সুরক্ষিত ছিল 'হুজুর' ও তার সহযোগী দৈত্যদের নিশ্ছিদ্র পাহারায়। মায়া পেটিকা তিনটি—'নিয়তিবাদ', 'আধ্যাত্মবাদ' ও 'ঈশ্বরবাদ'। চিরায়ত গ্রন্থ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের শাণিত যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করেছে যথাক্রমে 'নিয়তিবাদ' ও 'আধ্যাত্মবাদ'-এর মায়া পেটিকা। এ'বার শেষ লড়াই। এতদিনকার 'ঈশ্বর-বিশ্বাস' ও 'বিজ্ঞান'-এর লড়াই শেষ হতে চলেছে, ঈশ্বর বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী মনে করে—এই গ্রন্থটির প্রকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবীর সংস্কৃতির জগতে, মননের জগতে, ঈশ্বব বিশ্বাসের তামাম যুক্তির বিরুদ্ধে এমন অমোঘ খণ্ডন ও চরম আঘাত এই প্রথম। এখন আমরা সোচ্চারে ঘোষণা রাখতেই পারি—এতদিনে ভাববাদের সঙ্গে যুক্তির লড়াই শেষ হতে চলেছে, ভাববাদী বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

প্রবীর ঘোষ 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী-চিন্তা' আজ ব্যক্তি গণ্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে: আন্দোলিত হয়েছেন সমাজের লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী-সংস্থা, নাট্য-সংস্থা, বিজ্ঞান-ক্লাব সহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী-চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে।

আন্দোলিত হয়েছে সমাজের দর্পণ সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি। আজ বহু জনপ্রিয় লেখকের গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিরাজ করে প্রবীরের আদলে গড়া একটি চরিত্র, অথবা হাজির হয় বুজরুকি ফাঁসের কাহিনী। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে, কি সম্পাদকীয়তে বার বার ঘুরে ফিরে যে ভাবে 'যুক্তিবাদী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, মাত্র কয়েক বছর আগেও তা ছিল অকল্পনীয়। যুক্তিবাদী-চিন্তার এই সার্বজনীনতার পিছনে রয়েছে প্রবীরের জনগণকে আন্দোলনে শামিল করার দক্ষতা, আপসহীন লড়াই, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, বলিষ্ঠ লেখনী এবং চ্যালেঞ্জ, প্রলোভন ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নিরবচ্ছিন্ন জয়।

এ-সবই তাঁকে করেছে জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর সৃষ্টি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক', একটি দর্শন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দর্শন।

আমি কেন
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না

প্রবীর ঘোষ

AMI KENO ISHWARE BISWAS KORI NA
(Why don't I believe in God)
By Prabir Ghosh

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ১৯৯৬ মাঘ ১৪০২

প্রচ্ছদ : যুক্তিবাদী

দেবাশিস

রাজেশ

চির

সৈকত

রামকমল

বিষয় সূচি

ঈশ্বর বিশ্বাস : কিছু কথা

বইটির নাম 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না'। এখানে 'আমি' শুধুমাত্র লেখক নন। 'আমি' সেই আমজনতা, যাঁরা নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। 'আমি' সেই নিরীশ্বরবাদীদের প্রতীক, কোনও ব্যক্তিমাত্র নন।

মানুষ কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ? ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা তা নিয়ে নানা ধরনের যুক্তি হাজির করেন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে ফুটপাতের ভিখারি থেকে সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর গুরু থেকে 'নোবেল' বিজয়ী বিজ্ঞানী, সবই উপস্থিত। তাই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিও নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। আটপৌরে যুক্তি থেকে বিজ্ঞান-তত্ত্বের কূট-কচালি। এর কোনও একটি যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে 'নিরীশ্বরবাদী' বলে নিজেকে ঘোষণা করাটা যুক্তির দিক থেকে মোটেই সুবিবেচনার কথা নয়। পাশ না কাটিয়ে পাশ করতে হলে খুব জরুরী কাজটা হল—ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পক্ষের ছোট-বড় সমস্ত যুক্তিকে সংগ্রহ করা। তারপর থাকে প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডনের প্রশ্ন।

ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি সংগ্রহে আন্তরিক ছিলাম, এ বিষয়ে আমার সহযোদ্ধারা অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। প্রতিটি যুক্তিই খণ্ডিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য। নতুবা একজন যুক্তিবাদী হবার সুবাদে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে বাধ্য হতাম। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে হাজির করা যুক্তির বাইরে বাস্তবিকই আর কোনও যুক্তি আপনার জানা থাকলে আমাকে জানান। আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকব। পরবর্তী সংকলনে সে যুক্তি হাজির করব এবং খণ্ডন করব, এই প্রত্যয় রাখি। খণ্ডনে ব্যর্থ হলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত শাখা সংগঠন, শাখা গণসংগঠন ও সহযোগী সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ

করে দেবে। এটা আমার কোনও ব্যক্তিগত হঠকারি সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের কার্যকরী সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্ত। আর কেউ যদি ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখান, সেটা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ মেনে নিয়ে ঝাঁপ বন্ধের প্রতিজ্ঞায় অটল রইলাম। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মৃত্যুর জন্য এই চ্যালেঞ্জ ভয়ংকর হলেও অতি প্রয়োজনীয় ছিল।

ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে কোনও একটি যুক্তি খন্ডনে ব্যর্থ হলে যুক্তিবাদী হবার সুবাদে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতাম—এ'জাতীয় কথা শুনে কেউ যদি বিষম খান, তো তাঁর উদ্দেশে বলি—কী মুশকিল, আমরা তো ভাববাদী বা অলীক কল্পনাবাদীদের মত শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্যকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়ে স্থবির বা অনড় নই। যুক্তিবাদীরা নমনীয়। যে দিকে যুক্তি, সেদিকেই ঝুঁকে পড়েন। যুক্তিবাদীরা বর্তমানের সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আজ যা বলেন, আগামীকালের বাড়তি তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আজকের বক্তব্য বাতিল করার প্রয়োজন হলে আন্তরিকতার সঙ্গেই তা করেন। তবে যা করেন তা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই, 'ভবিষ্যতে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে যেতেও তো পারে'—এমনটা ভেবে করেন না।

যুক্তিবাদীরা অনমনীয়। অনমনীয় তাদের আদর্শের প্রতি। তাদের মূল্যবোধের প্রতি। একই সঙ্গে যুক্তি ও যুক্তিহীনতায় অবস্থান করে 'যুক্তিবাদী' হওয়া যায় না। মানুষের বিশ্বাসে আঘাত না দেওয়ার পক্ষে হাজারো অজুহাত হাজির করেও নয়। এ অজুহাতের আর এক নাম 'সুবিধাবাদ'।

কয়েকমাস আগে গণেশের দুধ খাওয়ার মত একটা তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা হাজির করতে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রচার-মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর এক মাস পরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘিরে গড়ে ওঠা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার-মাধ্যমগুলোর ইতিবাচক ভূমিকার জন্য তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

এর আগেও এ'দেশে কুসংস্কারের ঢেউ উঠেছে। আমজনতা উদ্বেল হয়েছে। প্রচার-মাধ্যমগুলো এ'বারের মত ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। এর আগেও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছে। প্রচার-মাধ্যমগুলো এ'বারের মত গ্রহণ নিয়ে কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হাজির হয়নি। এ'বার হয়েছে। কারণ, এখন জনগণ শুধু কুসংস্কারের কাঁথা জড়িয়ে উষ্ণতার স্বাদ নেয় না। জনতার একটা বড়-সড় মাপের অংশ কুসংস্কার বিরোধিতার মধ্যে প্রগতির উত্তাপকে অনুভব করে। জীবনের উত্তাপকে অনুভব করে।

জনমানসের এমন উত্তরণ একদিনে ঘটেনি। এটা একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠার ব্যাপার। আমজনতার একটা অংশ যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে একটু একটু করে পরিচিত হতে হতে কুসংস্কার বিরোধী হয়ে উঠেছেন। এই হয়ে ওঠার ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির লাগাতার প্রক্রিয়া ও অবদানকে স্বীকার না করে কোনও উপায় নেই। জনতার চাহিদা আছে। বিক্রি হবে। তাই প্রচার-মাধ্যমগুলো তাদের মালিকের শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষিত রেখে নানা সাজে বিক্রি করছে প্রগতিশীলতা। কারণ প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমই শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবসা। আর পাঁচটা ব্যবসার মতই।

প্রচার-মাধ্যমগুলোর নীতি নির্ধারণ করেন মালিক। মালিক প্রগতিশীলতা ও কুসংস্কার বিরোধিতাকে ততদূর পর্যন্তই এগিয়ে নিয়ে যাবে, যতদূর নিয়ে গেলে এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোর গায়ে আঁচটি লাগবে না। তাই গণেশের দুধ খাওয়া বা গ্রহণের ব্যাপার নিয়ে 'কাস্টমার'দের উত্তেজনার আগুন পোহানর ঢালাও ব্যবস্থা রাখলেও নিয়তিবাদ—অধ্যাত্মবাদ—ঈশ্বরবাদ বিষয়ে জনচেনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। কারণ বঞ্চিত মানুষদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করতে এই তিন 'বাদ'-এর জবাব নেই। পরিবর্তে আসবে নানা অজুহাত, কূট-কচালি—জনগণের বিশ্বাসকে আঘাত দেওয়া কতটা অযৌক্তিক—তা বোঝাবার নানা চেষ্টা। তার চেয়ে থাক না কিছু বিশ্বাস, আপন মনে, সঙ্গোপনে!

যুক্তিবাদী আন্দোলনের তরীতে জোয়ারের টান। পালে সুচেতনার দখিনা হাওয়া। তরতর চলমান আমজনতার প্রগতিশীল অংশ। সমাজ-কাঠামোর স্তম্ভগুলোয় নোনা ঢেউয়ের লাগাতার আঘাত। স্তম্ভের ফাটল রেখা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। সারাইয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। ময়দানে এখন বেশ কিছু 'যুক্তিবাদী' সংগঠন, 'যুক্তিবাদী' শব্দটা তো কারও একচেটিয়া নয়! 'ভাল্লাগে তাই ওমনি ওমনি ব্যবহার করি'—বললে কারও প্রত্যুত্তর দেওয়ার কিছু থাকে না। আমাদেরও নেই। এদের কাউকে 'স্পনসর' করছে রাষ্ট্রশক্তি, কাউকে বা বিদেশের ধনকুবেররা। সাম্যের সমাজ গড়ার লড়াই চালাবার অধিকার কারও একচেটিয়া নয়! রাষ্ট্রশক্তি ও তাদের চালিকা শক্তি ধনকুবেররা যদি রাজ্য-পাট ছেড়ে আমজনতায় সামিল হতে চায়—কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। আমাদেরও নেই। 'ভাল্লাগে তাই' ও 'স্পনসর পাওয়া' যুক্তিবাদীদের অনেকের উপরই প্রচার-মাধ্যমের 'স্পট-লাইট'। কাকে আলোকিত করবে, তা নির্বাচন করার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার-মাধ্যমগুলোর আছে। কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। আমাদেরও নেই।

কিন্তু প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারও অধিকার আছে 'সাদা'কে 'সাদা' ও 'কালো'কে 'কালো' বলার। আপনার অধিকার আছে অজুহাতের ঘেরাটোপে

ঈশ্বর ও আত্মার বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রেখে যারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষে জয়গান করে, তাদের 'অ-যুক্তিবাদী', 'সুবিধাবাদী', 'দ্বিচারী' বিশেষণে বিশেষিত করার। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করি, আপনারাই শেষ কথা বলার অধিকারি। আপনারাই ঠিক করে দিতে পারেন—'যুক্তিবাদ'-এর আর এক নাম 'সুবিধাবাদ' হবে, না 'যুক্তিবাদ' যুক্তিবাদেই থাকবে।

সংগ্রামী অভিনন্দন, আমার প্রেরণার উৎস প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, মেঘলা সময়ে।

প্রবীর ঘোষ

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

দশ ডিসেম্বর
উনিশ শো পঁচানব্বই

অধ্যায় ঃ এক

ঈশ্বর বিশ্বাস : কিছু বেয়াড়া আটপৌরে প্রশ্ন

কারণ ঃ এক
মাতৃস্নেহ, বন্ধু-প্রেমের মতই ঈশ্বর-প্রেমও কি একান্ত অনুভবের ব্যাপার ?

বেশ কয়েক বছর আগে এক হেমামালিনী-প্রেমে পাগল যুবক আমাকে একান্তে ফিস্‌ফিস্ করে জানিয়েছিলেন, প্রেম হল অনুভবের বিষয়, অন্তর দিয়ে গভীর অনুভবের বিষয়। আমি আর হেমা দু'জনে যে দু'জনকে ভালবাসি, এ'ভালবাসা কি চোখে দেখার, না ছুঁয়ে অনুভব করার ? এই যে আমি এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের দু'জনের প্রেমের কথা বললাম, অমনি হেমা কথাগুলো অনুভব করতে পারল। আর পেরেই আমাকে লক্ষ্য করে শূন্যে চুমু ছুঁড়ে দিল। আপনি দেখতে পেলেন ? না, ছুঁতে পেলেন ? কিন্তু আমি পেলাম, অনুভবে পেলাম। মায়ের স্নেহ, বন্ধুর ভালবাসা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না। তবু তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আমার-হেমার প্রেম সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

যুবকটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ চিন্তায় ফিরিয়ে আনতে মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। সঙ্গে ওকে বসিয়ে বেশ কয়েকটা সিটিং-এ বোঝাতে হয়েছিল--মায়ের স্নেহের বহিঃপ্রকাশ প্রতিটি দিনই নানাভাবে উৎসারিত হতেই থাকে। এই বহিঃপ্রকাশ কখনও পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া খাবারের থালায়, কখনও বা অসুস্থ কপালে রাখা হাতে। বন্ধুর ভালবাসা কখনও আপনার অসুস্থ বাবার জন্য হাসপাতালের বারান্দায় সতর্কতার সঙ্গে রাত জাগে, আক্রমণ থেকে আপনাকে বাঁচাতে মাথা ফাটিয়ে আসে। হেমার ভালবাসা একটি বার, শুধু

একটি বারের জন্যেও কি এভাবে বাস্তব রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ? একটি বারের জন্যেও এমনটি না ঘটে থাকলে একে বলতেই হবে 'কল্পনা'। এই 'কল্পনা'কে গভীরভাবে বিশ্বাস করাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলতে হয় 'মানসিক রোগ।'

যুবকটির নাম আজও মনে আছে। গৌরীশঙ্কর। 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসের নায়কের নামে নাম। তাই মনে আছে। পদবী কী ছিল, মনে নেই।

তারপর, অনেক দিন পর ২৮ ডিসেম্বর '৯৪ আনন্দবাজার পত্রিকায় জনৈক গৌরীশঙ্করের চিঠি পড়ে কিছুটা শঙ্কিত হলাম। পত্র-লেখক গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। ওই গৌরীশঙ্করের পদবী কী ছিল ? চট্টোপাধ্যায় ? হতেও পারে, নাও হতে পারে। দু'জনের বক্তব্যের কী আশ্চর্য রকম মিল!

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—মাতৃস্নেহ বা বন্ধুপ্রেমকে হাত দিয়ে ছোঁয়া বা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তার অস্তিত্ব কে অস্বীকার করবে ? ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এ হল অন্তরের সামগ্রী। অনুভবের ধন।

দু'জনের বক্তব্যে কী আশ্চর্য রকমের মিল! পার্থক্য শুধু কল্পনায় একজন হেমাকে বসিয়েছেন, একজন ঈশ্বরকে। আগের গৌরীশঙ্কর হেমা মাতোয়ারা হওয়ায় তাঁর আপনজনেরা পাগল ভেবে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই গৌরীশঙ্কর হেমার জায়গায় ঈশ্বরকে বসানোয় তাঁর আপনজনেরা পাগল না ভেবে পরম ঈশ্বরভক্ত ভেবে সন্তোষ লাভ করবেন। আমাদের এই সমাজে কত পাগল অবতার বলে পূজিত হয়ে আসছে। এই তো আমাদের ঐতিহ্য, এই তো আমাদের সংস্কৃতি! গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কী হবে ? আমি শঙ্কিত।

O

আমাদের এই সমাজে কত পাগল অবতার বলে পূজিত হয়ে আসছে। এই তো আমাদের ঐতিহ্য, এই তো আমাদের সংস্কৃতি!

কারণ : দুই

বায়ু দেখেননি, পিতামহকে দেখেননি, সম্রাট অশোককেও দেখেননি, তা সত্ত্বেও সবই তো মানছেন। অথচ ঈশ্বরকে দেখেননি বলে মানছেন না—একি যুক্তিবাদীর লক্ষণ ?

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের তরফ থেকে একটি প্রশ্ন প্রায়শই বর্ষিত হয়, "আপনি কি বায়ু দেখেছেন ? বিদ্যুৎ দেখেছেন ? সম্রাট অশোককে দেখেছেন ? দেখেছেন

আপনার প্রপিতামহকে ? গিয়েছেন লন্ডনে ? এত কিছু না দেখেও যদি আপনি এদের অস্তিত্ব পরম পরিতোষের সঙ্গে মেনে নিতে পারেন, তবে ঈশ্বর মানতে অসুবিধে কোথায় ?"

যাঁরা এইজাতীয় প্রশ্ন করেন, তাঁরা সম্ভবত শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানতে আগ্রহী থাকেন। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের বহু মানুষই শুধুমাত্র 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' নয়, 'পূর্ব প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করা জ্ঞান বা অনুমানকে মর্যাদা দিতেন। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। আজও যুক্তি এবং বিজ্ঞান পূর্ব প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর পরোক্ষ প্রমাণকে পরিপূর্ণভাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমরা বায়ু চোখে না দেখতে পেলেও বায়ুর স্পর্শ অনুভব করতে পারি। ফাঁকা বেলুনকে বায়ু পূর্ণ করে বেলুনের বাড়তি ওজন দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি। বায়ুকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড মিল চলছে, পতাকা উড়ছে, বায়ু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যুৎ তামার তারে দৃশ্যমান না হলেও আলোয়, পাখায়, ফ্রিজে, টেপরেকর্ডারে, নানা যন্ত্রপাতিতে তার অস্তিত্বকে সোচ্চারেই ঘোষণা করে। সম্রাট অশোকের কথা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলে পাই বলেই মানি। প্রপিতামহের অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব। তাই আমার অস্তিত্বই আমার প্রপিতামহের অস্তিত্বের প্রমাণ। পত্র-পত্রিকা ও দূরদর্শন যেমন লন্ডনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তেমনই অর্থ-ব্যয় করতে পারলে, সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে ড্যাং-ড্যাং করেই লন্ডনে ঘুরে আসা সম্ভব। অতএব প্রমাণহীনভাবে এ-সবের অস্তিত্ব মেনে নেবার অভিযোগ কখনই আমাতে বর্তাতে পারে না। কারুর উপরেই বর্তাতে পারে না।

কারণ : তিন

ঈশ্বর আজও প্রমাণিত নন বলে কোনও দিনই হবেন না, এমন গ্যারান্টি আপনাকে কে দিল ?

বছর দু'য়েক আগে শারদোৎসবের প্রাক্কালের এক সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তাঁর প্রজ্ঞা শুনিয়েছিলেন, "মানছি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু এ'কথাও আপনাকে মানতে হবে 'ঈশ্বর নেই' এটাও কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এমন তো অতীতে বহুবারই ঘটেছে—অতীতে যা প্রমাণিত সত্য ছিল না, বর্তমানে তা প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এই মুহূর্তে অস্বীকার করলেও ভবিষ্যতে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না—এমন গ্যারান্টি দেওয়া কি কোনও যুক্তিবাদীর পক্ষে উপযুক্ত কাজ ?"

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রাজ্ঞ-দার্শনিক এবং বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী হিসেবে পরিচিত।

পেশায় অধ্যাপক-এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি যুক্তিকে গলার জোরে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ভরসায় বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ভূত-পেত্নী-শাকচুন্নি-ব্রহ্মদত্যিতে বিশ্বাস করেন ?"

প্রাজ্ঞ-দার্শনিক আমার প্রশ্নটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে আঙুলের টোকায় কাঁধ থেকে পোকা ঝাড়ার মতই ঝেড়ে ফেললেন, "ও'সব কুসংস্কারে বিশ্বাস করব, ভাবলেন কী করে ?"

আমি আবার বৈষ্ণব বিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি বিশ্বাস করেন— ঘোড়ার ডিম, ট্যাঁশ্ গরু, হাঁসজারু, হাতিমি, বকচ্ছপ, রামগরুড়ের ছানা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, এ'সবের বাস্তব অস্তিত্ব আছে ?"

আমার প্রশ্ন শুনে রাজনীতি করা পণ্ডিত ব্যক্তিটির মুখ মেঘলা হলো। জানি না, সেটা প্রশ্নের গতি-প্রকৃতি দেখে পরবর্তী চাল অনুমান করে শঙ্কা থেকে কি না।

নীরবতা ভঙ্গ করতে হলো আমাকেই, "আপনাকে মানতেই হবে ভূত থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদির অস্তিত্ব নেই এ'কথা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারেনি, এমন কি, কেউই প্রমাণ করতে পারেনি। ভবিষ্যতে এ'সবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হতেও তো পারে। অতএব কোন যুক্তিতে আপনি এ'সবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন ? আপনি যে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, সে ধরনের যুক্তির সাহায্যে যে কোনও কিছুর অস্তিত্বই প্রমাণ করা সম্ভব, তাই নয় কি ?"

প্রাজ্ঞ দার্শনিক উত্তর দেননি।

কারণ : চার
প্রমাণ করতে পারেন, ঈশ্বর নেই ?

প্রায়শই দুটি আপাত চোখা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, "আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন ঈশ্বর নেই ? জ্যোতিষশাস্ত্র ভাঁওতা ?"

হ্যাঁ, ঠিক এই দু'টি প্রশ্নেরই মুখোমুখি হয়েছিলাম ২৩ জানুয়ারি '৯০ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর টাউন হলের মাঠে। 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের এক বিতর্ক সভায় কিছু জ্যোতিষী ও তন্ত্রসিদ্ধ জ্যোতিষীদের সঙ্গে আমিও বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি। আর সেখানেই এক যোগীতান্ত্রিক-জ্যোতিষী আমাকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক প্রশ্ন দু'টি ছুঁড়ে দিলেন। প্রশ্ন দু'টি শ্রোতাদের যে যথেষ্টই নাড়া দিয়েছিল, সেটুকু বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললাম, "আপনি যদি মনে করে থাকেন আমি খুব জানি, বুঝি, প্রমাণ-ট্রমাণ করতে বেজায় পটু, তাহলে কিন্তু

ভুল করবেন। সত্যি বলতে কি আমি নিজেই কি ছাই সব ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝি নাকি ! আমার জীবনেই একটা ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটে, যার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। জানি না, সত্যিই ব্যাপারটা লৌকিক ? না অলৌকিক ? আমি দেখেছি জোড়া পায়ে তিন বার লাফালে অনেক সময়ই আমার উচ্চতা তিন ইঞ্চি বেড়ে যায়। ব্যাপারটা মোটেই গাল-গপ্পো নয়। আপনাদের সামনেই ঘটিয়ে দেখাচ্ছি।"

মঞ্চের পাশেই একটি স্তম্ভ, সম্ভবত কোনও কিছুর স্মৃতিতে তৈরি। যোগীতান্ত্রিক-জ্যোতিষীকে ডেকে নিয়ে সিঁড়ি বেড়ে দু'জনেই উঠে গেলাম স্তম্ভের বেদিমূলে। আমার অনুরোধে যোগীতান্ত্রিক আমার উচ্চতা চিহ্নিত করে স্তম্ভে দাগ দিলেন। জনতা অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি জোড়া পায়ে তিনবার লাফালাম। যোগীবাবাকে বললাম, "এ'বার মাপলেই দেখতে পাবেন তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছি।"

কিছু দর্শকের কথা কানে আসছিল, "ওই তো বেড়ে গেছেন", "বেড়েছেন, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যোগীবাবা আমার উচ্চতা মাপলেন। মাপতে গিয়ে বোধহয় কিছু গণ্ডগোলে পড়লেন। আবার মাপলেন। আবারও। তারপর অবাক গলায় বললেন, "আপনার উচ্চতা তো একটুও বাড়েনি !"

আমি কম অবাক হলাম না, "সে কী ! আমি বাড়িনি ? ঠিক মেপেছেন তো ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই মেপেছি। যে কেউ এসে দেখতে পারেন।"

বললাম, "না না, আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। যাই হোক, আজ আমি আপনাদের অবাক করতে পারলাম না। যে কোনও কারণে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আজ ব্যর্থ হওয়ার মানে এই নয় যে, আমি পারি না। আমি পারি। আমি তিন লাফে তিন ইঞ্চি বাড়ি। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি। কেন এমনটা হয় ? যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা পাইনি। এই রহস্যের কারণ আপনারা কেউ বলতে পারবেন ?"

আমার কথায় দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। অনেকেই বোধহয় আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। প্রথম জোরালো প্রতিবাদ জানালেন যোগীবাবাই, "আপনি যে বাড়েন, সে কথাই প্রমাণ করতে পারলেন না। সুতরাং বাড়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে ?"

আমাকে সবার সামনে এ'ভাবে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যথিত হলাম। বললাম, "ভাই, আজ লাফিয়েও লম্বা হতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই লাফিয়ে এমনটা ঘটাতে পারি। অনেক বার ঘটিয়েছি। এখন নিশ্চয় আপনি ও দর্শকরা সবাই আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন ?"

আমার এমন আন্তরিক কথাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে যোগীবাবা বললেন, "সরি, আমি অন্তত আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। এবং আশা করি কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনার দাবিকে শুধুমাত্র আপনার মুখের কথার উপর নির্ভর করে মেনে নেবেন না।"

এ'বার আমার রাগ হওয়ারই কথা। একটু চড়া গলাতেই বলে ফেললাম, "অর্থাৎ আমাকে অবিশ্বাস করছেন। কিন্তু আমার এই ব্যর্থতার দ্বারা আদৌ প্রমাণ হয় না, আমি মিথ্যেবাদী। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন—আমি মাঝে-মধ্যে তিন লাফে তিন ইঞ্চি লম্বা হই না?"

যোগীবাবা এ'বার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। চড়া গলায় বললেন, "আমার প্রমাণ করার কথা আসছে কোথা থেকে? আপনি ভালো করেই জানেন, এমনটা প্রমাণ করা আমার কেন, কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দাবি করেছেন আপনি। প্রমাণের দায়িত্ব আপনার। দাবির যথার্থতা প্রমাণের দায়িত্ব দাবিদারের।"

হেসে ফেললাম। বললাম, "সত্যিই সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। এই যুক্তিটা আপনার মুখ থেকে বের করতেই লাফিয়ে বাড়ার গল্পটি ফেঁদেছিলাম। আমার কোনও দিনই লাফিয়ে বাড়ার ক্ষমতা ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন উদ্ভট দাবি করে যদি বলি—আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, আমি কোনও দিনই তিন লাফে তিন ইঞ্চি বাড়িনি? আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না। বাস্তবিকই দাবির সমর্থনে প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবিদারের। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণের দায়িত্ব আস্তিকের এবং জ্যোতিষে বিশ্বাসীদেরই। যুক্তি ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসীরা সেই দাবির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই তা গ্রহণ করবে, এটাই তো সঙ্গত।"

○

দাবির সমর্থনে প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবিদারের। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণের দায়িত্ব আস্তিকের এবং জ্যোতিষে বিশ্বাসীদেরই। যুক্তি ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসীরা সেই দাবির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই তা গ্রহণ করবে, এটাই তো সঙ্গত।"

○

উপস্থিত শ্রোতারা তুমুল হাসি ও হাততালিতে বুঝিয়ে দিলেন, আমার যুক্তি তাঁদের খুবই মনের মতো ও উপভোগ্য হয়েছে। এরপর বাড়তি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কারণ : পাঁচ

সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় বহু মৃত্যুর মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এক-আধজনের বেঁচে যাওয়ার পরেও কি বিশ্বাস করব না—'রাখে হরি মারে কে' ?

ঈশ্বর-নির্দেশিত মানুষের ভাগ্যের পক্ষে জোরালো প্রমাণ হিসেবে অনেকেই ছুঁড়ে দেন একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি ঈশ্বর ও ভাগ্যে বিশ্বাসী বহু বুদ্ধিজীবীদের কাছেই যে জোরালো হাতিয়ার, তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। প্রশ্নটা এই ধরনের :

এই যে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, লঞ্চডুবি হচ্ছে, নৌকোডুবি হচ্ছে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে, ঘটছে আরও নানা ধরনের বড়-সড় আকারের দুর্ঘটনা, তাতে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে, বহু মানুষ সাংঘাতিকভাবে আহত হচ্ছে, আবার তারই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, কেউ কেউ অদ্ভুত ভাবে বেঁচে যাচ্ছে। এমনটা ঘটার পিছনে কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে কি ? যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না বলেই একে আমরা 'ঈশ্বর শক্তির অপর লীলা' নামে অভিহিত করতে পারি। অথবা চিহ্নিত করতে পারি 'ভাগ্য' বলে, যা অবশ্যই ঈশ্বর দ্বারাই নির্ধারিত।

এই যে বেশ কিছু লক্ষ মানুষদের মধ্যে একজন লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছে, ঠিক সেই কী করে পাচ্ছে ? এটা কি পরম-করুণাময় ঈশ্বরের লীলা নয় ? এটা কি ঈশ্বরের নির্ধারিত করে দেওয়া ভাগ্য নয় ? যদি তেমনটা না-ই হয়, তবে যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা কী দেবেন ?

এমন দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া বা লটারি জেতা 'ঈশ্বরের কৃপা' বা 'ঈশ্বর নির্ধারিত ভাগ্য' যে আদৌ নয়, এবং এ'জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা পেতে যে আদৌ কোনও জটিল যুক্তির প্রয়োজন হয় না—তাই নিয়ে এ'বার আলোচনায় ঢুকি আসুন।

যে কোনও দুর্ঘটনার পিছনেই থাকে অবশ্যই কিছু কারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা যদি বিমান দুর্ঘটনাকে আলোচনার জন্য বেছে নিই, তাহলে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ কী কী হতে পারে—আসুন দেখি। বিমান তৈরির কারিগরিগত ত্রুটি বা ওই মডেলের বিমান চালানর বিষয়ে চালকের প্রশিক্ষণগত ত্রুটি, কিংবা বিমান ওড়ার আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় গাফিলতি, অথবা অন্তর্ঘাত, কিংবা দুর্যোগ ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হতেই পারে। দুর্ঘটনা হলে সকলেই মারা যাবে, এমনটা সবক্ষেত্রেই ঘটবে ; ভাবার মত কোনও কারণ নেই। এ'ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ব্যাপকতার অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিস্ফোরিত বিমান আকাশে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লে একটি যাত্রীকেও বাঁচাবার ক্ষমতা কোনও ধর্মের ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হবে না। দুর্ঘটনায় বিমানের কোনও অংশ-বিশেষের ক্ষতি হলে সেই অংশের যাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার, এমন

কি মৃত্যুর সম্ভাবনাও বাড়বে। বিমানের কোনও অংশ কম ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা অক্ষত থাকলে, ওই অঞ্চলে যাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও কম থাকবে। এরই পাশাপাশি দুর্ঘটনার মুহূর্তে যাত্রীর কোমরের বেল্ট বাঁধা ছিল কি না, যাত্রীর থেকে বাইরে বেরবার দরজা কতটা দূরে ছিল, যাত্রী সেই সময় কীভাবে অবস্থান করছিল, যাত্রীর মানসিক ও হার্টের অবস্থা এবং আরও বহুতর কারণই যাত্রীর মৃত্যু হওয়া এবং না হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এবং এগুলো নেহাতই ঘটনা বই বাড়তি কিছু নয়।

লঞ্চ বা নৌকোডুবি হচ্ছে। মানুষ মরছে। লঞ্চ বা নৌকোডুবির ক্ষেত্রে ঝড় বা জলোচ্ছ্বাস যেমন অনেক সময়ই কারণ, তেমনই বেশিরভাগ সময়ই কারণ হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার বেশি যাত্রী-বহন (অন্তত আমাদের দেশের ক্ষেত্রে)। প্রশাসনের গাফিলতি, অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থার জন্যই যাত্রীরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েই নৌকোয় উঠতে বাধ্য হন। অনেক সময়ই বহন ক্ষমতার দেড়-দু'গুণ যাত্রী ওইসব লঞ্চ ও নৌকোয় তোলা হয়। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটে। কেউ বাঁচেন। অনেকেই মারা যান। এই বাঁচা-মরার ক্ষেত্রেও যাত্রীর সাঁতার জানা না জানা, এবং ডোবার সময় যাত্রীর অবস্থান, ডোবার সময় কাছাকাছি অন্য নৌকো ও লঞ্চের হাজির থাকা না থাকাও অবশ্যই একটা প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এই পরিবহনের সমস্যা মেটাবার ব্যবস্থা যদি প্রশাসন করে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশি যাত্রীবহনের জন্য নৌকো বা লঞ্চডুবিতে মারা যাওয়া বা বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোর 'ঈশ্বর নির্ধারিত ভাগ্য' পাল্টে যেতে বাধ্য। তখন কোনও ধর্মের কোনও ঈশ্বরেরই সাধ্য হবে না 'ডুবিজনিত' বাঁচা-মরা নিয়ন্ত্রণ করা—কারণ নৌকোই তো তখন ডুববে না।

ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসজনিত দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসন যদি আবহাওয়া বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহে সচেতন হয় এবং সময়মত নৌকো ও লঞ্চগুলোকে বিপদ সংকেত দেয়, তবে আবহাওয়াজনিত দুর্ঘটনাও এড়ানো যায়।

এ'বার আসুন আমরা লটারিতে ঢুকি। লটারি, তা সে পাড়ার ক্লাবের লটারিই হোক, আর কোটি কোটি টাকা বাজেটের লটারিই হোক, তাতে একটা নম্বর প্রথম পুরস্কার দেওয়ার জন্য তোলা হবেই। বহুর মধ্যে থেকে কয়েকটি নম্বর তুলে এইসব নম্বরের টিকিট মালিকদের পুরস্কৃত করার ওপরেই লটারি ব্যবসা দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম পুরস্কার এমনই একটি তোলা নম্বর। এই তোলা টিকিটের একজন ক্রেতা থাকবেই। তাকেই দেওয়া হবে প্রথম পুরস্কারটি। এটি একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বেরিয়ে আসা ঘটনা মাত্র। অর্থাৎ, মোদ্দা কথায়, স্রেফ একটি ঘটনা মাত্র, এর বেশি কিছুই নয়। যত বেশি বেশি করে নতুন নতুন লটারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, যত বেশি বেশি করে লটারি মাসের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক হবে, ততই বেশি বেশি করে মানুষ এই সব লটারির পুরস্কারও পেতে থাকবে। অর্থাৎ ঈশ্বর-লীলায়

বিশ্বাসীদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—ততই বেশি বেশি করে মানুষ এমন লটারি বিজেতার 'ভাগ্য' অর্জন করবে।

লটারি, সাট্টা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি যতদিন থাকবে, ততদিন 'ঈশ্বরের কৃপাধন্য বিজেতা'ও থাকবেই। আইনের খোঁচায় লটারি-সাট্টা-ঘোড়দৌড় ইত্যাদি জুয়া বন্ধ হয়ে গেলেই ঈশ্বরের কৃপা বিলোবার ক্ষমতাও তামাদি হয়ে যাবে। মানুষের আইনের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা কত অকিঞ্চিৎকর, একবার ভাবুন তো!

○

লটারি, সাট্টা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি যতদিন থাকবে, ততদিন 'ঈশ্বরের কৃপাধন্য বিজেতা'ও থাকবেই। আইনের খোঁচায় লটারি-সাট্টা-ঘোড়দৌড় ইত্যাদি জুয়া বন্ধ হয়ে গেলেই ঈশ্বরের কৃপা বিলোবার ক্ষমতাও তামাদি হয়ে যাবে। মানুষের আইনের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা কত অকিঞ্চিৎকর, একবার ভাবুন তো!

○

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতার কাছে কত তুচ্ছ, একবার ভাবুন তো!

কারণ : ছয়
বাবা'কে তো বিনা প্রমাণেই 'জন্মদাতা' বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে ঈশ্বরের বেলায় খালি 'প্রমাণ চাই' 'প্রমাণ চাই' বলে চেঁচান কেন?

বছর কয়েক আগের ঘটনা। কলকাতা পুস্তক মেলায় আমাদের সঙ্গে তুমুল বিতর্ক বাধিয়ে তুলেছিলেন এক আর্চ-বিশপ। বিতর্কের বিষয়—ঈশ্বর বিশ্বাস। তুমুল বিতর্ক, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির লড়াই দেখতে ভিড়ও তুমুল। আর্চ-বিশপের যুক্তিগুলো ছিল প্রাথমিকভাবে খুবই আকর্ষণীয়। এবং জনচিত্তে প্রভাব সৃষ্টিকারী। আর্চ-বিশপের বক্তব্য তলায় দিলাম।

আমরা কজন নিজের প্রপিতামহকে দেখেছি? প্রায় কেউই দেখিনি। তবু আমরা প্রপিতামহের নাম তো বলি। তাঁকে না দেখলেও তিনি ছিলেন, এই বিশ্বাসেই বলি।

আমাদের বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে, আমরা মায়ের স্বামীর নামই উল্লেখ করি। তিনি যে বাস্তবিকই আমাদের জন্মদাতা বাবা, তার প্রমাণ কী? এখানেও তো আমরা আমাদের বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরি।

আমরা সম্রাট আকবরকে দেখিনি, গৌতম বুদ্ধকে দেখিনি। তবু বিশ্বাস করি ওঁরা ছিলেন। কোনও প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুস প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র বিশ্বাসের

উপর নির্ভর করে যখন এমনি হাজারো কিছুর অস্তিত্বকে আমরা মেনে নিতে পারছি, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেবার বেলায় কোন যুক্তিতে আমরা বিশ্বাসের উপর নির্ভরতার বিরোধিতা করব? 'প্রমাণ ছাড়া মানছি না, মানব না' বলে হাঁক পাড়ব?

যুক্তিগুলো আপাত ভাবে জোরালো মনে হলেও, বাস্তবিকপক্ষে এগুলো কোনও যুক্তিই নয়। কেন নয়? এই প্রশ্নের আলোচনায় এবার ঢুকি আসুন।

প্রাচীন যুগ থেকেই পণ্ডিত মহল প্রত্যক্ষ প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ বললেও প্রত্যক্ষ-অনুগামী বা পূর্ব-প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবশ্যই স্বীকার করেছেন। 'চরক সংহিতা'য় প্রত্যক্ষ-অনুগামী তিন ধরনের অনুমানের কথা বলা হয়েছে। (১) বর্তমান ধূম দেখে বর্তমান অগ্নির অনুমান। (২) বর্তমান গর্ভবতী মহিলা দেখে তার অতীত মৈথুনের অনুমান। (৩) বর্তমান সুপুষ্ট বীজ দেখে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ ও ফলের অনুমান।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন অনুমানের কথা বলা হয়েছে। অনুমানগুলো বর্তমান দেখে বর্তমান, বর্তমান দেখে অতীত এবং বর্তমান দেখে ভবিষ্যৎ বিষয়ে।

এই একই নিয়মে এখনও আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। আমার বর্তমান অস্তিত্ব থেকেই অনুমান করতে পারি, আমার প্রপিতামহের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। প্রপিতামহের অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

একই ভাবে, আমার জন্মদাতা কোনও পুরুষের অস্তিত্ব ছাড়া আমার বর্তমান অস্তিত্ব অসম্ভব। আমার জন্মদাতা পুরুষটি তাত্ত্বিকভাবে মায়ের বিবাহিত জীবনসঙ্গী হতেও পারেন, নাও পারেন। প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে আমরা সাধারণভাবে মায়ের বিবাহিত জীবন সঙ্গীকেই 'বাবা' বলে থাকি। এটা রীতির প্রশ্ন, প্রমাণের প্রশ্ন নয়।

বুদ্ধের মূর্তি, শিলালিপি, সম্রাট আকবরের বিভিন্ন দলিলের বর্তমান অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করেই আমরা তাঁদের অতীত অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। কিন্তু এ'জাতীয় কোনও প্রমাণই আমাদের সামনে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা হাজির করতে পারেননি, বা আমাদেরও নজরে আসেনি, যার দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—ঈশ্বর আছেন।

○

বুদ্ধের মূর্তি, শিলালিপি, সম্রাট আকবরের বিভিন্ন দলিলের বর্তমান অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করেই আমরা তাঁদের অতীত অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। কিন্তু এ'জাতীয় কোনও প্রমাণই আমাদের সামনে ঈশ্বর

বিশ্বাসীরা হাজির করতে পারেননি, বা আমাদেরও নজরে আসেনি, যার দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—ঈশ্বর আছেন।

○

কারণ : সাত

অন্তত এটা তো মানবেন, যে—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

বাংলাদেশের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা হুজুর সাইদাবাদী আমাকে 'লাখ কথার এক কথা' শুনিয়েছিলেন, "আল্লাহর অনুভব হয় বিশ্বাসে, যুক্তিতে নয়। পূর্বে লোকের আল্লাহে বিশ্বাস ছিল। তাদের অভাবও ছিল না। কোনও অতিথি বাড়িতে আইলে আনন্দ পাইত। খাওয়াইয়া আনন্দ পাইত। এখন অতিথি দ্যাখলে লোকের মুখ ভারি হয়। আজকাল মানুষের আল্লাহে বিশ্বাস নাই বইল্যাই অভাব ঘোচে না। আল্লাহে বিশ্বাস নাই বইল্যাই ক্ষ্যাতে আর সাবেক ফসল ফলে না, পুকুর-খাল-বিলে সাবেক মাছ পড়ে না। আল্লাহে বিশ্বাস নাই বইল্যাই খোদার গজবে প্রত্যেক বছর মহামারি। হজরত সোলেমান নবী সিংহাসনে বইস্যা পারিষদ সহ শূন্যে ভ্রমণ করতেন কিসের জোরে? এই আল্লাহে বিশ্বাসের জোরেই।"

জাতির জনক বলে চিহ্নিত গান্ধীজিও মনে করতেন বিহারের ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তিহানির একমাত্র কারণ স্থানীয় মানুষের 'পাপ', 'ঈশ্বরে অবিশ্বাস।'

আমাকে আমার এক মাস্টারমশাই 'সত্যি-ঘটনা'র শিলমোহর দেগে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইদের বাড়ি ছিল ওপার বাংলায়, পদ্মাপাড়ে। বাবার ছিল ভোরে বেড়াবার অভ্যেস। এক উষালগ্নে নদীর পাড় ধরে হাঁটছেন, হঠাৎ দেখেন, নদীর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছেন এক সাধু। সাধু এপারে আসতেই বাবা আছড়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। এমন একটা অলৌকিক ঘটনা দেখার পর এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। বাবা সাধুকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। সাধুবাবা জানালেন, তিন রাতের বেশি কোনও জায়গায় তিনি থাকেন না। বাবা ও বাড়ির সকলেই সাধুর খুব সেবা-যত্ন করলেন। তিন দিনের মাথায় সাধুর কাছে বাবা জানতে চাইলেন জলে হাঁটার রহস্য। সাধু অমনি এক টুকরো কাগজে খস্‌খস্‌ করে কী সব লিখে বাবার জামার বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, নে চল, যে মন্ত্র লিখে দিলাম, সেই মন্ত্রের জোরেই তুই হেঁটে কেমন সুন্দর নদী পার হয়ে যেতে পারবি, দেখবি চল।

বাবা পদ্মার জলে পা রাখলেন। যতই এগোন, পায়ের পাতা ডোবে না। বাবা যখন মাঝ নদীতে, তখন দেখা মিলল কয়েকটা নৌকোর। নৌকোর

মাঝিরা অবাক। এক মাঝি জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুর, এমন ক্ষমতা পাইলা কেমনে?"

অমনি বাবার মাথায় চিন্তা চমকাল—সত্যিই তো, কী এমন মন্ত্র লেখা আছে কাগজের টুকরোয়, যার শক্তিকে জলে হাঁটছি? বাবা পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন। ভাঁজ খুললেন। ও হরি, এতে যে কিছুই মন্ত্র-টন্ত্র লেখা নেই। লেখা আছে—'রাম রাম রাম'। মাত্র তিনবার 'রাম' লিখে পকেটে রাখলে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়!! বাবার বিশ্বাস হল না। ভয় পেলেন। 'রাম' নামে পদ্মা পারা-পার হওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর কাছে মুহূর্তে অসম্ভব বলে মনে হল। আর অমনি বাবা ডুবে গেলেন। নেহাত সাঁতার জানতেন, আর পাশেই নৌকো ছিল বলে বেঁচে গেলেন।

এই গল্পটা (মাস্টারমশাইয়ের কথা মত 'সত্যি' ঘটনা) বলে মাস্টারমশাই যে নীতি উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটা হল—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"।

প্রবীণ সাংবাদিক এবং ভাগ্যফল, আত্মার অবিনশ্বরতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অন্ধ বিশ্বাসী প্রণবেশ চক্রবর্তী মশাই যুক্তিহীন বিশ্বাসের পক্ষে জোরালো যুক্তি খাড়া করে বলেছেন, (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, যুগান্তর, ৩ মার্চ ১৯৯৪) *"জীবনের সব কিছুই কি যুক্তিতর্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে, জীবনের সকল সমস্যার সমাধানই কি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে করা সম্ভব? কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'।...আমরা যখন ট্রেনে উঠি—তখন কি আমাদের রেল ইঞ্জিনের উপর নির্ভরতা, ড্রাইভারের উপর ভরসা স্থাপন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারগুলি নিছকই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে থাকে না?"*

সালটা '৯৫। দোলের আগের রাতে আমরা কয়েক বন্ধুতে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে যাচ্ছিলাম কল্যাণীর 'ঘোষপাড়া'য়। উদ্দেশ্য—সতী মেলা নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তোলা। সতী মেলার কল্যাণে ট্রেনে বুকের পাঁজরা-ভাঙা ভিড়। সহযাত্রী এক বাউলকে জিজ্ঞেস করলাম, "গান গাওয়ার আনন্দে সতী মেলায় যাচ্ছেন, না সতী মা'র থানের অলৌকিক মাহাত্ম্যে বিশ্বাসের টানে যাচ্ছেন?"

"বিশ্বাস যে কী জিনিস, যে করে সে জানে। আপনাকে একটা ঘটনা শোনাই। আমাদের গ্রামে থাকত হানিফ। খেতে জন খাটত। ধান খেতের ধেড়ে ইঁদুর ধরে রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে আমাদের গ্রামে। হানিফ এমনি একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরতে গিয়ে ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ইঁদুর পাওয়ার বদলে পেল ইঁদুরের কামড়। তার দিন কয়েক পর ইঁদুরটাকে ধরবে বলে ওই গর্তটা শাবল মেরে ভাঙতেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এল একটা কেউটে। হানিফের বুঝতে বাকি রইল না, সেদিন ওকে কেউটেই কেটেছিল। এতদিন ইঁদুরে কাটার বিশ্বাসই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কেউটে দর্শনে সে বিশ্বাস ভেঙে যেতেই

হানিফের সারা শরীর কালীবর্ণ। মুখ থেকে গ্যাঁজলা। হানিফকে বাঁচানো গেল না। সাপের কামড়কে ইঁদুরের কামড় বলে গভীর বিশ্বাস করলে বিষক্রিয়াও থেমে যায়।"

এ'জাতীয় গল্প আমার মত, আপনাদেরও অনেকেরই শোনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। এ'সব গল্পে সারবত্তা না থাকলেও বহু মানুষকে আবেগে আপ্লুত করার ক্ষমতা যথেষ্টই। অথচ দেখুন, অতি সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে উঠে আসা যুক্তির আঘাতেই এই সব গল্পের পাহাড় রেণু রেণু হয়ে যায়।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানে এবার আমরা ফিরে যাব। সেখানে হুজুর সাঈদাবাদীর বক্তব্যের উত্তরে আমি সে কথাই বলেছিলাম, যা আপনিও বলতেন। বলেছিলাম, "এ'পার বাংলায় বা ওপার বাংলায় বিঘে প্রতি যে পরিমাণ ফসল হয়, তার বহুগুণ বেশি ফসল হয় ইউরোপের প্রতিটি দেশে, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, এমন কি এই মহাদেশের জাপানেও। ওরা কেউই আল্লাহের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। তবু আল্লায় বিশ্বাসী দু'বাংলার মুসলিম চাষীদের চেয়ে বেশি ফসল ফলায়। এমন কি মজা হল এই যে, ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও ও'সব দেশে বিপুল সংখ্যক আস্তিক অধ্যুষিত দু'বাংলার চেয়ে ফসল উৎপাদন অনেক বেশি এবং মহামারির সংখ্যাও অনেক কম। এর কারণ, বিজ্ঞানকে ওসব দেশ কৃষিকাজে ও শারীরবিজ্ঞানে বেশি বেশি করে কাজে লাগিয়েছে। উৎপাদনহীনতা, অভাব, শোষণ, রোগ, মহামারি, এর কোনওটির জন্যই ঈশ্বরজাতীয় কোনও কিছুতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সামান্যতম ভূমিকা নেই।

"হুজুর সাহেব, আপনি মক্কায় গিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ।" হুজুর সাহেবের তৎপর উত্তর।

—"কিসে গিয়েছিলেন? জাহাজে না প্লেনে?"

—"প্লেনে।"

—"কেন, প্লেনে যেতে গেলেন কেন? আপনি আল্লাহের প্রিয় ভক্ত। আপনি আল্লাহে পরম বিশ্বাসী, কেন এই বিশ্বাস রাখলেন না, আপনি চাইলে চোখের নিমেষে আল্লাহ আপনাকে মক্কায় পৌঁছে দেবেন? বেশ তো, সেই সময় যদি অমন সোজা কথাটা মনে নাই পড়ে থাকে, এবার বাংলাদেশে ফেরার সময় আল্লাহের কাছে আবেদন রাখুন না, সপারিষদ আপনাকে চোখের নিমেষে ঢাকায় পৌঁছে দেবার। এতে বিশ্বাসের ক্ষমতার পরীক্ষা নেবার পাশাপাশি প্লেনের ভাড়া ও সময় দুই-ই বাঁচবে।"

তার পরও কিন্তু হুজুর সাঈদাবাদী প্লেনেই ঢাকা ফিরেছেন। আমি জানি, আল্লাহে বিশ্বাসের ক্ষমতার দৌড় হুজুর সাহেবের ভাল মতই জানা আছে। মুখে যা বলেন, সে কথায় আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁর ব্যবহারই এ কথা আমাকে বুঝিয়ে দিল।

আমাদের 'জাতির জনক'-এর বক্তব্যে চিন্তার মূর্খতা এতই বিরাট আকারে ধরা পড়ে যে, এ বিষয়ে আলোচনা একান্তভাবেই অবান্তর।

মাস্টারমশাইয়ের গল্প (ঘটনা না বলে আমরা একে গল্পই বলব) প্রসঙ্গে আমাদের উত্তর এমনটাই বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক—তাত্ত্বিকভাবেই কোনও মানুষের পক্ষে কৌশলের সাহায্য ছাড়া জলের উপর দিয়ে এ'ভাবে হাঁটা সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কেউ প্রকাশ্যে হেঁটেও দেখাননি। এর পরও কেউ যদি এমন হাঁটার দাবি করেন, তবে তাঁকে দাবির পক্ষে প্রমাণও হাজির করতে হবে বই কি। প্রমাণ না দিয়ে যে কেউ যা খুশি উদ্ভট দাবি করলেই যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে তো বেজায় মুশকিল। আর মুশকিল সবচেয়ে বেশি মনোরোগ চিকিৎসকদের। তাঁদের কাছে নিত্যই এমন প্রচুর মানুষ হাজির হন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাঁর মাথার সমস্ত চিন্তা ধরে নিচ্ছেন, এবং সেই চিন্তাকে কাজে লাগিয়েই আমেরিকা সব দেশের ওপর ছড়ি-ঘোরাচ্ছে। কেউ বা মনে করেন, তিনি যে কোনও পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারেন। কেউ বা ভাবেন প্রতি রাতে তিনি একটা সাপ হয়ে যান। আমি এক উগ্র ধর্মীয় সংগঠনের নেতাকে পেয়েছিলাম, যিনি মনে করতেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর-আল্লা সব তারই সৃষ্টি।

আমার দেওয়া উদাহরণগুলোর কথা শুনে মাস্টারমশাই বলতে পারেন—বাবার ঘটনার বিশ্লেষণ করতে এঁদের টেনে আনার কোনও মানেই হয় না। কারণ, এঁরা পাগল। বাবা কখনই পাগল ছিলেন না।

মাস্টারমশাইয়ের কথাগুলো আমরা যদি সত্যি বলেই ধরে নিই, অর্থাৎ মাস্টারমশাইয়ের বাবা এমনটাই বলেছিলেন, তবে মাস্টারমশাইকে আমাদের একটি রূঢ় সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে—যাঁরা মিথ্যে কথা বলেন, তাঁরাও কারও না কারও মা-বাবা-ভাই-বোন-মাস্টারমশাই ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনটা হতে পারে, মাস্টারমশাই বাবার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে বিশ্বাস করেছিলেন। মিথ্যেকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিলেন। 'অলৌকিক ঘটনা ঘটা সম্ভব', এই আজন্মলালিত ধারণা থেকেই বিশ্বাস করেছিলেন। তাত্ত্বিকভাবেই যেহেতু কৌশল ছাড়া জলে হাঁটা সম্ভব নয়, তাই এর বাইরে কোনও সিদ্ধান্তে যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এবার আসুন, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তীর বক্তব্যের পোস্টমর্টেম-এ বসি আমরা। প্রণবেশবাবুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে যে উত্তর উঠে আসে ঃ

না, জীবনের সব কিছুই যুক্তিতর্কের উপর দাঁড়িয়ে নেই। তার হাতে-গরম উদাহরণ—প্রণবেশবাবুর এই যুক্তিহীন বক্তব্য।

অবশ্য এমনও হতে পারে, আমার এই বক্তব্যে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। প্রণবেশবাবু হয় তো এমন যুক্তিহীন বক্তব্য পেশ করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। এবং তাঁর এই বক্তব্য পেশের পিছনে রয়েছে গভীর যুক্তি-বুদ্ধি-ব্যক্তিস্বার্থ-শ্রেণীস্বার্থ।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট—শোষক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা।

দায়িত্বটা কী? শোষিত মানুষ যেন যুক্তিবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তাদের শোষণের কারণ হিসাবে শোষকদের চিহ্নিত না করে। বিশ্বাসবাদের ধোঁয়াশায় তারা যেন শোষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ভাগ্য, কর্মফল, ঈশ্বরের ইচ্ছা ইত্যাদিকে।

প্রণবেশবাবু বলেছেন, "জীবনের সকল সমস্যার সমাধানই কি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে করা সম্ভব?"

সমস্যাটা কী ধরনের, তার উপর নির্ভর করছে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব কি না। প্রণবেশবাবুর সমস্যাটা যদি হয় আক্ষরিক অর্থে অমর থাকার, বা পুরুষ হয়ে গর্ভে সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা লাভের, অথবা বৃদ্ধকে এক লাফে বালকে পরিণত করার—তবে যুক্তি নিশ্চয়ই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে। প্রণবেশবাবু, আপনি কি বিশ্বাস করেন এ'সব সমস্যার সমাধান বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সম্ভব?

মাননীয় প্রণবেশবাবু, আপনি কি বাস্তবিকই জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত কথায় বিশ্বাস করেন? বিশ্বাস করেন হুজুর সাঈদাবাদীর দাবিতে—বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান ও ধারণাকে উল্টে দিয়ে গ্রহরত্নের সাহায্যে বা মন্তরে গর্ভ উৎপাদন দ্বারা মাতৃত্বকামীদের সমস্যা সমাধান সম্ভব?

মাননীয় প্রণবেশবাবু, বহু ধর্মীয় রচনা ও গ্রন্থের প্রণেতা আপনি, এবং আপনিই জ্যোতিষীদের পক্ষে সবচেয়ে ধারাল কলমধারী সাংবাদিক। আপনিই পারেন গোলা গোলা কথা হেঁকে বলতে, "*অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিষোদ্গার করাটাই নাকি যুক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা।...এদেশের জ্যোতিষ-বিদ্যা খারাপ—অর্থাৎ এদেশের সবই খারাপ। তাহলে ভালোটা কে?*" (ধুর মশাই, জ্যোতিষী আর ধর্মগুরু, যারা শোষিত মানুষদের গরু বানাতে চায়, তাদের খারাপ বললে দেশের সব্বাইকে খারাপ বলা হল কী করে!! প্রতারককে 'প্রতারক' বললে দেশের লক্ষ-কোটি ভাল মানুষকে গাল-পাড়া হয় কীভাবে? ধর্মীয় মৌলবাদীদের পুরোন কৌশল, তাদের অন্যায়ের বা হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে প্রতিরোধ ভাঙতে জনসাধারণের সেন্টিমেন্ট সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা। মাননীয় প্রণবেশবাবু, একজন প্রকৃত ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবে আপনি সেই কৌশলটিকে কাজে লাগাতেই পরিকল্পিতভাবে জনগণের সেন্টিমেন্টকে আমাদের বিরুদ্ধে সমাবেশিত করতে এমন বস্তা পচা কুযুক্তির অবতারণা করেছেন।)

প্রণবেশবাবু, সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে পেস্টটা লাগিয়ে যখন দাঁত মাজতে শুরু করেন, তখন কি অন্ধ বিশ্বাসের উপর দাঁত-পরিষ্কার হওয়াকে সঁপে দিয়ে বসে থাকেন? না কি পূর্ব অভিজ্ঞতা, পূর্ব-প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে জানার

ফলে আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন—ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত পরিষ্কার হবে ? আপনার বাড়ির কলিংবেলটা বাজলে আপনি কারও আগমন প্রত্যাশা করে দরজা খুলতে যান না ? কেন আগমন প্রত্যাশা করেন ? পূর্ব-প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই তো ? এ পর্যন্ত ঠিক-ঠাক বলেছি তো প্রণবেশবাবু ? এ'বার আসুন আমরা আপনার 'ট্রেন' ও 'ড্রাইভার' প্রসঙ্গে আসি। আমরা যারা রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার থেকে শুরু করে রেল উন্নতির ইতিহাসের মোটামুটি খবরটুকুও জানি না, তারাও কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, ট্রেনে চাপলে ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আমরা যারা জানি না, একজন যখন ড্রাইভারের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য-দিয়ে, প্রয়োজনীয় নানা ট্রেনিং-এর মধ্য দিয়ে ড্রাইভার হিসেবে গড়ে তোলা হয়, তারাও কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি ট্রেন চালায় ড্রাইভার। এবং ড্রাইভারই ট্রেন চালিয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। সুতরাং 'ট্রেন' ও 'ড্রাইভার' এই দু'য়ের ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাই প্রত্যয় যোগায়—নির্দিষ্ট ট্রেনে চাপলে নির্দিষ্ট স্টেশনে নামতে পারব। ট্রেনে উঠে গন্তব্যে পৌঁছতে কোনও সুস্থ মানসিকতার মানুষকেই প্রত্যয় বিসর্জন দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসের উপর নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকতে হয় না। জানি, এরপরও দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু তাতে আমাদের বক্তব্যই আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ প্রত্যেকটা দুর্ঘটনার পিছনেই কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে। রেল দুর্ঘটনার পিছনে থাকতে পারে ড্রাইভারের কুশলতার অভাব (সমাজের দুর্নীতির অংশ হিসেবে ড্রাইভারের ট্রেনিং প্রক্রিয়ার মধ্যে ফাঁকি থাকতে পারে, যার নামই 'কুশলতার অভাব'), গার্ডের কুশলতার অভাব, ড্রাইভার বা গার্ডের অন্যমনস্কতা, গাড়ি চালাবার আগে গাড়ি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ও রেল লাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কুশলতার অভাব বা ফাঁকি, নাশকতা, যাত্রীর অসাবধানতা (যাত্রীর বহন করা দাহ্য পদার্থ থেকেও দুর্ঘটনা ঘটে), রেলের ফেরিওয়ালাদের অসাবধানতা (চা-কফি তৈরির জন্য বহন করা জলন্ত চুল্লি থেকেও দুর্ঘটনা ঘটে), টিকিট পরীক্ষক ও রেল পুলিশদের অসাবধানতা (যাঁরা যাত্রী ও ফেরিওয়ালাদের দাহ্য পদার্থ বহন আটকাতে পারেন, কিন্তু আটকান না), সিগনালম্যানের কুশলতার অভাব বা অসাবধানতা, লেভেল ক্রসিং-এর গেটকিপারদের অসাবধানতা ইত্যাদি নানা ধরনের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায় যাত্রীদের সচেতনা এবং রেলকর্মীদের কুশলতা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন কঠোরভাবে মেনে চলার মধ্য দিয়েই। ভাগ্যে বা পরমপিতায় বিশ্বাস সমর্পণের উপর কখনই নিরাপত্তা নির্ভরশীল নয়।

আচ্ছা, প্রণবেশবাবু, কলিংবেলের শব্দ শুনে আপনি নিশ্চয়ই কখনও-সখনও দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা জানেন, শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়েও মানুষ মারা যায়। আপনি যখন দরজা খুলতে এগোন, তখন কি নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ও দু'পায়ের উপর আস্থা রেখেই

দরজা খুলতে এগোন ? নাকি, আত্মবিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়ে 'শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে মরতে পারি' ভেবে নিছকই পরম বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে এগোন ?

বাস্তবিকই যদি এত বেশি বিশ্বাস নির্ভর হয়ে থাকেন, একান্ত মানবিক কারণেই আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি—ভাল মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নিন। যদি ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নিয়তি-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়ে এমনটা বলে থাকেন এবং প্রত্যয় অন্য রকম হয়ে থাকে, তাহলে বলব, আপনার শ্রম ও আপনার পত্রিকা কোম্পানির একগাদা নিউজপ্রিন্ট বৃথাই ব্যয়িত হল। কারণ, আপনার ছেঁদো যুক্তির গ্যাস বেলুনটায় এতক্ষণে যে একটা বড়-সড় মাপের ছ্যাঁদা হয়ে গেছে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন।

এখন আমরা সতী-মেলার সহযাত্রী বাউলের বক্তব্য বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ তৎপর হই আসুন। বাউলের কথা মত, সাপের কামড়কে ইঁদুরের কামড় বলে বিশ্বাস করায় বিষাক্ত সাপের বিষও শরীরে নিস্কর্মা ছিল।

কিঞ্চিত সাধারণজ্ঞান প্রয়োগেই বোঝা যায় শরীরে বিষক্রিয়া কখনই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নির্ভর নয়। এই সত্যটুকু জানার জন্য বাস্তবিকই শারীর-বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তর পড়াশুনার কোনও প্রয়োজন হয় না। সত্যি কথা বলতে কি 'সামান্য' পড়াশুনারও প্রয়োজন হয় না। খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন। ষড়যন্ত্রকারীরা বিষ মেশাতে শারীর-বিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। সুখাদ্য বিশ্বাসে বিষ-খাবার গ্রহণের জন্য বিষ কিন্তু তার ক্রিয়া বন্ধ রাখেনি। এরপর নিশ্চয়ই বাউলের গল্পটা যে নেহাৎই 'গপ্পো', এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'র দোহাই দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বে ও অলৌকিকতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা যে নেহাতই বড় মাপের বোকামি, এটা নিশ্চয়ই এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্টতর হয়েছে।

কারণ : আট

'ঈশ্বর' যদি অলীকই হবেন, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ কেন আজও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ?

উপরের এই প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে প্রায়ই আমাদের শুনতে হয়। যুক্তিবাদীদের বিপক্ষে ঈশ্বরবাদীদের এই জোরালো সওয়ালের জোরটা নেহাতই সংখ্যাধিক্যের, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সংখ্যাধিক্যের। উত্তরটা পেতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের দিকে।

মাত্র শ'পাঁচেক বছর আগের কথা। পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপারনিকাস

পুস্তকাকারে তুলে ধরলেন এক বৈজ্ঞানিক সত্যকে—সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো। তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে এলেন ইতালির জিয়োর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলেই। সেদিন পৃথিবীর তামাম বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক থেকে সাধারণ মানুষ তাঁদের তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন এক 'গাঁজাখুরি', 'অদ্ভুতুড়ে' ও 'ধর্মবিরোধী' মত প্রকাশের জন্য সেদিন ব্রুনোকে বন্দী করা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল এমন এক কম উচ্চতার ঘরে, যার ছাদ সীসেতে মোড়া। গ্রীষ্মে ঘর হত চুল্লি, শীতে বরফ। এমনি করে দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর উপর চালানো হয়েছিল বর্বরোচিত ধর্মীয় অত্যাচার। তথাকথিত সত্যের পূজারী, ঈশ্বর প্রেমিক ধর্মযাজকরা শেষবারের মত ব্রুনোকে বাঁচার সুযোগ দিল। নিজের মতকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিয়ে বাঁচার সুযোগ। অসীম সাহসী ব্রুনো সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাইবেল বিরোধী অসত্য ভাষণের অপরাধে ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল প্রকাশ্যে।

গ্যালিলিও গ্যালিলেইকেও ধর্মান্ধতার বিচারে অধার্মিক ও অসত্য মতবাদ প্রচারের অপরাধে জীবনের শেষ আটটা বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল।

কিন্তু এত করেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ঈশ্বর-পুত্র, পোপ এবং সংখ্যাগুরু জনমত সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরা বন্ধ করতে পারেনি।

আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চন্দ্রের কোনও আলো নেই। সেই সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ। সেদিন আনাক্সাগোরাসের তত্ত্বের প্রতিটি সত্যই ছিল ধর্মবিশ্বাসী বিশ্ববাসী সংখ্যাগুরুদের চোখে মিথ্যে। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা ও অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু এত করেও সেদিনের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ঈশ্বর-পুত্র ও জনগণের অজ্ঞানতা নির্বাসনে পাঠাতে পারেনি আনাক্সাগোরাসের জ্ঞানকে, সত্যকে। সেদিনের সংখ্যাগুরু মানুষের দ্বারা সমর্থিত চন্দ্র বিষয়ক ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীই আজ শিক্ষিত সমাজে নির্বাসিত।

ষোড়শ শতকেও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করত, অসুখের কারণ পাপের ফল বা অশুভ শক্তি। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার ফিলিপ্রাস অ্যাউরেওলাস প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন– মানুষের অসুস্থতার কারণ কোনও পাপের ফল বা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ জীবাণু। পরজীবী এই জীবাণুদের শেষ করতে পারলেই নিরাময় লাভ করা যাবে।

প্যারাসেলসাসের এমন উদ্ভট ও ধর্মবিরোধী তত্ত্ব শুনে তাবৎ ধর্মের ধারক-বাহকরা 'রে-রে' করে উঠলেন। এ কী কথা! রোগের কারণ হিসেবে ধর্ম আমাদের যুগ যুগ ধরে যা বলে এসেছে, তা সবই কি একজন উন্মাদ অধ্যাপকের কথায় মিথ্যে হয়ে যাবে? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পবিত্র ধর্মনায়কেরা যা

বলে এসেছেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা রয়েছে, যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ যা বিশ্বাস করে আসছে, সবই মিথ্যে ? সত্যি শুধু প্যারাসেলসাসের কথা ?

প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হল 'বিচার' নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকরা 'রোগের কারণ জীবাণু' বলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিল। প্যারাসেলসাস সেদিন নিজের জীবন বাঁচাতে নিজের দেশ সুইজারল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিনের জনসমর্থন পুষ্ট ধর্মীয় সত্য আজ শুধু সুইজারল্যান্ড বাসীদের মন থেকেই নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষার আলো দেখা মানুষদের মন থেকেই নির্বাসিত।

ইতিহাস বার বার আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে, যুক্তি ও প্রমাণের কাছে সংখ্যাগুরুর মতামতের দাম এক কানা-কড়িও নয়। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনির্ভর মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। কোন পক্ষ সংখ্যাগুরু, কোন পক্ষে নামী-দামিদের সমর্থন বেশি, তা দেখে নয়। আর সেটাই যে সঠিক পথ, তারই প্রমাণ, বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরুদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মতামতও বাতিল হয়েছে আবর্জনার মতই। তেমনটি না হলে আজও আমাদের মেনে নিতে হত—পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে ; গ্রহণের কারণ রাহুর গ্রাস ; চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ—অভিশাপে চন্দ্রের ক্ষয় রোগ ও বর লাভে ক্ষয় রোগ থেকে উত্তরণের রাস্তা জানার পর ক্ষয় রোগ ও পুষ্টিলাভের ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে ; রোগের কারণ রোগীর পাপ অথবা অশুভ শক্তি।

সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে 'সত্য' নির্ধারিত হলে আজও পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘুরত, আজও যে কত শত সহস্র অন্ধ বিশ্বাসকে মেনে নিতে হত, তার ইয়ত্তা নেই। সুদীর্ঘ কাল ধরে বহু অন্ধ বিশ্বাস, বহু বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যাগুরু জনগণের সমর্থন পেয়েও বাঁচতে পারেনি। কারণ অনিবার্য রূপে যুক্তির কাছে অন্ধবিশ্বাসের পরাজয় ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অপেক্ষা করে আছে একই অনিবার্য পরিণতি। ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা যুক্তির অনিবার্য জয়কে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসীরা যুক্তির জয়যাত্রার গতি স্তব্ধ করতে পারেনি, পারবেও না।

○

সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে 'সত্য' নির্ধারিত হলে আজও পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘুরত, আজও যে কত শত সহস্র অন্ধ বিশ্বাসকে মেনে নিতে হত, তার ইয়ত্তা নেই। ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অপেক্ষা করে আছে একই অনিবার্য পরিণতি। ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা যুক্তির অনিবার্য জয়কে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসীরা যুক্তির জয়যাত্রার গতি স্তব্ধ করতে পারেনি, পারবেও না।

○

কারণ : নয়

ঈশ্বর যদি প্রত্যেকের মনের কথা সরাসরি জানতেই পারেন, তাহলে কেন অষ্টপ্রহর ঢাক-ঢোল সহযোগে 'দাও-দাও' সংকীর্তন ?

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বৃহত্তর অংশই মনে করেন—ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি প্রতিটি মানুষের মনের কথাই জানেন। অতএব প্রতিটি ভক্তের মনের হদিশ যে তাঁর অজানা নয়—এটা স্পষ্ট। কিন্তু যেটা অস্পষ্ট ধোঁয়াশা, তা হল, তারপরও কেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা! এমন কি মসজিদে মাইক লাগিয়ে, পুজো প্যান্ডেলে মাইক লাগিয়ে প্রার্থনা! এ'সবই কি অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন নয় ?

যদি সোচ্চার প্রার্থনার প্রয়োজনকে মেনে নিতে হয়, তবে বলতেই হয়—ঈশ্বর অন্তর্যামী নন।

যদি সোচ্চার প্রার্থনার প্রয়োজনকে মেনে নিতে হয়, তবে বলতেই হয়—ঈশ্বর অন্তর্যামী নন।

কারণ : দশ

শুনলাম, ঈশ্বর-বিশ্বাস কাল্পনিক হলেও, মিথ্যে হলেও, বিশ্বাসটা নাকি ভাল ?

এক ধরনের বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের আজকাল প্রায়ই দেখা পাওয়া যায়, যাঁরা মনে করেন—ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। হতে পারে, গোটা ব্যাপারটাই কাল্পনিক। তবু এই ঈশ্বর বিশ্বাসের একটা ভাল দিকও আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে টনিকের কাজ করে। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের এমনতর উদারনীতি বিষয়ে আমার যা বলার তা বলতে বরং শোনাই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গ-এর সম্প্রতি করা দারুণ মজার মন্তব্য। স্টিফেন-এর কথায়—*আমার মনে হয় ধর্মীয় উদারনীতিবাদীদের চেয়ে মৌলবাদীরা বরং বিজ্ঞানীদের বেশি কাছের লোক। হাজার হোক, বিজ্ঞানীদের মতই মৌলবাদীরা অন্তত এইটুকু বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের বিশ্বাসটা সত্যি। কিন্তু ধর্মীয় উদারনীতিবাদীরা বলেন যে, তাঁদের বিশ্বাসটা মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসটা ভাল।*

এমন কুযুক্তির হাত ধরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অপর নাম 'সুবিধাবাদ' বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু হতে পারে, কিন্তু কোনও ভাবেই ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের গভীর বিশ্বাস হতে পারে না।

এ'জাতীয় মন্তব্য যাঁরা করেন, তাঁরা নিজেরা ঈশ্বর বিশ্বাস না করলেও

অন্যে ভুল ধারণা নিয়ে, বোকা-বোকা ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকুক, এমনটা চান। কেন চান ? ওইসব অজ্ঞতা না ভাঙিয়ে বিজ্ঞের এক নতুন শ্রেণী সৃষ্টির চেষ্টায় কি ?

ঈশ্বরজাতীয় কল্পনার শুরু তো মাত্র আঙুল গোনা কয়েক হাজার বছর আগে। তার আগে মনুষ্য প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে ছিল কার উপর ভরসা করে ?

○

ঈশ্বরজাতীয় কল্পনার শুরু তো মাত্র আঙুল গোনা কয়েক হাজার বছর আগে। তার আগে মনুষ্য প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে ছিল কার উপর ভরসা করে ?

○

নিশ্চয়ই নিজের উপরই ভরসা করে।

কারণ : এগারো
এইসব নিরীশ্বরবাদ-টাদ আর কদ্দিন ? রক্তের জোর ফুরোলেই তো খেল খতম ?

আমার এক অধ্যাপক বন্ধু প্রাক্তন নকশাল নেতা, অধুনা তিনি লেখায় ও কথায় মার্কসবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধনে সচেষ্ট। ফি বছর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশ যান। বিবেকানন্দের চোখে তিনি এখন দেখতে পান ভারত-আত্মাকে। রামকৃষ্ণের ভিতরে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানকে। এক সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আমাকে বললেন, "রক্তের জোর থাকলে সবকিছুকেই নাকচ করার ঔদ্ধত্য আসে। রক্তের জোর কমলেই ঔদ্ধত্যের জায়গায় আসে স্থিতি। নেতির জায়গায় ইতি। আর তখন সেই ইতির বোধ থেকেই আত্মা, পরমাত্মা ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্ব ভাস্বর হয়ে ওঠে।"

এই একই সুরের কথা বহু সাধারণ মানুষের কণ্ঠ থেকেও উঠে আসে, "এখন রক্তের জোর বেশি, তাই ঈশ্বর মানেন না। রক্তের জোর কমলেই দেখতে পাবেন ! কত নাস্তিক বুড়ো বয়সে আস্তিক হয়েছেন !"

হতেই পারে। এমন ঘটনা বার বার ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো আদৌ প্রমাণিত হল না। বরং এ'কথাই প্রমাণিত হল—বার্ধক্যের দুর্বলতার রন্ধ্র পথে, মৃত্যু ভয়ের পথে প্রবেশ করে ঈশ্বরজাতীয় কল্পনা।

আবার এর বিপরীত ঘটনাও বারবার ঘটতে দেখেছি, বরং বলা ভাল—দেখেই চলেছি। শান্তিদা, দুই জ্যোতিদা, উমাদা, রাসবিহারীদা, কামাক্ষাদা, নৃপেনদা, বেলাদি, সুনেত্রাদি, কাঞ্চনদি'র মত বহু আস্তিক, পরম ঈশ্বর-বিশ্বাসী,

আত্মার অনিত্যতায় বিশ্বাসী জীবনের সায়াহ্নে এসে নিরীশ্বরবাদী হয়েছেন। এরা কেউই খামখেয়ালীপনা করে নিরীশ্বরবাদী সাজেননি। অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে, অনেক ভেবে, বুঝে তবেই নিরীশ্বরবাদী হয়েছেন। শান্তিদা'র মত মানুষ পরিবেশগতভাবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন যৌবনের সীমানা পেরুবার আগে পর্যন্ত। বইমেলায় আমাদের বই হাতে পড়েছে। নেড়ে-চেড়ে কিনেছেন। পড়েছেন, চিন্তা নাড়া খেয়েছে। নতুন করে ধর্মের বইয়ে মনোনিবেশ করেছেন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই করেছেন। যতই গভীরে গেছেন, ততই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে ফাঁক আর ফাঁকিগুলো। উৎসাহিত শান্তিদা জীবনের শেষ লগ্নে পড়েছেন বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি। তারপর উল্লিখিত প্রতিটি মানুষের মতই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের পথ।

বরং এ'কথা আমরা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি—এইসব ঈশ্বরবাদীর জোর আর কদ্দিন? চেতনায় যুক্তির ছোঁয়া পৌঁছলেই তো খেল খতম।

○

এ'কথা আমরা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি—এইসব ঈশ্বরবাদীর জোর আর কদ্দিন? চেতনায় যুক্তির ছোঁয়া পৌঁছলেই তো খেল খতম।

○

কারণ : বারো

এ'তো ভাল দুশ্চিন্তায় পড়া গেল! সব কিছুর নিয়ন্তা ঈশ্বর কেন যুক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না?

ঈশ্বর, আল্লাহ সব কিছুর নিয়ন্তা। সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে না। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরই ভজনার জন্য। তাঁরই গুণ-কীর্তনের জন্য। তাহলে সমস্ত মানুষকে দিয়ে তাঁর গুণ-কীর্তন করাতে পারছেন না কেন? যুক্তিনিষ্ঠ মানুষগুলো ঈশ্বর, আল্লাহের গুণ-কীর্তন করা তো দূরের কথা, বরং অস্তিত্ব নিয়েই টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করেছে। ঈশ্বর এইসব যুক্তিবাদী মানুষদের কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? কেন ওইসব বে-আক্কেলেদের মুখ থেকে ঈশ্বর-আল্লাহের ভজনা বের করতে পারছেন না? তবে কি যুক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই? যুক্তিবাদীদের কাছে ঈশ্বরজাতীয়দের সব জারিজুরিই কি তবে নেহাতই ফক্কা?

অধ্যায় ঃ দুই

ঈশ্বর বিশ্বাস : পুরাণ ও ইতিহাসে মুখ দেখাদেখি বন্ধ

কারণ ঃ তেরো

বেদ—মনুস্মৃতি—কোরআন—বাইবেল নাকি অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ভগবানের নিজের লেখা !

বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা আছে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ মানুষের রচিত নয়। অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত। ঈশ্বর-রচিত এসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায়, ঈশ্বরের জাগতিক প্রার্থণা পুরাণের ক্ষমতা আছে। উদাহরণ হিসেবে যে কোনও একটি তথাকথিত ঈশ্বর-রচিত গ্রন্থকে পাঠ করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা বুঝতে পারবেন। বেদ-এ চোখ বোলান, দেখতে পাবেন বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশে রয়েছে প্রার্থনা—আমাকে দীর্ঘ আয়ু দাও, আমাকে সুস্বাস্থ্য দাও, নারীদের বশ করার ক্ষমতা দাও, নারীসংগমে দীর্ঘ আনন্দ পেতে প্রচুর বীর্য দাও, অনেক খাবার দাও, অনেক গরু-ঘোড়া-মোষের মাংস খেতে দাও, যুদ্ধে জয় দাও ইত্যাদি 'দাও দাও'-এর মেলা। এই মেলা 'দাও দাও' প্রার্থণা করতে মানুষকে যেহেতু ঈশ্বর-ই নির্দেশ দিয়েছেন, তাই ধরে নিতেই পারি ঈশ্বরের এমনি হাজারো প্রার্থণা পুরাণের ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা না থাকলে, 'আমার কাছে প্রার্থণা কর' বলাতে যাবেন কেন ? মিথ্যে প্রলোভন দেখাবেন কেন ?

সব ধর্মগ্রন্থেই এমন বহু প্রার্থনা পূরণের বিপুল আয়োজন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন অপৌরুষেয় ধর্মগ্রন্থে নারীকে পুরুষ শাসনে অবদমিত রাখার ও তাকে

মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টা। শুধু কি তাই, শাসক ও শোষকদের শাসন-শোষণের অধিকারকে ধর্মীয় সমর্থনও জানানো হয়েছে।

হিন্দুদের অপৌরুষেয় ধর্মগ্রন্থে বাড়তি যা তা হল, চতুর্বর্ণ প্রথা তৈরি করে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীকে নিংড়ে নেওয়ার নিষ্ঠুর প্রয়াস।

এইসব ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বর-রচিত বলে মেনে নিলেই স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই সারিবদ্ধ কিছু চিন্তার উদয় হয়।

এক : ঈশ্বর কোনও নিরাকার শক্তি নন।

দুই : ঈশ্বর নারী বিরোধী, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের বিরোধী ও নিপীড়ণকারী।

তিন : ঈশ্বর নারীদের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকদের প্রতি নিষ্ঠুর মনোভাবাপন্ন।

চার : ঈশ্বর তোয়াজ পছন্দ করেন। চাটুকারিতা পছন্দ করেন।

এরপর কিছু প্রশ্ন এসে হাজির হয়—ঈশ্বর যা বলেন, তা সবই কি সত্যি ? বাস্তবিকই কি ঈশ্বরের প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা আছে ? আদৌ কি সকলের প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা ঈশ্বরের পক্ষে থাকা সম্ভব ? দুই শত্রুপক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা জানালে দুজনেরই জয় এনে দেওয়া কি ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব ? আদৌ নয়।

○

আদৌ কি সকলের প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা ঈশ্বরের পক্ষে থাকা সম্ভব ? দুই শত্রুপক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা জানালে দুজনেরই জয় এনে দেওয়া কি ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব ? আদৌ নয়।

○

যে ঈশ্বরের নির্ধারিত নীতি অমানবিক, যে ঈশ্বর মানুষে—মানুষে বিভাজনের স্রষ্টা, শোষণ ও নিপীড়নের পৃষ্ঠপোষক, সেই ঈশ্বরকে 'ভাল', 'করুণাময়', 'পূজনীয়', 'শ্রদ্ধেয়', ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা কি মিথ্যা উক্তি নয় ?

এত মিথ্যাচারিতায় ভরা, নিষ্ঠুর, অমানবিক ধর্মগ্রন্থগুলো বাস্তবিকই যদি অপৌরুষেয় হয়, তবে বলতেই হয় ঈশ্বর চাটুকার পরিবৃত হয়ে থাকতে চাওয়া এক অসৎ ও নিষ্ঠুর সাকার কিছু এবং একই সঙ্গে শোষক ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষক। ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই দুর্নীতি ও অসততার মূর্ত প্রতিমূর্তি না হন, তবে এ কথাই স্বীকার করতে হয়, অসৎ ও নিষ্ঠুর শোষক-শাসকদের টিকে থাকার স্বার্থে এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো বুদ্ধিজীবী, সুবিধাভোগী পুরোহিতরা ও ধর্মগুরুরাই রচনা করেছিলেন এবং 'অপৌরুষেয়' বলে প্রচার করেছিলেন। উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট—শোষক-শাসক-পুরুষতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করা।

কারণ : চোদ্দ

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন কবে ?

ইসলামে ও খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন পৃথিবীর আদি মানুষ আদমের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে। ঈশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর এক জোড়া করে প্রাণী তৈরি করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। আদমের জন্ম-ও একইভাবে।

গোটা ব্যাপারটাই যে নেহাতই কল্পনা, তারই প্রমাণ হিসেবে কিছু ঘটনার শুধু উল্লেখ করছি।

খ্রিস্টপূর্ব ৪২২১ সালে মিশরে পঞ্জিকা তৈরি হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪১ সালে মিশরে বর্ষ গণনার শুরু। মিশরের নেগাদা, এমিডোস ইত্যাদি অঞ্চলের কবর খুঁড়ে পাওয়া যায় পাথরের হাতিয়ার, সোনা, রূপো ও তামার ব্যবহারের নানা নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছরের প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ সাল নাগাদ লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে 'টেপ পাওয়া'তে। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ সালেও যে লোকবসতি ছিল, তারই প্রমাণ মিলেছে সিরিয়ার উপকূলে 'বাসসামরা'তে ৪০ ফুট টিবির নীচে।

এরপরও পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরআন-এর কথা মত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ তত্ত্ব বা তথ্যকে আমরা মানি কী করে ?

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন, পৃথিবীর আদি মানুষটির নাম মনু। মনু থেকেই মানুষ প্রজাতির বিস্তার। মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন। ভগবান ব্রহ্মার দেহ থেকে মনুর সৃষ্টি।

মানুষ কত দিন এই পৃথিবীতে এসেছে ? এ'বিষয়ে হিন্দু ধর্মের মত— সেই সত্য যুগ। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মতে তিনটি যুগ অতিক্রম করে এখন চতুর্থ যুগ চলছে। অতিক্রান্ত যুগ তিনটি হল—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। এখন চলছে কলি যুগ।

যুগের হিসেব না হয়, বোঝা গেল ; কিন্তু কত বছর আগে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে ?

যুগের হিসেব ধরেই তারও হিসেব মিলবে।

যুগ	**ব্যাপ্তিকাল**
সত্য	১৭, ২৮, ০০০ বছর
ত্রেতা	১২, ৯৬, ০০০ বছর
দ্বাপর	৮, ৬৪, ০০০ বছর

অর্থাৎ, কলি যুগে পড়ার আগেই মানুষ অতিক্রম করেছে ৩৮,৮৮,০০০ বছর।

বিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ এসেছে পৃথিবীর বুকে।

বলুন তো, এরপরও ঈশ্বরের সৃষ্টি-তত্ত্বকে মানি কী করে, এবং ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসেবে মানি কী করে?

কারণ : পনেরো
অবতাররা কেন খালি ভারতে, পয়গম্বররা কেন খালি আরব ভূমিতে জন্মান?

হিন্দুদের বিশ্বাস, পৃথিবীর মানুষ যখন নানা পাপ কাজে পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে তোলে, তখন মানুষদের উদ্ধারের জন্য অবতাররা পৃথিবীতে জন্মান। অবতাররা দেবতারই অংশ।

মানুষের উদ্ধারের জন্য এ'পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মেছেন মোট দশজন অবতার। তাঁরা হলেন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

কিন্তু এঁরা সবাই ভারতেই জন্মালেন কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষরা কি তবে তখনও খুবই সৎ ছিল? নাকি, এই অবতাররা জন্মানো পর্যন্ত ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশেই মানুষ বাস করত না? বুদ্ধের জন্মাবার সময় কি ভারত ছাড়া আর কোনও দেশেই মানুষ বাস করত না?

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন ১,২৪,০০০। এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভূখণ্ডে। কেন শুধু আরবে? আরবেই কি শুধু পাপীদের বাস ছিল? নাকি অন্য সব দেশে মনুষ্য বসতি ছিল না?

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন ১,২৪,০০০। এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভূখণ্ডে। কেন শুধু আরবে? আরবেই কি শুধু পাপীদের বাস ছিল? নাকি অন্য সব দেশে মনুষ্য বসতি ছিল না?

কারণ : ষোল
ঈশ্বর কি সত্যিই মহাপ্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন?

খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন, পৃথিবীতে প্রথম

মানুষ আদম জন্মাবার ১৬৫৬ বছর পর ঈশ্বর পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করতে এনেছিলেন মহাপ্লাবন। সে সময় পাপে ভরে গিয়েছিল পৃথিবী। তাই জীবজগৎকে ধ্বংস করতে ঈশ্বর এনেছিলেন মহাপ্লাবন। জীব বলতে প্রাণী ও উদ্ভিদ সবই। সবার মধ্যেই বাসা বেঁধেছিল পাপের কালো অন্ধকার। সবার মধ্যেই জমে উঠেছিল পাপের বিষ। পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতেই সেদিন অসুন্দরকে, পাপকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রয়োজন বোধ করেছিলেন ঈশ্বর। পৃথিবীকে আবার সুন্দর করে গড়ে তুলতে ঈশ্বর সেদিন মহাপ্লাবনের থেকে রক্ষা করেছিলেন একজোড়া করে প্রাণীকে।

মহাপ্লাবন হয়েছিল প্রথম মানুষ বা আদম বা হজরত আদম-এর জন্মের (খ্রিস্ট পূর্ব ৪০০৪ সালে) ১৬৫৬ বছর পর। অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব ২৩৪৮ সালে।

মহাপ্লাবনের পর অতিক্রান্ত হয়েছে (২৩৪৮ + ১৯৯৫ =) ৪৩৪৩ বছর। আর একটি বারের জন্যেও মহাপ্লাবন হয়নি। তার মানে, পৃথিবীতে প্রথম মানুষ এলো, এবং তারপর দেড় হাজার বছর যেতে না যেতেই মানুষ তথা প্রাণিকুল এতই দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করল, যার ফলে ঈশ্বর ধ্বংসের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

প্রথম মহাপ্লাবনের পর প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর কেটে গেছে। মানুষ ও প্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে। উৎপাদনের নানা উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি দিন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষের লোভও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তারই সঙ্গে বাড়ছে যেন-তেন-প্রকারেণ লাভের পাহাড়, সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই মুহূর্তে অবক্ষয়ের থাবার নীচে গোটা পৃথিবী। 'দুর্নীতি'র অপর নাম আজ 'ক্যারিয়ারিজম'। পুলিশদের কাজ চুরি, মন্ত্রীদের কাজ লুট, ধর্মগুরুদের কাজ মন্ত্রীদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ দান। এমন শোষণ, এমন দুর্নীতি, এমন অবক্ষয়ের রেকর্ড প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার মানুষ ভেঙে দিয়েছিল, এ কথাও কোন ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তখনকার সামাজিক প্রক্রিয়া এখনকার তুলনায় ছিল অনেক বেশি সহজ-সরল। লোকসংখ্যাও ছিল এখনকার তুলনায় খুবই কম। তবু ঈশ্বর সেই সময়কার পৃথিবীর পাপ দেখে বিচলিত হয়ে মহাপ্লাবন এনেছিলেন। আজ সর্বব্যাপী পাপ দেখেও ঈশ্বর কেন বিচলিত নন ? কেন আবার মহাপ্লাবন ঘটাবার প্রয়োজন অনুভব করছেন না ? না কি বর্তমান পৃথিবীতে পাপ নেই ? অথবা 'মহাপ্লাবন' আদৌ হয়নি ? সবটাই 'গপ্পো' ? খ্রিস্টধর্মের ও মুসলিমধর্মের এই 'অভ্রান্ত-সত্য' আসলে 'অভ্রান্ত মিথ্যা ?

১

আজ সর্বব্যাপী পাপ দেখেও ঈশ্বর কেন বিচলিত নন ? কেন আবার মহাপ্লাবন ঘটাবার প্রয়োজন অনুভব করছেন না ? না কি বর্তমান

১

কারণ : সতেরো

মহাপ্রলয়ের জাহাজে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর একজোড়ার কি জায়গা হওয়া সম্ভব?

বাইবেলে বলা হয়েছে এবং মুসলিমরাও বিশ্বাস করেন, মহাপ্রলয়ের আগে একমাত্র পুণ্যবান মানুষ নোয়া'কে আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে ঈশ্বর সাবধান করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছিলেন একটা তিনতলা জাহাজ তৈরি করতে, যেটা হবে ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া ও ৩০ হাত উঁচু।

জাহাজ তৈরি হল। এরপর শুরু হল মহাপ্লাবন। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরল। বৃষ্টির প্রাবল্যে পৃথিবীর সব পর্বতের চূড়োগুলো পর্যন্ত গেল ডুবে। ডুবে মরল পৃথিবীর প্রাণিকুল। বেঁচে রইল তারা, যারা আশ্রয় পেয়েছিল জাহাজে। সেই কৃপাধন্য কারা? একজোড়া করে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী। হ্যাঁ, এত প্রলয়ের পরও তাঁরা বেঁচে ছিল, কারণ জাহাজে শুধু জোড়ায় জোড়ায় প্রাণীই ছিল না, ছিল তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাবার-দাবার।

এতো গেল ধর্মীয় বিশ্বাস। এ'বার আসুন দেখা যাক, বিশ্বাসটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু।

আবহবিদ্যার বই থেকে আমরা জানতে পারি, এক বর্গমিটার জমির উপর যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তাতে গড়ে মোটামুটি ১৮ কিলোগ্রাম জল থাকে। তবে কোনও ভাবেই ২৫ কিলোগ্রামের বেশি নয়। বায়ুমণ্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে একসঙ্গে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীর জলের গভীরতা কতটা বাড়ে, আসুন আমরা এ'বার সেটাই দেখি।

১ বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশি জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ২৫০০০ ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ কিনা, ২৫০০০ ঘন সেন্টিমিটার জল ঝরবে ১ বর্গ মিটার বা ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গ সেন্টিমিটার জমির উপর। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশি জল জমা হলে তা হতে পারে ২.৫ সেন্টিমিটার গভীর। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সব জায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলে ২.৫ সেন্টিমিটার জল জমতে পারে।

বিশ্বাস করুন, মহাপ্লাবনে সত্যিই এর চেয়ে বেশি জল কোনও ভাবেই জমা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর কোনও কোনও জায়গায় এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি অবশ্য হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রগুলোতে আশেপাশের অঞ্চলের মেঘ হাওয়ায় ভেসে বৃষ্টিপাত অঞ্চলে চলে আসে। কিন্তু মহাপ্লাবনে সারা পৃথিবী জুড়েই যদি প্লাবন হয়, তবে কোথায়ও কম, কোথাও বেশি বৃষ্টির জল জমার ব্যাপার নেই। সব জল ঝরে গোটা পৃথিবীতে জল জমলে ওই জলের গভীরতা হবে ২.৫ সেন্টিমিটারের মত। তার বেশি কোনও ভাবেই হওয়া সম্ভব নয়।

খ্রিস্ট ধর্মে ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসীদের মতে, মহাপ্লাবনে ডুবে গিয়েছিল পৃথিবীর সব পর্বতের চুড়োগুলোও। এভারেস্টের উচ্চতা ৯ কিলোমিটার। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে বৃষ্টির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছিল। এমন কিছু নয়, একটুই। মাত্র ৩,৬০,০০০ গুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছিল!

এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের একজোড়া করে নেওয়া কি সম্ভব ছিল নোয়া'র জাহাজে? সম্ভব ছিল, সেই সঙ্গে সমস্ত প্রাণীদের বেঁচে থাকার উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ঐ জাহাজেই নেওয়া?

বাইবেলে আছে, নোয়ার জাহাজটা ছিল তিনতলা। প্রতি তলা ৩০০ হাত লম্বা আর ৫০ হাত চওড়া। তখনকার দিনের লোকেদের এক হাত মানে মোটামুটি ৪৫ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ জাহাজের প্রতিটা তলা ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা, আর ৫০ × ০.৪৫ = ২২.৫ মিটার চওড়া। অর্থাৎ প্রতিটা তলায় জায়গা ছিল ১৩৫ × ২২.৫ = ৩০৩৭.৫ বর্গ মিটার। তিনটে তলা মিলিয়ে জাহাজে মোট জায়গা ছিল ৩ × ৩০৩৭.৫ = ৯১১২.৫ বর্গ মিটার।

পৃথিবীতে শুধু প্রাণীই আছে দশ রকমের PHYLUM-এর (গাছ না হয় বাদই দিলাম) ঃ—

1) Protozoa (2) Porifera (3) Coelenterata (4) Platyhelminthes (5) Nemathelminthes (6) Annelida (7) Arthropoda (8) Mollusca (9) Echinodermata (10) Chordata.

এর মধ্যে থেকে আমরা শুধুমাত্র একটা ফাইলামকেই বেছে নিচ্ছি। Chordata অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এই Chordata-দেরও আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—

(১) পাখি (২) মাছ (৩) সরীসৃপ (৪) উভচর ও (৫) স্তন্যপায়ী।

পৃথিবীতে শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীই আছে ৩৫০০ জাতের। নোয়ার জাহাজে যদি শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী জানোয়ারই নেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে প্রতি জোড়া স্তন্যপায়ীর জন্য জায়গা ছিল ঃ

৯১১২.৫ ÷ ৩৫০০ = ২.৬ বর্গমিটার। যথেষ্ট জায়গা নয় নিশ্চয়ই, বিশেষত যখন স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন, হাতি, রাইনো, হিপ্পোদের মতো বিশাল আকারের জন্তুরাও আছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, নোয়ার জাহাজে শুধুমাত্র

স্তন্যপায়ীদের জন্যেই যথেষ্ট জায়গা ছিল না। আর স্তন্যপায়ীরা তো সমগ্র প্রাণিকুলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র। তারপরও তো রয়েছে সকলের জন্য নিদেন বেশ কয়েক মাসের খাবার-দাবার রাখার জায়গায় প্রশ্ন। সমস্ত পৃথিবী মহাপ্লাবনে শেষ হয়ে যাওয়ার পর জল সরলেও খাবার মিলবে কোথা থেকে ?

বাঘ, সিংহের মত মাংসাশীরা যে মাংস খাবে, সেই সব মাংসল প্রাণীরা কোথায় ? গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদির মত তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য তৃণ কোথায় ? হাতি, জিরাফ, ইত্যাদি প্রাণীদের খাওয়ার মত গাছ-গাছড়া কোথায় ?

তিমি থেকে ভোঁদড় পর্যন্ত মৎস্যভোজীদের জন্য মাছ কোথায় ? সবার খাবার আবার নতুন করে যত দিন না পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হচ্ছে, ততদিন তো ওই নোয়ার জাহাজে রেখে দেওয়া খাবার খেয়েই প্রাণটা রাখতে হবে ! অতএব জাহাজে খাবারের স্টক বেশ কয়েক মাসের বদলে বেশ কয়েক বছরের রাখাটাই স্বাভাবিক নয় কি ? ওই বিশাল পরিমাণ খাদ্য রাখার জায়গা চাই ! কিন্তু জাহাজে জায়গা কই ?

এটা এখন নিশ্চয়ই স্পষ্টতর হয়েছে, মহাপ্লাবনের মতই নোয়ার জাহাজের ধর্মীয় বিশ্বাসও উদ্ভট কল্পনা বই কিছু নয়।

কারণ ঃ আঠেরো

'ফেরেস্তা,' 'বেহেস্ত' ও 'দোজখ' তৈরিতে আল্লাহের পরিকল্পনার অভাব এবং গোর আজাবে পক্ষপাত কেন ?

মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন, 'বেহেস্ত' ও 'দোজখ' সৃষ্টি হলেও সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় তা পড়ে রয়েছে। এই দু'য়ের ব্যবহার শুধু হবে 'কেয়ামত' বা 'মহাপ্রলয়'—এর পর। 'মহাপ্রলয়' কবে শুরু হবে ? এস্রাফিল ফেরেস্তা যবে শিঙায় তিনবার ফুঁ দেবে। শিঙায় ফুঁ পড়তেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আল্লাহের যাবতীয় সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবেন শুধু আল্লাহ এবং তাঁর তৈরি বেহেস্ত ও দোজখ। এস্রাফিল ফেরেস্তা কে ? একজন ফেরেস্তা। 'ফেরেস্তা' কী ? বলা চলে আল্লাহের দূত। এরা স্বর্গ-মর্ত্য সব জায়গাতেই বিচরণ করেন। আল্লাহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির পর পালনের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করলেন অসংখ্য ফেরেস্তা। (তবে কি আমরা ধরে নেব—সৃষ্টিকে পালন করার ক্ষমতা সর্বশক্তিমান আল্লাহের ছিল না, তাই ফেরেস্তাদের সাহায্য গ্রহণ ?)

ফেরেস্তাদের মধ্যে প্রধান চারজন। (১) জেব্রাইল, (২) মেকাইল, (৩) এস্রাফিল, (৪) আজ্রাইল।

জেব্রাইল ফেরেস্তার কাজ পয়গম্বরদের কাছে খোদাতালার আদেশ পৌঁছে দেওয়া। হজরত মোহাম্মদ পৃথিবীর শেষ পয়গম্বর। আর কোনও পয়গম্বর যেহেতু জন্মাবেন না, তাই জেব্রাইল ফেরেস্তার কাজ শেষ। কে জানে, বেচারা এখন কী করছেন ? হয়তো তাঁর অবস্থা এখন—'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে' !

মেকাইল ফেরেস্তার হাতে রয়েছে আবহাওয়া ও খাদ্য দপ্তর। মেকাইল যে খুবই অকর্মণ্য ফেরেস্তা, এটুকু বুঝতে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। অকর্মণ্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন পয়গম্বরের দেশ আরবেই বৃষ্টিপাতের নামগন্ধ নেই, নেই চাষবাস। সোমালিয়ার মুসলিমরা মারা যায় দুর্ভিক্ষে। ফি বছর বাংলাদেশের মুসলিমরা সাইক্লোন ও বন্যার কবলে পড়েন। তার দরুন ঘটে বিপুল মৃত্যু ও সম্পত্তিহানি। আল্লাহ যদি নিরপেক্ষই হন, তবে তাঁর ফেরেস্তা কী করে পক্ষপাতিত্ব দেখাবার সুযোগ পান। কী করে কোনও অঞ্চল হয় শস্যশ্যামলা, কোনও অঞ্চল চূড়ান্ত অনুর্বর ; কোনও অঞ্চলে বন্যার আধিক্য, কোনও অঞ্চলে খরার ; কোনও মানুষের ঘরে খাদ্যের প্রাচুর্য, কোনও মানুষের ঘরে চরম দারিদ্র্য।

আল্লাহ যদি নিরপেক্ষই হন, তবে তাঁর ফেরেস্তা কী করে পক্ষপাতিত্ব দেখাবার সুযোগ পান। কী করে কোনও অঞ্চল হয় শস্যশ্যামলা, কোনও অঞ্চল চূড়ান্ত অনুর্বর ; কোনও অঞ্চলে বন্যার আধিক্য, কোনও অঞ্চলে খরার ; কোনও মানুষের ঘরে খাদ্যের প্রাচুর্য, কোনও মানুষের ঘরে চরম দারিদ্র্য।

এস্রাফিল ফেরেস্তা একটা শিঙা হাতে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন, কবে আল্লাহ শিঙা ফোঁকার আদেশ দেবেন—এই প্রত্যাশায়। কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের মুহূর্তটি কবে আসবে—তা কি আল্লাহের অজানা ? তাই বহু কোটি বছর আগে থেকেই এস্রাফিলকে সৃষ্টি করে শিঙা হাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ? আল্লাহকে কেউ কি তবে কেয়ামতের দিনটি জানাবেন ? কে জানাবেন ?

আজ্রাইল ফেরেস্তার ডিউটিটা অনেকটা হিন্দুদের 'যমদূত'—এর মত। আজ্রাইল-ই মানুষের মৃত্যুর কারণ। রোগ, দুর্ঘটনা—ইত্যাদি নিমিত্ত মাত্র।

মানুষের মৃত্যু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আত্মার কাজ কী ? মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করেন মৃতকে কবর দেওয়ার পরই 'মনকির' ও 'নকির' নামের দুই ফেরেস্তা এসে মৃতকে আবার বাঁচিয়ে তোলে এবং তাকে নানা প্রশ্ন করে পরীক্ষা নেয়। উত্তরে খুশি না হলে ওই দুই ফেরেস্তা মৃতের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। শেষ অবধি গদার আঘাতে মৃতদেহকে ৭০ গজ মাটির নীচে পুঁতে রাখে। আবার মৃতদেহ তুলে এনে অত্যাচার চালায় এবং সুড়ঙ্গপথে দোজখ

বা নরকের আগুন এসে আত্মাকে জ্বালাতে থাকে। পুণ্যবানদের ক্ষেত্রে সুড়ঙ্গপথে আসতে থাকে বেহেস্তের বাতাস।

এরপর কিছু প্রশ্ন স্বভাবতই মাথায় নড়া-চড়া করে—ফেরেস্তা দু'জন মৃতদের প্রশ্ন করেন কোন ভাষায়? ফেরেস্তাদের নিজস্ব ভাষায়, না মৃত মানুষটির মাতৃভাষায়? ফেরেস্তি ভাষায় কথা বললে মৃতরা বোঝে কী করে, উত্তরই বা দেয় কী করে? মৃতের মাতৃভাষায় প্রশ্ন করতে গেলে ফেরেস্তাদের মৃতের ভাষা জনতে হবে। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫০০ ভাষা প্রচলিত। ফেরেস্তারা এত ভাষা জানেন? গোর আজাব ভোগের সময়সীমা মৃতকে কবরস্থ করা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত। কিন্তু কেউ যদি বাঘের পেটে যায়, কিম্বা যায় জলে ডুবে, অথবা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনও ধর্মীয় রীতি বা কারণের জন্য মৃতদেহকে কবর দেওয়া না গেলে, গোর আজাব হবে কী করে? কেয়ামতের পর আল্লাহ তাদের বিচার করবেন কী করে?

ধরা যাক, একজন পাপীকে কবর দেবার পর সে পাঁচ লক্ষ বছর পর্যন্ত গোর আজাবের বর্বরোচিত শাস্তি ভোগের পর কেয়ামত হল, আর এক পাপী ব্যক্তির কবর দেবার এক মিনিটের মধ্যে কেয়ামত হল। লোকটি পাপী হওয়া সত্ত্বেও গোর আজাব ভোগ করার সময়ই পেল না। ফেরেস্তা দু'জনের প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হওয়ার আগেই এসে গেল কেয়ামত। এই ক্ষেত্রে দু'জনেই পাপী হওয়া সত্ত্বেও সমান বিচার পেল কি? না, আদৌ না। একজন পেল পাঁচ লক্ষ বছরের জন্য গোর আজবে পাপের শাস্তি, আর একজন পাপ করেও গোর আজাবের শাস্তি পেল না। আল্লাহের এ কেমন সমান বিচার পদ্ধতি? এর পরও আল্লাহের বিচার ক্ষমতাকে 'শ্রেষ্ঠ' বলে চিহ্নিত করি কী করে? এত ভুল, এত পক্ষপাতিত্ব, এত আজগুবি সমবিচারের প্রহসনের পরও আল্লাহকে নির্ভুল, পক্ষপাতশূন্য এক শ্রেষ্ঠ বিচারক বলা যায় কি?

অধ্যায় ঃ তিন

ঈশ্বর বিশ্বাস : বিজ্ঞান-সভ্যতা-অগ্রগতি

কারণ ঃ উনিশ

আসলে একটা 'পাওয়ার' যে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিখুঁত নিয়মের বাঁধনে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, এটাকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই পাওয়ারকে 'ঈশ্বর' বললে ক্ষতি কী ?

রাণা ও দোলন আমার পুরোন বন্ধু। দু'জনে বিয়ে করেও ঠিক জমিয়ে সংসার পাততে পারেননি। রাণা বি ডি ও। দোলন ইনকামট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। দু'জনে দু'শহরে থাকেন। মাসে একটি দিনের জন্য সাধারণত দু'জনের দেখা হয়। বছর খানেক আগে ওদের আমন্ত্রণে কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। তুমুল আড্ডার মাঝে বহু প্রসঙ্গের মধ্যে আমাদের সমিতির কাজ-কর্মও কেমনভাবে যেন ঢুকে গেল। দুজনেই শিব-কালী-আল্লা ইত্যাদির অস্তিত্বকে 'বোগাস' বলে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আসলে একটা 'পাওয়ার' যে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিখুঁত নিয়মের বাঁধনে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, এটাকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই পাওয়ারকে কেউ যদি ঈশ্বর বলে, ক্ষতি কী ?"

প্রায় একই সুরে কথা বলেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, "জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব উন্নতির ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পদ্ধতির অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আজও জানতে পারিনি এই আলোকবর্ষের পর আলোকবর্ষ জুড়ে যে বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, তার স্রষ্টা ও পরিচালনকারী শক্তি কে ? এই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক শক্তির নাম যদি দিই ঈশ্বর, তবে তার অস্তিত্ব মানতে অসুবিধে কোথায় ?"

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই যুগের তালে তাল মিলিয়ে কিছুটা প্রগতি, কিছুটা আশৈশব বহন করা ঈশ্বর-বিশ্বাস, কিছুটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর আমিত্বের পরম বিস্ময় এবং কিছুটা অস্বচ্ছ ধারণাকে মিশিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের এক স্রষ্টা নিয়ন্ত্রক সৃষ্টি করে। এই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকই ঈশ্বর। এইসব উচ্চকোটির শিক্ষিতেরা আরও একটি যুক্তিকে কাজে লাগান—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তার স্রষ্টাও আছে।

কিন্তু তাঁরা তাঁদের যুক্তিকে 'লক্ষ্মণের গণ্ডি'র মতো এখানে আটকে রাখাকে নিরাপদ বিবেচনা করে আর এগুতে চান না। আরও একটু এগুলেই, আরও একটু যুক্তিনিষ্ঠ হলেই স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গেই প্রশ্ন আসবে—ব্রহ্মাণ্ডকে নয় সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বরকে সৃষ্টি করলেন কে? প্রশ্ন কিন্তু এখানেই থেমে থাকবে না। তারপরও প্রশ্ন আসবে—ঈশ্বরের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করলেন কে? সেই স্রষ্টাকেই বা কে সৃষ্টি করলেন? এমনি করে প্রশ্নমালা চলতেই থাকবে, শেষ সমাধানে কখনই পৌঁছানো যাবে না।

○

ব্রহ্মাণ্ডকে নয় সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বরকে সৃষ্টি করলেন কে? প্রশ্ন কিন্তু এখানেই থেমে থাকবে না। তারপরও প্রশ্ন আসবে—ঈশ্বরের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করলেন কে? সেই স্রষ্টাকেই বা কে সৃষ্টি করলেন? এমনি করে প্রশ্নমালা চলতেই থাকবে, শেষ সমাধানে কখনই পৌঁছানো যাবে না।

○

আমার এমনতর উত্তর শুনে কেউ কেউ বলতেই পারেন, "ঈশ্বর স্বয়ম্ভু"। আবারও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসবে, "ঈশ্বর যে স্বয়ম্ভু, আপনি কী করে জানলেন? কে জানালেন? কেউ জানিয়ে থাকলে, তাঁর জানাটাই যে ঠিক, তার প্রমাণ কী? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, সেই যুক্তিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া হতে বাধা কোথায়?

○

যে যুক্তিতে ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, সেই যুক্তিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া হতে বাধা কোথায়?

○

প্রকৃতিকে যাঁরা ঈশ্বর সংজ্ঞা দিতে চান, তারা প্রকৃতির নিয়মকে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ভাবলে বেজায় মুশকিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে, তাতে মানুষকে ঈশ্বরের নিয়ন্তা বলতে তো কোনও অসুবিধে দেখি না।

মজার কথা হলো, এই ধরনের চিন্তার মানুষরা নিজেদের উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত। এঁরা অনেকেই প্রকৃতি বা পরমব্রহ্ম নামক ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের আত্মাকে (!) যুক্ত করতে যোগ, মেডিটেশন, প্রাণায়াম

ইত্যাদি করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। এঁদেরই অনেকে আবার 'শব্দ = ব্রহ্ম' বলে, বিশেষ ভাবে বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে পরমব্রহ্মের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরমব্রহ্মকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। বাস্তবে এসবই তাঁদের অলীক চিন্তা। এসবের কোনওটির দ্বারাই প্রকৃতিকে সামান্যতমও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি, সম্ভব হবেও না।

কারণ ঃ কুড়ি
ঈশ্বর মানুষকে 'নিয়তি' দিয়েছেন ? না, 'সৃজনীশক্তি' ?

ঈশ্বর যে 'নিয়তি' বা 'ভাগ্য' নির্ধারণ করেন—এমনটা বহু ঈশ্বর-বিশ্বাসীরাই মনে করে থাকেন।

আবার এমনটাও অনেকেই মনে করে থাকেন—'প্রতিভা' বা 'সৃজনীশক্তি' ঈশ্বরেরই দান। তাই যদি না হবে, তবে আর একটা রবীন্দ্রনাথ, আর একটা আইনস্টাইন কেন জন্মাচ্ছেন না ?

আবার এমনও অনেকে আছেন ? যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর একই সঙ্গে মানুষের নিয়তির নিয়ন্তা এবং সৃজনীশক্তির স্রষ্টা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একবার ভাবুন তো, ঈশ্বরের পক্ষে একই সঙ্গে মানুষের 'ভাগ্যকে পূর্ব-নির্ধারিত করে দেওয়া এবং সৃজনীশক্তির অধিকারী করে দেওয়া সম্ভব কি না ! উত্তর একটাই পাবেন—সম্ভব নয়। কারণ, ভাগ্য আগে থেকেই ঠিক থাকলে সৃজনীশক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আর, সৃজনীশক্তিতেই মানুষ যদি সব কিছু গড়ে তোলে, তাহলে ভাগ্যের ভূমিকা 'ফালতু' হয়ে পড়ে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আর একটা দিক থেকে ভাবুন তো, মানুষ তার সৃজনীশক্তিতেই যদি সব কিছু গড়ে তোলে, মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তবে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ শক্তি কি তলানিতে এসে ঠেকে না ? মানুষই কি মানব সভ্যতার নিয়ন্তক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় না ?

মানুষ তার সৃজনীশক্তিতেই যদি সব কিছু গড়ে তোলে, মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তবে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ শক্তি কি তলানিতে এসে ঠেকে না ? মানুষই কি মানব সভ্যতার নিয়ন্তক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় না ?

কারণ ঃ একুশ

ঈশ্বরই সবকিছুর নিয়ন্তা হলে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা কি অর্থহীন হয়ে যায় না ?

ঈশ্বরের নিয়ন্তক শক্তিকে স্বীকার করলে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে সব কিছুর একমাত্র নিয়ন্তা বলে ধরে নিলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ, প্রশাসন, আইনের শাসন, সব কিছুকেই অস্বীকার করতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় অপরাধ যখন সংগঠিত হবার তখন হবেই। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে অপরাধী শাস্তি পাবেই। পুলিশ রেখে ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সংগঠিত কোনও অপরাধ কি ঠেকান যেতে পারে ? ঈশ্বরই সব কিছুর নিয়ন্তা হলে কখনই ঠেকান যেতে পারে না। এরপর কি পুলিশ পোষার জন্য ব্যয় একান্তই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে না ?

একজন অপরাধী বিচারে শাস্তি পাবে কি পাবে না, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা যখন বিচারকদের পরিবর্তে ঈশ্বরেরই হাতে, তখন কেন এই বিচারের প্রহসন ? এই প্রহসন কি ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি মানুষের আস্থাকে আঘাত দিচ্ছে না ? সব ধর্মের ধর্মগুরুদের কি উচিত নয়, এই বিষয়ে সরকারকে ওয়াকিবহাল করিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে আন্তরিকতার সঙ্গে সচেষ্ট হওয়া ? সেই সচেষ্ট হওয়াটা অন্তত বাবরি মসজিদ আবার গড়ে দেবার দাবির মত, বা বাবরি ভেঙে রাম মন্দির গড়ে তোলার দাবির মত জোরাল ও জঙ্গি হবে, এটুকু প্রত্যাশা নিশ্চয়ই রাখতে পারি।

আচ্ছা, এই রামমন্দির বা বাবরি মসজিদ গড়ার আন্দোলনের সত্যিই কি এক বিন্দু প্রয়োজন আছে ? কিসের জন্য এই আন্দোলন গড়ে তোলা ? রামের ইচ্ছে হলে রামমন্দির গড়ে উঠবেই। পৃথিবীর কোনও শক্তির সাধ্য নেই, তাতে বাধ সাধে। আল্লাহের ইচ্ছে হলে বাবরি মসজিদ আবার গড়ে উঠবেই। কোনও শক্তির ক্ষমতা নেই, তাকে প্রতিহত করে। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম-বিশ্বাসীদের সমস্ত রকম আন্দোলনই অপ্রয়োজনীয় এবং একান্তভাবেই মূল্যহীন। মূল্যহীন সরকারের যে কোনও উদ্যোগ।

যখন রামমন্দির বা বাবরি মসজিদ গড়তে সরকারের উপর চাপ দিতে ধর্মগুরুরা গণউন্মাদনা তৈরি করেন, তখন অবাক হতেই হয়। কারণ, ওঁরা মুখে যা বলেন, কাজে তা বিশ্বাস করেন না ! ওঁরা খুব ভাল মতই জানেন, ঈশ্বর বা আল্লাহের ক্ষমতার দৌড় কত দূর। জানেন বলেই, বিশ্বাস করেন, বিতর্কিত জমিতে মন্দির হবে কি মসজিদ, অথবা অন্য কিছু, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে সরকারের ইচ্ছের উপর। আর তাই তাঁদের ইচ্ছে পূরণের জন্য ঈশ্বর বা আল্লাহের কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে সরকারকে ভোটবাক্সের জুজুর ভয় দেখিয়ে দু'পক্ষই বাগে আনতে চাইছে।

একটা সামান্য চুড়ো বা মসজিদ গড়তে যাঁদের সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তাঁরা যখন মুখে বলেন, "ঈশ্বর বা আল্লাহের ইচ্ছেতেই সব কিছু হয়"—তখন সেই ধর্মগুরুদের 'দ্বিচারী' ও 'বুজরুক' উপাধিতে ভূষিত করলে কোনও ভুল করা হবে কি ?

একটা সামান্য চুড়ো বা মসজিদ গড়তে যাঁদের সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তাঁরা যখন মুখে বলেন, "ঈশ্বর বা আল্লাহের ইচ্ছেতেই সব কিছু হয়"—তখন সেই ধর্মগুরুদের 'দ্বিচারী' ও 'বুজরুক' উপাধিতে ভূষিত করলে কোনও ভুল করা হবে কি ?

কারণ ঃ বাইশ

ঈশ্বরই যখন সবকিছুর নিয়ন্তা, তখন রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ভূমিকা কী ?

'ঈশ্বরই সব কিছুর নিয়ন্তা'—বলে যারা বিশ্বাস করেন এবং সে'কথা প্রচারও করেন, তাঁরা কি সত্যি সত্যিই কথায়-কাজে একাত্ম মানুষ ? তাঁরা কি অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যান না ?

ঈশ্বরকে সব কিছুর নিয়ন্তা বলে স্বীকার করলে চিকিৎসাশাস্ত্রকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হয় ! কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই রোগ ও তার মুক্তি হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগমুক্তির ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই থাকতে পারে না।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা অবশ্য বড়ই করুণ। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সার্টিফিকেট পাওয়া ধর্মগুরু গৌরাঙ্গ ভারতী সবার রোগ গ্যারান্টি দিয়ে সারাবার দাবি করলেও, নিজের হেঁচকি রোগ (সব সময়ই হেঁচকি ওঠা) সারাতে তা'বড় তা'বড় কত যে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। জন্মসিদ্ধ বালক ব্রহ্মচারী দুনিয়ার মানুষের ক্যানসার থেকে এইডস পর্যন্ত সারিয়ে নিজের অসুখ সারাতে হাজির হয়েছিলেন কোঠারি হসপিটালে। সাঁইবাবা সবার রোগই সারান, নিজের রোগ সারাতে পাড়ি দেন বিদেশে। আজ পর্যন্ত যত অবতার দেখেছি, সব অবতাররাই রোগমুক্তির জন্য রোগীকে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে বললেও নিজেরা ভরসা রাখেন ঈশ্বরের পরিবর্তে ডাক্তারের উপর। কেন এই দ্বিচারিতা।

আজ পর্যন্ত যত অবতার দেখেছি, সব অবতাররাই রোগমুক্তির জন্য রোগীকে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে বললেও নিজেরা ভরসা রাখেন ঈশ্বরের পরিবর্তে ডাক্তারের উপর।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রতি অনুরোধ, অসুখ করলে আপনারা আর ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রতি সততা দেখান। তাতে আপনার সততাই শুধু প্রমাণিত হবে না, হাসপাতালগুলোতে ভিড় কমবে, সরকারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।

কারণ : তেইশ

যুদ্ধের জয় পরাজয় যদি ঈশ্বরই নির্ধারণ করেন, তবে যুদ্ধ খাতে ব্যয় বরাদ্দ অর্থহীন নয় কী ?

পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কেন জয়ী হয়েছিলেন ? দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে হিটলারপক্ষের পরাজয়ের কারণ কী ? সাদ্দাম হুসেনের ইরাক জর্জ বুশের আমেরিকার কাছে যুদ্ধে 'গো-হারা' হারল কেন ? ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যাঁরা ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে চাইবেন, হাজির করতে চাইবেন নানা তথ্য ও তত্ত্ব, ঈশ্বর-তত্ত্ব তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে, সমস্ত খুঁজে বের করা কারণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বর-তত্ত্ব মানলে মানতেই হবে—মানুষ যুদ্ধ লাগাবার কে ? মানুষ তো যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী ঈশ্বর চাইলে তবেই যন্ত্র চলে। ঈশ্বর চাইলে যুদ্ধ হবে—তাকে লঙ্ঘাবে কোন মানুষ ? যুদ্ধে হার-জিৎ ? সেও তো ঈশ্বরেরই হাতে। ঈশ্বর কাউকে জেতাতে চাইলে বিরুদ্ধে যত বড় সেনাবাহিনীই থাকুক, যত আধুনিকতম অস্ত্রই তারা প্রয়োগ করুক, ঈশ্বর-কৃপাধন্যের জয় হবেই ; তা সে পেঁপের ডাঁটা নিয়ে পারমাণবিক বোমা, লেজারগান ও মিশাইলের বিরুদ্ধে লড়লেও হবে।

বাস্তবিকই ঈশ্বরের ইচ্ছেয় যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলে যে কোনও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বাজেটে সেনা-খাতে ব্যয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

O

বাস্তবিকই ঈশ্বরের ইচ্ছেয় যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলে যে কোনও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বাজেটে সেনা-খাতে ব্যয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

O

ঈশ্বর-আল্লায় পরম বিশ্বাসী রাষ্ট্র নায়কর‍্যা যখন সেনা-খাতে ব্যয় বরাদ্দ করে, তখন তাদের স্ব-বিরোধী চরিত্রই প্রকট হয়ে ওঠে ; যে চরিত্র একই সঙ্গে ঈশ্বরের শক্তিকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করে !

কারণ : চব্বিশ

মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তক শক্তি ঈশ্বর, না গ্রহ-নক্ষত্র ?

জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে—মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। জন্মের সময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

জ্যোতিষীদের এই দাবিকে স্বীকার করার অর্থ মানুষের ভাগ্যের নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা।

○

জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে—মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। জন্মের সময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। জ্যোতিষীদের এই দাবিকে স্বীকার করার অর্থ মানুষের ভাগ্যের নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা।

○

অর্থাৎ স্পষ্টতই জ্যোতিষ বিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাস একে অন্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। দুই বিশ্বাস একান্তভাবেই পরস্পর বিরোধী। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, প্রত্যেক জ্যোতিষীর কি চেম্বারে, কি বাড়িতে, ঠাকুর-দেবতার ছবির ঠাসাঠাসি ভিড়। ধর্মগুরু ও অবতারদের হাতের আঙুলে, বাহুতে, গলায় গ্রহরত্নের চলমান প্রদর্শনী।

এমন স্ববিরোধিতার কারণ কী? তবে কি ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা ততটা জোরালভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? দ্বিধাগ্রস্ত? জ্যোতিষীরাও ততটা গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না? দ্বিধাগ্রস্ত?

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে জীবিকা করা ধর্মগুরুরাই যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে দ্বিধাগ্রস্ত হন, তবে সাধারণ মানুষ দ্বিধামুক্ত হবে কোন যুক্তিতে? এরপর যদি বলি, "ঈশ্বর-নির্ভর ধর্মশাস্ত্র আরামভোগী, অন্নচিন্তাহীন, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া একদল 'ধর্মগুরু' নামের প্রতারকদের করে খাওয়ার শাস্ত্র"—ভুল বলা হবে কি?

কারণ : পঁচিশ

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—তবু সেই স্বল্প জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

সালটা ১৯৬২। তখন কলেজে পড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়েছিলাম দেওঘর। দেখা করলাম পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম—ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত, অথবা ঈশ্বর কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচারিত কারও সে ক্ষমতা বাস্তবিকই আছে, প্রমাণ না পাওয়া

পর্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়াটা কি ঠিক ? আপনি যদি ঈশ্বর দেখার একটা ব্যবস্থা করে দেন, বা কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখান, তারপর আমার পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়াটা যুক্তিপূর্ণ হবে।

উত্তরে অনুকূলচন্দ্র যা বলেছিনে, তা মোটামুটি এই ঃ আজ কিছুই দেখাচ্ছি না। না ঈশ্বর, না অলৌকিক ক্ষমতা। আজ শুধু রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটা মনে করিয়ে দিই, "পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব কি নেই ? কতটুকু জানো ? জানাটা এতটুকু, না জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।"

অনুকূলচন্দ্র তারপর কোনও দিনই আমাকে ঈশ্বর বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখাননি। তবে তিনি পরিবর্তে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সে কথা বহুবার বহুজনের মুখ থেকেই শুনতে হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর এই রকম— যারা ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে, তা না জেনেই করে, অজ্ঞতা থেকেই করে, অনেক কিছু জানার অহমিকা বোধ থেকেই করে। যদি জানত তাদের জানাটা কত ক্ষুদ্র, আর না জানাটা কত অসীম, তা হলে এ'ভাবে কোনও কিছুকে এক কথায় নাকচ করত না, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তো নয়ই। আমাদের উচিত যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে না জানা বিষয়কে নাকচ না করা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে যে কোনও অস্তিত্বহীনের অস্তিত্বই প্রমাণ করা যায়। যেমন ধরুন, আমি যদি বলি, আকাশ থেকে মাঝে-মাঝে ডিম বৃষ্টি হয়। তবে এই ডিম-বৃষ্টি কখন কোথায় হবে, তার আগাম হদিস অবশ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এই ডিমগুলো মাটিতে পড়ার আগেই সেগুলো ফুটে বের হয় চব্বিশ ক্যারেট সোনার দুশো গ্রাম ওজনের একটা করে জীবন্ত পাখির বাচ্চা। বাচ্চাগুলো জন্মে মাটিতে না পড়ার আগেই উড়তে উড়তে চলে যায়।

অনুকূলচন্দ্র ইত্যাদিদের যুক্তিতে বিশ্বাসী হলে আপনি কোনওভাবেই আমার এই বক্তব্যকে নাকচ করতে পারছেন না। আপনি কোনওভাবে যুক্তি হাজির করতে গেলে আমি বলব, "পৃথিবীর কতটুকু আপনি জানেন ? এই ধরনের পাখির অস্তিত্ব বিষয়ে আপনার জানা নেই বলে এর অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।"

এই একই কারণে 'কতটুকু জানি' মার্কা কথার ধোঁয়াশার বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারি না। যতটুকু জানি, সেইটুকুতে আস্থা আছে বলেই পারি না।

কারণ : ছাব্বিশ

ঈশ্বরবাদীদের প্রশ্ন—অনেক বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর অবিশ্বাসই শেষ কথা হতে পারে কি ?

বিশ্বের বহু বরেণ্য বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেই তাঁদের নবতম আবিষ্কারকে, তাঁদের দেওয়া নবতম তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরাই সবচেয়ে বেশি সন্দেহের চোখে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়েছে। সন্দিগ্ধ বিজ্ঞানীরা ওইসব বরেণ্যদের মতামতকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আজ কিছু বিজ্ঞানীদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহে আদৌ প্রমাণিত হয় না যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস ভ্রান্ত এক অন্ধবিশ্বাস। বিজ্ঞানীদের সন্দেহই যদি শেষ কথা হত, তবে নিউটন থেকে শুরু করে ফ্র্যাংক জে টিপলার পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেন না বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু থেকে জে. বি. এস. হ্যালডেন পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্বে, অধ্যাত্মবাদে ও অলৌকিকতায় আস্থাশীল হতেন না। সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ঈশ্বরে গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করতেন না।

বিজ্ঞান যেহেতু পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তাই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আসে পরীক্ষার প্রশ্ন, সন্দেহের প্রশ্ন। এ'সবের পরিবর্তে ব্যক্তি-বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে গেলে, ব্যক্তি-বিশ্বাস বা ব্যক্তির দাবিকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিলে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান থাকত না। পরীক্ষিত সত্যকে বিজ্ঞান মর্যাদা দেয়। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা যেদিন ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিতে পারবেন, পারবেন সেই সংজ্ঞায় বাঁধা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে, সেদিন নিশ্চয়ই বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেবে।

ঈশ্বর বিশ্বাসীরা যেদিন ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিতে পারবেন, পারবেন সেই সংজ্ঞায় বাঁধা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে, সেদিন নিশ্চয়ই বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেবে।

আমরা নিশ্চয়ই এইসব ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও অধ্যাত্মবাদে আস্থাশীল বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মূলগতভাবে অশ্রদ্ধেয় মনে করি না, বা অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি প্রচারের ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলেও মনে করি না। বরঞ্চ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের কাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি ও স্মরণ করি। আমরা জানি তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার পিছনে রয়েছে তাঁরা যে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন, সেই পরিবেশের প্রভাব।

স্বীকার করছি, শুধু এদেশের নয়, পৃথিবী জুড়েই বহু বিজ্ঞান পেশার মানুষই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। আবার এ'কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই

এই সব বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে যুক্তিহীন এক অন্ধ-বিশ্বাস। অর্থাৎ একই সঙ্গে পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু মানসিকতায় বিজ্ঞান-বিরোধী। এমন স্ববিরোধিতার কারণ, আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

আপনার আশে-পাশে একটু তাকান। দেখতে পাবেন প্রায় প্রতিটি পরিবারের শিশুরাই বেড়ে উঠছে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের মধ্যে। শিশুকে পরিবারের মানুষরা শেখান— "ঠাকুর নম কর"। শিশু দেখে 'রোজা' 'নামাজ'। শেখে ফি হপ্তায় গির্জায় যেতে। স্কুলে পড়ে ঠাকুর-দেবতা, আল্লাহ, যিশুর নানা অলৌকিক কাহিনী! সিনেমায়, টিভিতে, যাত্রায় কত না ঈশ্বর-তত্ত্বের, ভুতুড়ে কাহিনীর, অলৌকিক-ব্যাপার-স্যাপারের ছড়াছড়ি। পরিচিত হয়, নানা ধর্মের নানা আচার-আচরণের সঙ্গে। শোনে নানা ভরের কাহিনী। কোথাও ভর করে মনসা-শীতলা-কালী কি মহাদেব, কোথাও বা ভয় করে জীন কি ফেরেস্তা। ভরগ্রস্তদের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের মুখের কাহিনী অন্যকেও প্রভাবিত করে। প্রভাবিত করে ধর্মীয়-গ্রন্থ, প্রচারমাধ্যম ধর্মীয় উন্মাদনা। এমনই পরিবেশের মধ্যে প্রায় সকলেই বেড়ে উঠেছে, তা সে ভাল ছাত্রই হোক বা খারাপ ছাত্রই হোক। ফলে লেখা-পড়ায় ভাল ছেলে-মেয়েরাও যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যেই পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার সুবাদে সাধারণভাবে দৌড়োয় ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনো করতে। আমাদের এই অনিশ্চয়তায় ভরা সমাজে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা এখনও এইসব বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনো শেষ করে বেরলে বেশি বলেই, ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবারা তাঁদের এ'সব লাইনে পড়তে ঠেলে দেন। ফলে এরা বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করে ধর্ম বিশ্বাসে গা ডুবিয়ে রেখেই। যখন সাফল্যের সঙ্গে এঁরা ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন এঁরা—বিজ্ঞানেও থাকেন, ধর্মেও থাকেন। এঁরা জীবনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন না। বিজ্ঞান এঁদের অনেকের কাছেই শুধুই একটা পেশা থেকে যায়, যেমন পেশা জমির দালালি বা আলু-পটলের ব্যবসা।

এঁদের সকলেই যে বিজ্ঞানকে শুধু একটা 'পেশা' হিসাবে গ্রহণ করে সুখী থাকেন, তেমন নয়। ব্যতিক্রমী কেউ কেউ বিজ্ঞানকে 'জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস', 'বেঁচে থাকার আনন্দ' হিসেবেই গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদেরও অনেকের মধ্যে থেকে যায় আজন্ম-লালিত ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে শুরু করে অনেক বিষয়েই অন্ধ-বিশ্বাস।

○

এইসব ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের কেউ যেদিন বিশ্বাসের গণ্ডি পেরিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারবেন, সেদিন তাঁদের মতকে নিশ্চয়ই আমরা মেনে নেব।

○

এইসব ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের কেউ যেদিন বিশ্বাসের গণ্ডি পেরিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারবেন, সেদিন তাঁদের মতকে নিশ্চয়ই আমরা মেনে নেব। কিন্তু তার আগে শুধুমাত্র 'বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বিশ্বাস' বলে মেনে নিই কী করে ? তেমন করতে হলে বহু অস্তিত্বহীন বিষয়কে এক্ষুনি-এক্ষুনি আমাদের মেনে নিতে হয়। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ জীবনে অনেক অলৌকিকবাবার চরণেই মাথা ঠেকিয়েছেন। কিছু কিছু অলৌকিকবাবাজী-মাতাজীরা আচার্যদেবের ভক্তিগদগদ সার্টিফিকেট ও ছবি নিজেদের প্রচারমূলক বইতে ছেপে থাকেন। বিজ্ঞানাচার্য অলৌকিকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, এই দোহাই দিয়ে কি আমরা তবে অলৌকিকের মত অলীক, অন্ধ-বিশ্বাসকে মেনে নেব ? হ্যালডেন টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন আত্মার অমরত্বে। তাই বলে কি আমরা তাঁর এইসব অদ্ভুত ছাই-পাঁশ চিন্তায় বিশ্বাস করব ? যে কারণে তাঁদের এই অন্ধ-বিশ্বাসকে বিজ্ঞান মানে না, যুক্তি মানে না, আমরা মানি না, সেই একই কারণে তাঁদের ঈশ্বর বিশ্বাসও বিজ্ঞান মানে না, যুক্তি মানে না, আমরা মানি না।

একটি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে লেখা হয়েছিল, "*চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান, বিজ্ঞানী রকেটের মহাকাশ-যাত্রার সাফল্য কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এ ঘটনা বিরল নয়।*"

কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটনা কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। বড় জোর এটুকুই প্রমাণিত হতে পারে, ওই বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে কি ?

আইনস্টাইন নিয়ে বিভ্রান্তি

এরপরও আইনস্টাইনের ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে বাড়তি কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। সম্প্রতি এদেশের জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রথম শ্রেণীর প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম মনীষা আইনস্টাইনকে 'ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী' বলে কোনও বিশেষ পরিকল্পনার ছক মাথায় রেখে যেভাবে চিত্রিত করে চলেছে, বাস্তব চিত্র কিন্তু আদৌ তা নয়। বরং প্রথমেই নির্দ্বিধায় জানিয়ে রাখি, আইনস্টাইন যে কোনও স্থূল কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বর্গ-নরক মার্কা পাপ-পূণ্যবোধে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এ কথাও বলে রাখা ভাল, তিনি ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী হলে, কখনই তাঁকে অন্যরকমভাবে চিত্রিত করতে সচেষ্ট করতাম না। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আইনস্টাইনের একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়। কারও ব্যক্তি বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল নয়।

আইনস্টাইনের বিশাল মনীর সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে জড়িয়ে ছিল এক মানবতাবাদী, মুক্ত মনন। ধর্মের যে সব স্থূল দিকগুলো মানুষকে চোখ রাঙিয়ে আনুগত্য শেখায়, তাকে তিনি বলেতন 'রিলিজিয়ন অফ ফিয়ার'। এবং তাকে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ঘৃণা করতেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পুরোহিততন্ত্রকে চূড়ান্ত অপছন্দ করতেন। একইভাবে অপছন্দ করতেন লাভ-ক্ষতি-নরকভীতি থেকে উৎসারিত ধর্মভীরুতা। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নিজস্ব বিশ্বাস, প্রথা, আচার-আচরণগত ঐতিহ্য থাকে, সে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ধর্মীয় "*সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যগুলোকে আমি শুধু ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকেই গুরুত্ব দিতে পারি ; এ'সবের আর কোনও গুরুত্ব আমার কাছে নেই।*" [আইডিয়াস্ অ্যান্ড ওপিনিয়নস্, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৬২]

যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলো ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকারকে আক্রমণ করলেই ধর্মীয় শিবির সেই আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাব না দিয়ে পালাবার ফিকির খোঁজে। বিজ্ঞান এখনও যে সব বিষয়ে জানতে পারেনি, সে'দিকে আঙুল দেখায়। বিজ্ঞানের ও যুক্তির আলো থেকে ধর্মের এই ক্রমাগত অন্ধকারে পালিয়ে বেড়ানোর স্বভাবকে আইনস্টাইন কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর কথায়, "*কিন্তু আমি বুঝি যে, ধর্মীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে এমন ব্যবহার শুধু যে অপদার্থতা, তা নয়, উপরন্তু মারাত্মক। কারণ একটি মতবাদ যা নিজেকে পরিষ্কার আলোর মধ্যে বাঁচাতে না পেরে কেবলই অন্ধকারে গিয়ে লুকোয়, তা নিশ্চিতভাবে মানবপ্রগতির গণনাতীত ক্ষতি করে*" [ঐ গ্রন্থেরই পৃষ্ঠা ৪৮]।

একজন মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা যে অনেক জরুরি, এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর কথায়, "*একজন মানুষের নৈতিক আচার-ব্যবহারের ভিত্তি হওয়া উচিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি, শিক্ষা এবং সামাজিক বন্ধন বা সামাজিক দায়বদ্ধতা : কোনও ধর্মীয় ভিত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষকে সংযত করার জন্য যদি তাকে শাস্তির ভয় দেখাতে হয়, বা মৃত্যুর পরেব পুরস্কারের লোভ দেখাতে হয়, তাহলে মানুষের কাছে তা হবে লজ্জার ব্যাপার।*" [ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩৯]।

আইনস্টাইন ধর্মীয় দর্শনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন। এক ঃ 'রিলিজিয়ন অফ ফিয়ার' বা ভয়ের ধর্ম ; যে বিষয়ে তাঁর মনোভাব আগেই জানিয়েছি। দুই ঃ 'মরাল রিলিজিয়ন' বা ধর্মের নৈতিকতা ; যে বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট—মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা—সামাজিক দায়বদ্ধতা—সহানুভূতির ভূমিকা প্রবল। ধর্মের অনুশাসনের নামে ভয় বা লোভ মানুষকে মানুষ করে তোলে না। যা নিয়ে উপরের পংক্তিতেই আলোচনা করেছি। তিন ঃ 'কসমিক রিলিজিয়ন' বা মহাজাগতিক ধর্ম। এই ধর্ম ছিল তাঁর কাছে একান্তই এক বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত আবেগ ; যে বিজ্ঞানী মহাজগতের জটিলতা,

কার্য-কারণ-এর শৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন এবং সেই রহস্যের গভীরে ডুবে থাকতে চেয়েছেন। এখানেই তিনি তাঁর ঈশ্বর বিষয়ে ধ্যান-ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়, "*আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে প্রকাশমান এক উচ্চতর মনের অস্তিত্বে এই যে গভীর অনুভূতি মাখানো পরম বিশ্বাস, এই-ই হল ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণা।*" [ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২৬২]

এরপর আমরা নিশ্চয়ই বুঝে নিতে পারি, আইনস্টাইন কোনও সৃষ্টিছাড়া, ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক ঘটনা বা ক্ষমতার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেননি। বরং তিনি ঈশ্বরকে দেখেন সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য, কঠোর বৈজ্ঞানিক নিয়মচালিত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। তাঁর ধারণার নিরাসক্ত গাণিতিক ঈশ্বর বস্তুবিশ্বে লীন হয়ে আছেন, প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের নিখুঁত ছন্দের মধ্যে দিয়ে, তাঁর প্রকাশ ঘটেছে।

আর এখানেই এসে পড়ে এক অনিবার্য প্রশ্ন। প্রাকৃতিক নিয়মকানুনই যদি ঈশ্বর হয়, আর তা যদি সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্যই হয়, তবে তাকে নিছক 'প্রাকৃতিক নিয়মকানুন' না বলে 'ঈশ্বর' আখ্যা দিতে যাবার প্রয়োজনটা কী? উত্তরটা শোনা যাক আধুনিককালের একজন প্রথম সারির খ্যাতিমান নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গের কাছ থেকে। তাঁর কথায়, "বিজ্ঞানী ও অন্যান্যরা মাঝে মাঝে 'ঈশ্বর' শব্দটাকে এমন এক বিমূর্ত ও নিরাসক্ত অর্থে ব্যবহার করেন যে তাকে প্রকৃতির নিয়ম থেকে আলাদা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন "*স্পিনোজার ঈশ্বরকে, যিনি সমগ্র অস্তিত্বের ছান্দসিক নিয়মিতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু যিনি মানুষের কাজকর্ম ও ভাগ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সেই ঈশ্বরকে নয়।*" [ড্রিমস অফ এ ফাইনাল থিয়োরি, পৃষ্ঠা ১৯৬]

বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করতে আরও দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। 'দি ইকোনমিক টাইমস' পত্রিকায় (১৮ নভেম্বর '৯৫) আমার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি শেষ করা হয় এ'ভাবে—"বিজ্ঞানই প্রবীরের ঈশ্বর"। এই 'ঈশ্বর' প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দেওয়া ঈশ্বর সংজ্ঞায় আবদ্ধ নয় যেমনটা আবদ্ধ নয় আইনস্টাইনের ঈশ্বর। আমার বান্ধবী মিস্টুন একবার আমাকে বলেছিলেন, "কেউ যদি বলেন, তাঁর কাছে প্রেমই ঈশ্বর, ক্ষতি কী? এই প্রেম মনের এক গভীর অনুভূতি। তাঁর এই ঈশ্বর মানুষের প্রার্থনা পূরণে, পাপ-পুণ্য নির্ধারণে, ভাগ্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে না।"

আইনস্টাইনের 'ঈশ্বর' কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধারণার 'ঈশ্বর' না হয়ে, হয়ে উঠেছিল 'বিজ্ঞান' বা 'প্রেম'-এর প্রতীকের মতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলার প্রতীক। এর বাড়তি কিছু নয়।

○

আইনস্টাইনের 'ঈশ্বর' কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধারণার 'ঈশ্বর' না

হয়ে, হয়ে উঠেছিল 'বিজ্ঞান' বা 'প্রেম'-এর প্রতীকের মতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলার প্রতীক। এর বাড়তি কিছু নয়।

○

কারণ : সাতাশ

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান শেষপর্যন্ত পরমচৈতন্যে গিয়ে পৌঁছেছে। পরমব্রহ্ম ? শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা।

এ'জাতীয় বক্তব্য কোনও হেলা-ফেলার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে এপার বাংলার সবচেয়ে নামী-দামী ঝাঁ চকচকে সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'-এর ২২এপ্রিল, ১৯৯৫ সংখ্যায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ঃ 'বিজ্ঞান ও ভগবান'। লেখক হৃষীকেশ সেন। শ্রীসেন জানিয়েছেন, বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে যেটুকু জানে, প্রাচীন আমলের বা পুরাকলের পিছিয়ে থাকা জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে মানুষ (এই পিছিয়ে থাকা জ্ঞানভাণ্ডারের কথা শ্রীসেনই স্বীকার করেছেন) বহু আগেই সে'সব জেনে ফেলেছিল।

শ্রীসেনের বক্তব্যের স্ববিরোধিতাটুকু বড় বেশি নজর কাড়ার মত। তারপরও দেখা যাক, শ্রীসেনের ধারণা মত পিছিয়ে থাকা জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে পুরাকালের মানুষ কী জেনেছিল ?

হিন্দু দর্শনে জীবের আত্মাকে জীবাত্মা ও বস্তুর আত্মাকে ভূতাত্মা বলে। অর্থাৎ বস্তুর চৈতন্য বা আত্মা যে আছে, এ' ধারণায় প্রাচীন হিন্দু দর্শন পৌঁছেছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুর চৈতন্যের ধারণা এলো। এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যার রূপকাররা পদার্থবিদ্যার জটিল তত্ত্ব ও জটিলতর অঙ্ক নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বস্তুজগৎ ছাড়িয়ে শেষপর্যন্ত অখণ্ড পরমচৈতন্যে গিয়ে পৌঁছেছেন।

শ্রীসেনের এই ধরনের বক্তব্য বহু পাঠক-পাঠিকাকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলিয়ে দিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ এই প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চেয়ে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির দপ্তরে চিঠিও এসেছে প্রচুর।

শ্রীসেনের এই অতিসরলীকৃত ধারণা বা উদ্দেশ্যমূলক ধারণা প্রচারের পিছনে আদৌ কোনও বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভিত্তি আছে কি না, দেখা যাক।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নানা ধারা আমাদের পরিচিত করিয়েছে পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথের ইলেকট্রনের গতিবিধির তাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে, পরিচিত হয়েছি অন্যান্য বহু কণার সঙ্গে, তাদের নানা ধর্মের সঙ্গে। বস্তুর মৌলকণা অণু-পরমাণুর গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অজস্র কণার সন্ধান আমরা পেয়েছি। জেনেছি, প্রোটন-নিউট্রন ছাড়াও গুচ্ছের বেরিয়ন-কণা, ইলেকট্রন ছাড়াও একগাদা

লেপ্‌টন-কণা, সবই বস্তুর সূক্ষ্মতম কণাজগতে ঘাঁটি গেড়েছে। এরই সঙ্গে রয়েছে বলের আদান-প্রদানের জন্য একগুচ্ছ মেসন-কণা ও ফোটন-কণা। অসংখ্য এই কণার রাজ্যে বস্তুর মৌলরূপের পরিচয় এখনও প্রশ্নাতীত ভাবে বিজ্ঞানের কাছে ধরা পড়েনি। গভীর দৃষ্টিতে এই জাতীয় কণাবস্তুর আচরণ কিছুটা অবস্তু-সুলভ ঠেকে, কিন্তু তাকে কোনও ভাবেই চৈতন্যের প্রমাণ হিসেবে বিজ্ঞান গ্রহণ করেনি।

শ্রীসেন বস্তুর চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠা করার তীব্র আকুতিতে কিছু বিজ্ঞানীর মতামত হাজির করেছেন ; যে-সব মতামত স্পষ্টতই অনুমানমাত্র, কোনও প্রমাণিত সত্য নয়। চৈতন্য যদি বস্তুর মৌলরূপ হয়, তবে বিজ্ঞান একদিন তা প্রমাণও করবে। যতদিন না প্রমাণ হচ্ছে, ততদিন এই অনুমান বা কল্পনাকে 'বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত' বলে প্রচার করাটা আদৌ নৈতিক নয়। তবে সন্দেহের অবকাশ থেকে গেল, এই ভ্রান্ত বা মিথ্যে লেখা ও প্রচারের পিছনে অজ্ঞতা কতটা দায়ী ? নাকি এর পিছনে রয়েছে গভীর কোনও পরিকল্পনা ?

চৈতন্য যদি বস্তুর মৌলরূপ হয়, তবে বিজ্ঞান একদিন তা প্রমাণও করবে। যতদিন না প্রমাণ হচ্ছে, ততদিন এই অনুমান বা কল্পনাকে 'বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত' বলে প্রচার করাটা আদৌ নৈতিক নয়।

কারণ : আঠাশ
ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায় ?

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধারক-বাহকরা, ধর্মীয়বেত্তারা, বুদ্ধিজীবী ধর্মগুরুরা অধুনা প্রচার শুরু করেছেন—প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ভুলিয়ে সকলকে একই গণউপাসনায়, গণপ্রার্থনায় মেলাতে পারে এবং মিলিয়ে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়।

কিন্তু, এ তো কোনও কাম্য মিলন হতে পারে না ! এ তো ধনী-দরিদ্রের বাস্তব বিভেদ মেটানোর কোনও পথ নয় ! শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক ভেঙে সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনও দিশা নয় ? এ তো অলীক বিশ্বাসের, ভ্রান্ত চেতনার ঐক্য ! অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে, শোষিতদের ক্ষোভকে বের করে দিতেই এই ঐক্য। শোষিতদের ক্ষোভকে বিস্ফোরিত হতে না দেওয়ার স্বার্থে ঐক্য। এই ঐক্য, এই আবেগময় ধর্মীয় গণজমায়েত প্রায়শই গণহিস্টিরিয়া তৈরি করে। এবং এ জাতীয় গণহিস্টিরিয়া ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা-সমাজ চেতনা-সামাজিক দায়িত্ববোধকে গুলিয়ে দেয়, ভুল পথে চালিত করে। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ঐক্য ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্য বা অনৈক্যকে বাস্তবে টিকিয়ে

রাখার স্বার্থে অবাস্তব এক 'ছেলে-ভোলানো ললিপপ' ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না।

শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ঐক্য ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্য বা অনৈক্যকে বাস্তবে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অবাস্তব এক 'ছেলে-ভোলানো ললিপপ' ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না।

বৈষম্যের অনৈক্যকে টিকিয়ে রেখে কখনই সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যের অলীক চিন্তা অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই উঠে এসেছে।

কারণ : উনত্রিশ

দুর্গা কি দুর্গতি নাশ করেন? লক্ষ্মী কি ধনরত্ন বিলোবার একমাত্র মালকিন? সরস্বতী জ্ঞান দানের একমাত্র দেবী? গণেশ ব্যবসা ভাল-খারাপ চালাবার একমাত্র অধীশ্বর? 'শবেবরাত' বা 'ভাগ্য খোলার রাত'—এ খোদাতালার গুণগান গাইলে তবেই এক বছরের আর্থিক ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়?

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা হিন্দু প্রধান এই ভারতে প্রতি বছরই প্রবল থেকে প্রবলতর জাঁকজমক নিয়ে ফিরে আসেন পুজো পেতে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, দুর্গাপুজোর রমরমা ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষ্যের দুর্গতি প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। দেশে আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। আইন আজ পুলিশ-প্রশাসন—রাজনীতিক ও ধনীদের বুটের তলায় ফুটবল। পুলিশ বা রাজনীতিকের হাতে আপনি যদি আগামী দিনে খুন হন, আপনার প্রিয়জনেরা খুনিদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। উল্টে আপনার কপালেই দেগে দেওয়া হবে 'সমাজবিরোধী' শিরোপা। আপনি যদি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হন, 'খারাপ মেয়েছেলে' শব্দটি আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। যেন আমাদের দেশের সংবিধান বিচার ব্যবস্থাকে শিকেয় তুলে রেখে সমাজবিরোধীদের খুন করার অধিকার ও খারাপ মেয়েছেলেদের ধর্ষণ করার অধিকার কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতাভোগীদের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছে।

রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তির প্রচার ভুলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনি যদি কোমর সোজা করে বুখে দাঁড়াতে যান, আপনার কোমর ভাঙতে করুণাহীন দৃঢ়তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিশ-প্রশাসন-রাজনীতিকরা। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আপনি যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন, রাষ্ট্রশক্তি আপনার পিছনে গোয়েন্দা-ফেউ লাগিয়ে দেবেই,

একশো পারসেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি। অসাম্যের সমাজ কাঠামো ভেঙে সাম্যের সমাজ গড়ার দার্শনিক আত্মোপলব্ধি নিয়ে, বঞ্চনা ও অবিচার সম্পর্কে দার্শনিক আত্মোপলব্ধি নিয়ে আপনি যদি অসুরের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ সংগ্রামে নামেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'উগ্রপন্থী' তকমা আপনার দলের গায়ে সেঁটে দেওয়া হবে। প্রচারের অপার মহিমায় 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'ক্রিমিনাল' শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়-পাঠক-পাঠিকা, একটু ভাবুন তো,একটা পচন ধরা সমাজে সৎ, আদর্শবাদী, সাম্যকামী মানুষরা বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য কি না? 'বিচ্ছিন্নতা' কী? সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র, সাধারণের থেকে আলাদা, সকলের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারা। গ্যালিলিও থেকে বিদ্যাসাগর, প্রত্যেকেই সেই সময়কার সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

যে সমাজে দুর্নীতি সমুদ্রগভীর, যে সমাজে শাসকের গদিতে বসতে ধনকুবেরদের কাছে ভিক্ষাপাত্র ধরতে হয়, যে সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি কোন পথে চলবে, তা ঠিক করে দেয় টাকার কুমিররা, যে সমাজে বৈষম্য ও শোষণ লাগাম-ছাড়া, সেই সমাজ থেকে কোনও জনগোষ্ঠী যদি বেরিয়ে যেতে চায়, তবে তাদের সেই উচ্চশির স্পর্ধিত সংগ্রামকে কুর্নিশ জানানই প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই 'উচিত'টাই ঘটছে না শাসক ও শোষকশ্রেণীর সুনিপুণ মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে।

সাহিত্যে-নাটকে-পর্দায় এমন অনেক চরিত্র হাজির হয় যারা নৈরাশ্যতাড়িত, বিকারগ্রস্ত, একাকিত্বের শিকার এক মানসিক রোগী। মগজ ধোলাইয়ের কৃপায় শুধু এইসব নেতিবাচক চরিত্রগুলোকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন বলে আমরা ধরে নিই। ফলে এই মগজ ধোলাইয়ের ফল-স্বরূপ আমরা ভুলে থেকেছি—ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী মানুষদের স্বাভাবিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামও 'বিচ্ছিন্নতা'। যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সেই বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মানুষের কাম্য, মানবসভ্যতার কাম্য। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এমন ক্ষেত্রে আপনি-আমি-আমরা কি মানব সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে পচনধরা সমাজের বিরুদ্ধে কোনও জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবো না? জনগোষ্ঠীর সংগ্রামগুলোর প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে সমর্থন করবো না? অবশ্যই করব।

যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সেই বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মানুষের কাম্য

এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কখনই বহু রক্তঝরানো সংগ্রাম ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কারণ শোষক-শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই কোনও জনগোষ্ঠীকে তাদের শোষণ-আওতার বাইরে যেতে দেবে না। শোষক-শাসকগোষ্ঠীর কাছে এটা শুধুমাত্র একটি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কায়েম করার লড়াই নয়। তারা জানে, একটি বিচ্ছিন্নতাকামী জনগোষ্ঠীর জয় আরও বহু সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্নের জন্ম দেবে, আরও বহু বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দেবে। আর তাই শাসক-শোষকগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাকামী জনগোষ্ঠীর উপর তীব্র থেকে তীব্রতর সন্ত্রাস চালাতে থাকে। এই সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কায়েম করতে বিচ্ছিন্নতাকামী জনগোষ্ঠীকে পাল্টা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতেই হয়। অমনি শোষক-শাসকগোষ্ঠী তাদের সহযোগী প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাকামী জনগোষ্ঠীর গায়ে 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'টেররিস্ট' শব্দটি দেগে দেয়। প্রচারের মহান ক্ষমতায় 'টেররিস্ট' ও 'ক্রিমিনাল' শব্দদুটি আমাদের কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

শোষক-শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসবাদী' এমন একজন মানুষ যে বঞ্চনা ও অবিচারের সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার উপর গড়ে তুলতে চায় এক বঞ্চনাহীন মানব-সমাজ। একজন টেররিস্ট-এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে জগতের বঞ্চনা ও অবিচার সম্পর্কে দার্শনিক আত্মোপলব্ধি। এই ধরনের দর্শনবোধ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যারা সমাজের উপর ধ্বংসের লীলা চালায় আপন ভোগবাদী মানসিকতাকে চরিতার্থ করতে, তারা 'ক্রিমিনাল'। শাসক-শোষকগোষ্ঠীর পক্ষে আইনকে পরোয়া না করে লুঠ-ধর্ষণ-অত্যাচার-হত্যার সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ভাড়াটে সেনা-পুলিশরা তাই শেষ পর্যন্ত আর 'সন্ত্রাসবাদী' হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে সবচেয়ে সংগঠিত ক্রিমিনাল।

O

একজন 'টেররিস্ট'-এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে জগতের বঞ্চনা ও অবিচার সম্পর্কে দার্শনিক আত্মোপলব্ধি। এই ধরনের দর্শনবোধ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যারা সমাজের উপর ধ্বংসের লীলা চালায় আপন ভোগবাদী মানসিকতাকে চরিতার্থ করতে, তারা 'ক্রিমিনাল'।

O

রাষ্ট্রশক্তি কিন্তু কোনও জনগোষ্ঠীর গায়ে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'সন্ত্রাসবাদী' শিলমোহর দেগে দিয়ে 'কাজ শেষ' ভেবে চুপচাপ বসে থাকে না। ইতিহাস অন্তত এ'কথাই বলে। পৃথিবীর যে কোনও অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে বজায় রাখা রাষ্ট্রশক্তি এ'ক্ষেত্রে যা করে তা হল, নিজেদের ভাড়াটে সেনাদের সাহায্যে হাটে-বাজারে-বাসে-ট্রেনে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের নামে ঘটনাস্থলে কিছু স্লোগান দিয়ে ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢালাও জনসমর্থন আদায় করে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র

এ'দেশেও চলছে চলবে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের পক্ষে আজ পর্যন্ত কুটোটি নেড়ে দেখেছেন কি ? কার দুর্গতি তবে তিনি নাশ করেন ? ধনকুবেরগোষ্ঠী ও তাদের সহায়কদের ?

লক্ষ্মীপুজো করলে ধন-দৌলত যদি উপচেই পড়বে, তবে হিন্দুদের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজোর পরেও এত ভয়ংকর দারিদ্র্য কেন ?

'শবেবরাত'-এর রাতে খোদাতালার গুণগান গাওয়ার পরও আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এত করাল দারিদ্র্য কেন ?

আমেরিকা ও জাপানের ধনকুবেররা লক্ষ্মীপুজো না করেও, শবেবরাতের নমাজ না পড়েও যদি প্রাচুর্যের পাহাড় বানাতে পারেন, তবে তো লক্ষ্মীপুজো ও শবেবরাতের নমাজ পড়াই প্রাচুর্য কেনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

গণেশ পুজো না করেও মালটিন্যাশানাল কোম্পানিগুলোর বিশ্ববাণিজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসা গণেশের ভূমিকাকে বাতিল করার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

শেক্সপিয়ার থেকে বিদ্যাসাগর, মেঘনাদ থেকে হকিং সরস্বতী পুজো না করেও বৌদ্ধিক জ্ঞানে হিমালয় হয়ে উঠে প্রমাণ করে দিয়েছেন, জ্ঞানার্জনে সরস্বতীর ভূমিকা শূন্য।

কারণ : ত্রিশ

মানুষের অগ্রগতিতে কার অবদান বেশি ? অবতারদের, নাকি বৌদ্ধিক জ্ঞানের সাধক ও স্রষ্টা বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক-শিল্পী-কারিগরদের ?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এবার আমরা একটু হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসব। একটু কষ্ট করে একটা নামের তালিকা তৈরি করুন। যাঁরা ধর্মীয় উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন বলে দাবি করেন ; তাঁদের নামের তালিকা। এ'বার খুঁজে দেখার চেষ্টা করুন তো, মানব প্রজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কোনও অবদান এঁরা রেখে যেতে পেরেছেন কি না ?

গুহা থেকে প্রাসাদ, চাকা থেকে মহাকাশযান, আগুন থেকে লেজার রশ্মি, হাতপাখা থেকে এয়ার-কন্ডিশনার, প্রদীপ ও মশাল থেকে পাওয়ার হাউজ, ফোঁড়া কাটার নরুণ থেকে মাইক্রোসার্জারির যন্ত্রপাতি—এই যে মানব প্রজাতির সংস্কৃতির অগ্রগমন, এর কোথাও কি 'ঈশ্বরদ্রষ্টা' অবতারদের সামান্যতম অবদান আছে ?

নেই। এই 'নেই' উত্তরটাই বার বার ফিরে আসতে বাধ্য। কারণ এই অগ্রগমন স্পষ্টতই বৌদ্ধিক জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।

এরপরও কেউ কেউ বলতে পারেন—মানব সংস্কৃতির অগ্রগমন শুধুমাত্র বস্তুগত উপাদানের উপর নির্ভর করে না। অবস্তুগত উপাদান, অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্য-দর্শন ইত্যাদির অগ্রগমনের সঙ্গেও মানব প্রজাতির প্রগতি নির্ভরশীল। দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদী দর্শন অধ্যাত্মবাদী দর্শন যে মহান মহাজ্ঞান মানব সংস্কৃতিকে দিয়েছে, তা কি অস্বীকার করা যায়?

হ্যাঁ, স্বীকার করি অবতাররা মানব সংস্কৃতিকে দিয়েছে কিছু 'মহাজ্ঞান'। এই মহাজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে অলীক বিশ্বাস, অলীক নিরাপত্তাবোধ, অলীক ইচ্ছাপূরণ, অলীক পরলোকে সুখভোগের নিশ্চিন্ততা, অলীক পরজন্ম চিন্তা, অলীক মানুষে-মানুষে বিভাজন-রেখা, সব মিলিয়ে এক অলীক মহাজ্ঞান। এই অলীক মহাজ্ঞানের বাইরে এইসব অবতার, অধ্যাত্মবাদী নেতাদের কাছ থেকে আমরা কিছু পেয়েছি কি? উত্তর একটাই। না। অর্থাৎ ঈশ্বরদ্রষ্টা এইসব অবতার ও অধ্যাত্মবাদী নেতারা মানব প্রজাতির সংস্কৃতিকে দিয়েছে শুধুই অলীক ও ভ্রান্ত কিছু চিন্তা, যা শেষ পর্যন্ত মানষের দ্বারা মানুষকে শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তার মানে, এইসব ঈশ্বরদ্রষ্টা অবতার, অধ্যাত্মবাদী নেতারা মানব সংস্কৃতিতে মিশেল দিয়ে চলেছে খারাপ সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি।

○

ঈশ্বরদ্রষ্টা এইসব অবতার ও অধ্যাত্মবাদী নেতারা মানব প্রজাতির সংস্কৃতিকে দিয়েছে শুধুই অলীক ও ভ্রান্ত কিছু চিন্তা, যা শেষ পর্যন্ত মানষের দ্বারা মানুষকে শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

○

ঈশ্বরদ্রষ্টারা আজ এক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই এমনটাই সঠিক মূল্যায়ন হবে, যদি আমরা বলি—ঈশ্বরদ্রষ্টাদের পাশাপাশি যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই যে সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করেছে এবং পালন ও পুষ্ট করে চলেছে, তা হল, অলীক বিশ্বাস, যুক্তিহীনতা, মানবতাহীনতা ও ভক্তির সংস্কৃতি, মানব সভ্যতাকে পশ্চাৎমুখী করার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি কোনও ভাবেই যুক্তি-বুদ্ধি ও মানবতার কোনও সংস্কৃতি নয়। এই সংস্কৃতি মানব প্রজাতির অগ্রগমনের কোনও সংস্কৃতি নয়।

কারণ : একত্রিশ

রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা অনেকেই ঈশ্বরকে দেখেছেন বলে শোনা যায়, তাঁরা নিজেরাও বলেছেন। সে সবই কি তবে বানানো, মিথ্যে?

'৮৬-র ফেব্রুয়ারি। স্থান—আগরতলা প্রেস ক্লাব। সময়—বিকেল। প্রেস কনফারেন্সের আয়োজক—আগরতলা প্রেস ক্লাব। উপলক্ষ—বইমেলা উপলক্ষে

আগরতলায় আমার আগমন। হল উপচে পড়া ভিড়। সাংবাদিকরা ছাড়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এসেছেন। প্রশ্নোত্তরে প্রেস কনফারেন্স জমে উঠেছে। এমন সময় উঠে দাঁড়ালেন ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান (নামটা আমার স্মরণে নেই)। জিজ্ঞেস করলেন, "রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গস্বামী ইত্যাদি বহু মহাপুরুষই ঈশ্বরকে দেখেছেন বলে যা আমরা জানি, তা কি সবই ভুল ?"

উত্তরে যা বলেছিলাম, তাই এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কর্মকাণ্ড নিয়ে যতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগুচ্ছে, ততই বিচিত্র সব তথ্য আমরা জানতে পারছি। এইসব অবাক করা তথ্য মনোবিজ্ঞানে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে। মনোবিজ্ঞান যদিও আধুনিকতম বিজ্ঞান শাখাগুলোর মধ্যে একটি, তবুও এটুকু বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না, মনোবিজ্ঞানের পুরোন তথ্যগুলো শুধু সাধারণ মানুষের কাছে নয়, উচ্চশিক্ষিত সংখ্যাগুরু মানুষদের কাছেও অজানা। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ভালোমত পরিচয় না থাকার জন্য মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অনেক বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে আমরা ভূত-ভগবান ও অলৌকিকত্বের পরম লীলা বলে গ্রহণ করেছি। প্রতিটি মনোরোগ চিকিৎসকের কাছেই প্রতিনিয়ত বহু রোগী আসেন যাঁরা ভ্রান্ত অনুভূতি (illusion), অলীক বিশ্বাস (hallucination) অন্ধ ভ্রান্ত ধারণা (delusion) ইত্যাদি মানসিক রোগের শিকার। ভ্রান্ত অনুভূতির উদাহরণ হিসেবে টেনে আনছি ১৯৬৫-র একটি ঘটনা। এডওয়ার্ড হুউমপারের নেতৃত্বে একদল পর্বত অভিযাত্রী অভিযান চালিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের আলপস্ পর্বতের ম্যাটারহর্ন চূড়োয়। অভিযানে বীভৎস এক দুর্ঘটনায় চার অভিযাত্রী দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান গভীর খাদে। এমনই এক মানসিক বিপর্যয়কর অবস্থায় হুউমপার দেখলেন আকাশজুড়ে অদ্ভুত এক ক্রস চিহ্ন। এই বিপর্যয়ের মাঝে যীশুর করুণা ও শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবেই এই ক্রস চিহ্নের আবির্ভাব ধরে নিয়ে নতুনভাবে মানসিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে অভিযান চালিয়ে গিয়েছিলেন। পৃথিবী বিখ্যাত পর্বত অভিযাত্রী এডওয়ার্ড হুউমপার তাঁর বিখ্যাত রোজনামচায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। এই ঘটনার আগে-পরে আরও বহু পর্বত অভিযাত্রীরাই বিভিন্ন শৃঙ্গে অভিযান চালাবার সময় যীশুর অপার করুণা অনুভব করে নবশক্তি পেয়েছিলেন, আর এই অপার করুণার প্রতীক ছিল আকাশে চকচকে ক্রস চিহ্নের স্পষ্ট অবস্থান। পরবর্তীকালে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের তথ্য থেকে আমরা জেনেছি বৃষ্টিতে রোদ পড়ে যেমন অনেক সময় রামধনু (rainbow) দেখা যায়, তেমনই কুয়াশায় রোদ পড়ে অনেক সময় দেখা যায় কুয়াশাধনু (foghow)। এই কুয়াশাধনুই যীশু খ্রিস্টের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের চোখে হয়ে উঠেছিল শূন্যে ভাসমান অলৌকিক ক্রস চিহ্ন। এ'হলো দর্শনানুভূতির ভ্রম (optical illusion)।

❍

মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ভালোমত পরিচয় না থাকার

জন্য মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অনেক বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে আমরা ভূত-ভগবান ও অলৌকিকত্বের পরম লীলা বলে গ্রহণ করেছি।

০

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘরোয়া উদাহরণ টানা যাক। আপনি হয়ত সকালবেলা চায়ের কাপটা নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আয়েস করে চা খেতে খেতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজটা পড়ছেন। পড়ছেন এক অলিম্পিয়ানের ড্রাগ নেওয়া নিয়ে খেলোয়াড়, চিকিৎসক ও কোচদের নানা মতামত। এমন সময় আপনার জীবনসঙ্গিনী বাজারে থলিটি নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "আজ কিন্তু চা আনতে হবে। দু'শো গ্রাম হলুদের গুঁড়ো আনবে। একশো ইসবগুলের ভুসি।"

আপনি কাগজের পাতায় চোদ্দ আনা মন রেখে দিয়ে মুখে "হুঁ...হুঁ...করে চলেছেন, কাগজে পুরোপুরি মন দিতে অসুবিধা হচ্ছে বলে ব্যাপারটার জের টানতে বললেন, "আর কিছু লাগবে না তো, ঠিক আছে ব্যাগটা এখানেই..."

কথা শেষ করতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠলেন শিরশিরে এক আতঙ্কে। খোলা কাঁধের উপর কি যেন একটা অতি দ্রুততার সঙ্গে কিলবিল করে উঠল। বিছে নয় তো? চলকানো চায়ের কাপটা ইজিচেয়ারের সামনে রাখা টুলটায় 'দ-ড়া-ম' করে নামিয়ে রেখে মুহূর্তে ডান হাত দিয়ে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন বিছেটাকে। মাটিতে এসে পড়ল এক টুকরো সুতো। সঙ্গিনীর হাত থেকে বা ব্যাগ থেকে সুতোটা কাঁধে এসে পড়েছিল। স্পর্শানুভূতির ভ্রান্তিতে আপনি সুতোটাকেই ভাবছিলেন বুঝি বিছে। অন্য কিছু না ভেবে বিছেই ভাবলেন কেন? রাতে বাথরুমে গেলে ফাটল ধরা স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুমে প্রায়ই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিছেদের মুখোমুখি হতে হয়। এ বাড়িতে বিছের দেখা মেলে বলেই কিলবিল না করতে পারা সুতোও কিলবিল করে উঠেছে। এ'হলো স্পর্শানুভূতির ভ্রম (talctile illusion)।

আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে ভ্রান্ত অনুভূতিতে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়। দর্শনানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির কথা তো আগেই বললাম। এ ছাড়া আরও তিনটে অনুভূতি হলো শ্রবণানুভূতির ভ্রম (auditory illusion) ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (olfactory illusion) এবং স্বাদগ্রহণের ভ্রম্ বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (taste illusion)।

একইভাবে অলীক দর্শনও পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। অলীক দর্শনের একটা দৃষ্টান্ত এখানে আনছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ সত্যেন সেনের ভাইপো সুজিত সেন মারা যান ৩০ সেপ্টেম্বর '৮৫, কেদার-এ। তার আগের বছর সুজিত সেনের একমাত্র সন্তান আত্মহত্যা করেছিলেন। সুজিতবাবু ও তাঁর জীবনসঙ্গিনী মানসিক আঘাত ভুলতেই সেবার কেদারের পথে বেরিয়ে

পড়েছিলেন। কেদারের পথে এক চড়াই অতিক্রম করার সময় সুজিতবাবু হার্টে ব্যথা অনুভব করেন। আত্মীয়-বন্ধুহীন এই তীর্থযাত্রায় সুজিতবাবুর একমাত্র সঙ্গী জীবনসঙ্গিনী সাহায্য পাওয়ার আশায় পাগলের মতই চিৎকার করতে থাকেন। এক সময় শ্রীমতী সেন দেখতে পেলেন এক সন্ন্যাসী ছুটতে ছুটতে আসছেন। মরণপথযাত্রী শ্রীসেনের সামনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী তাঁর মুখে প্রসাদ ও কমণ্ডুলের জল ঢেলে দিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমনই ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন। একটু পরেই শ্রীসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীমতী সেন কাছাকাছি এক আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। শ্রীসেনের 'শেষকাজ' শ্রীমতী সেনই করলেন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের উপদেশ মতো। সন্ন্যাসীরা এই মৃত্যুকে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের মত্যু হিসেবে ধরে নিয়ে মৃতদেহ না পুড়িয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। দু'দিন পরে শ্রীমতী সেন কেদারনাথ দর্শন করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এ কী দেখছি ? এই কি কেদারনাথ ? ইনিই তো সেদিন সুজিতের মুখে জল ও প্রসাদ তুলে দিয়েছিলেন।

শ্রীমতী সেন হিন্দু ধর্মে পরম বিশ্বাসী। দীর্ঘদিনের সংস্কার, তীর্থক্ষেত্রের ধর্মীয় পরিবেশ, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের আবেগ ও সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা, শ্রীসেনকে ঈশ্বর কৃপাধন্য মহাপুরুষ হিসেবে সন্ন্যাসীদের ঘোষণা শ্রীমতী সেনের মধ্যে এই ধরনের অলীক দৃশ্যানুভূতির (Visual hallucination) সৃষ্টি করেছিল। শ্রীমতী সেন যদি পরম খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী হতেন এবং খ্রীষ্টীয় পাদ্রীদের মুখে শুনতেন শ্রীসেন যীশুর পরম কৃপাধন্য, তবে দুর্গম পথযাত্রার শেষ কোনও চার্চে ঢুকে যীশুর মূর্তির মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী জীবনসঙ্গীর মুখে জল তুলে দেওয়া মানুষটিকেই দেখতে পেতেন।

শ্যামলেন্দু রায় ব্যাঙ্ককর্মী। সুন্দরী তরুণী সুমনার সঙ্গে বিয়ে হয়। দু'জনেই দু'জনের প্রতি ছিলেন দারুণভাবে আকর্ষিত। কিন্তু বছর না ঘুরতেই শ্যামলেন্দু অফিস যাওয়ার পথে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। শ্যামলেন্দুর ব্যাঙ্কে সুমনা চাকরি পান। সহকর্মী ধ্রুবকে ভালই লাগে। ধ্রুবও সমুনাকে চান, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। একদিন ধ্রুব বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সুমনাকে। আর, সে রাতেই শুতে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে করতে সুমনা তাকালেন ড্রেসিং টেবিলে রাখা শ্যামলেন্দুর ছবির দিকে। আর অমনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন শ্যামলেন্দুর গলা, "তুমি আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে, সুমনা ?" তারপর থেকে প্রায়ই শ্যামলেন্দুর ছবি কথা বলে। এক সময় ছবিটা সরালেন। কিন্তু শ্যামলেন্দুর কথা বিদায় নিল না। শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাসের (auditory hallucination) এই রোগী এই ধরনের কথা শুনতে পান।

'৮৫-র কালীপুজোর সময় দমদম চিড়িয়ামোড়ের একটি প্যান্ডেলে আগুন

লাগে। পুজোর উদ্যোক্তা তরুণরাই বন্ধ ঘরের মতো জ্বলন্ত প্যান্ডেল থেকে দর্শকদের উদ্ধার করেন। প্যান্ডেলে আগুন ঘেরার মধ্যে একজন ছিলেন আমারই বন্ধু-পত্নী। এই আগুন লাগার তিনদিন পর বন্ধু আমাকে ফোনে জানান ওর জীবনসঙ্গিনী নাকি মাঝে মাঝেই তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করে উঠছেন। উনি নাকি দেখছেন ওঁর আশে-পাশে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠছে। এমন কি আগুনের তাপও নাকি স্পষ্ট টের পাচ্ছেন। আর এই ব্যাপারটা প্রধানত ঘটছে কোথাও আগুন দেখলেই।

বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। হিপনটিক সাজেশনে তাঁকে আবার ঠিকও করে দিয়েছিলাম। কিভাবে ঠিক করেছিলাম, প্রসঙ্গ সেটা নয়। যে প্রসঙ্গে আসতে ঘটনাটা বললাম, সেটা হলো বন্ধু-পত্নী কেন হঠাৎ অলীক আগুন দেখতে পাচ্ছিলেন ? তাপ অনুভব করতে পারছিলেন ? মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই ধরনের আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কম নমনীয়তা সম্পন্ন মানুষরা অনেক সময় নিজের অজান্তে স্বনির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে অনেক অলীক কিছু দেখেন, অনেক অস্বাভাবিক সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলেন। দুর্ঘটনার দিন আগুনের ঘোরটোপে অনেকেই আটকে পড়েছিলেন সকলেই কিন্তু বন্ধু-পত্নীর মতো আগুন দেখছিলেন না ; তাপ অনুভব করছিলেন না। বন্ধু-পত্নী দেখেছিলেন। কারণ তাঁর মস্তিষ্ক বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের নমনীয়তা, আবেগপ্রবণতা বহুর তুলনায় নিশ্চয়ই অন্যরকম। আর তাইতেই আগুন দেখলেই দুর্ঘটনার স্মৃতি তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পিছু তাড়া করেছে—আর একটু হলেই শরীরটায় আগুন লেগে যেত। শরীরটা পুড়তে থাকত। অসহ্য তাপে ঝলসে যেত রূপ-যৌবন। আর একটু হলেই এমনটা হতো। উঃ, আগুন কী বীভৎস ! কী ভয়ংকর ! আগুনে পোড়া মানুষ বাঁচলেও তাকে আগুনের কাছেই জমা রেখে আসতে হয় রূপ-যৌবন ! বন্ধু-পত্নী ব্যস্তবিকই সুন্দরী। আর সম্ভবত অনেকটা সেই কারণেই বন্ধু তাঁর জীবন-সঙ্গিনীকে আদরে-সোহাগে ঘিরে রাখতেই খুব বেশি পছন্দ করতেন। সোহাগের এমনতর কারণটা বন্ধু-পত্নীরও অজানা ছিল না। সৌন্দর্য সচেতন আবেগপ্রবণ মন তাই তীব্র আতঙ্কে বার-বার ভেবেছেন—আর একটু হলেই পুড়ে যেতাম ! পুড়ে গেলে কী হতো ! আগুন কী ভয়ংকর ! আবার যদি কখনও আগুনে পুড়ি। সামান্য একটু অসতর্কতা থেকে আগুন কত ভয়ংকর সব দুর্ঘটনাই না লাগাতার ভাবে ঘটিয়ে চলেছে ? একটু অসতর্কতা...আগুন...উঃ...বন্ধু-পত্নী তীব্র আতঙ্ক থেকে অলীক দর্শন ও অলীক স্পর্শানুভূতির শিকার হয়েছেন।

ঠিক এমনি ভাবে কেউ তীব্র আকুতি নিয়ে যদি ঈশ্বর দর্শন কামনা করতে থাকে, এবং যদি তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের নমনীয়তা কম থাকে এবং সে আবেগপ্রবণ হয় তবে তার পক্ষে অলীক ঈশ্বরদর্শন সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। ধরে নিলাম, রামবাবু পুজো-আর্চা করেন। ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী। মনে তাঁর

তীব্র আকুতি—মা দেখা দে মা। অফিস যাওয়ার আগে স্নানটি সেরে ঠাকুর পুজো করেন ঘণ্টা দেড়েক ধরে। সেদিন শনিবার, কালীর ছবিতে নীল অপরাজিতার মালা পরিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন মা কালী ছবি ছেড়ে এক পা, এক পা করে বেরিয়ে এলেন।

Visual hallucination বা Optical hallucination রোগীর পক্ষে এই ধরনের দৃশ্য দেখা সম্ভব। এই একই ঈশ্বর দর্শনের তীব্র অনুভূতি থেকেই কারও কারও পক্ষে ঈশ্বরের বাণী শোনা সম্ভব, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব। এই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন হয় না। এগুলো শ্রবণানুভূতির ভ্রম। আরও বহু মানসিক অবস্থায় একজন মানুষের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব, ঈশ্বরের বাণী শোনা সম্ভব, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব। এই প্রেস কনফারেন্সে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলছি, আমি সার্কিট হাউজে আছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরব। আপনাকে দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তীব্রভাবে ঈশ্বর দর্শনে ইচ্ছুক। কাল সকালে সার্কিট হাউজে আসুন। আমার সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করলে কালকে আপনাকে সম্মোহিত করে আপনার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে এমন নির্দেশ পাঠাব যে আপনি আপনার প্রার্থিত ঈশ্বরকে অবশ্যই দেখতে পাবেন। আমি ফিরে যাবার পরও আপনি আমার কথা মতো মনোসংযোগ করে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে স্বনির্দেশ পাঠালেই ঈশ্বর দেখতে পাবেন।

আমার লেখাটি এতদূর পড়ে যাঁরা একটু তেড়ে-ফুঁড়ে উঠবেন, তাঁদেরকে বলি—ধীরে, একটু ধীরে। যুক্তিটুক্তি সবকিছু আবেগ নামক রসালো নির্বুদ্ধিতার কাছে জমা না রেখে, সম্মোহন করে মানসিক চিকিৎসা করেন, এমন কোনও চিকিৎসকের কাছে মানসিক রোগী সেজে গিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করলেই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের কিছুটা যা পরিচয় পাবেন, তারপর আর তেড়ে-ফুঁড়ে উঠবেন না।

প্রেস কনফারেন্সে যা বলেছি তার বাইরেও আর অনেক কারণ আছে, যার জন্য কোনও কোনও মানুষের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব।

চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে যখন অ্যানাসথিসিয়া করেন তখন অনেক রোগী মৃত্যুভয়ে ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকতে থাকেন এবং চেতনা হারাবার আগে বা অর্ধচেতন অবস্থায় ঈশ্বর দেখেন, মৃত্যুলোক দেখেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এল. এস. ডি. হেরোয়িনের মতো মাদক গ্রহণ করলেও অনেক সময় অদ্ভুত আনন্দ, হুরী-পরী-ঈশ্বর ইত্যাদির দেখা মেলে।

স্বাভাবিক মানুষও ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন। নেচে নেচে কীর্তন গাইতে গাইতে যেমন ঈশ্বর অনুভূতি বা ঈশ্বর দর্শন হতে পারে, তেমনই সতী মায়ের থানে সতী মেলার

সময় অথবা শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরের মন্দিরে দণ্ডী কাটতে কাটতে এমন অনুভূতি বা দর্শন সম্ভব। মহরমের মিছিলে কাচের টুকরো বা কাঁটা দু'হাতে নিয়ে 'হাসান-হুসান' বলে দু'বুক চাপড়াতে চাপড়াতে রক্তাক্ত করে তোলা মানুষদের কেউ কেউ অলীক অনুভূতির শিকার হন। এই সবই ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে ঈশ্বর অনুভূতি ও অলীক অনুভূতির উদাহরণ।

রোগটার নাম কী বলব ? স্কিটসোফ্রিনিয়া না স্কিজোফ্রেনিয়া ? অনেকে আবার সিজোফ্রেনিয়াও বলে থাকেন। ইংরেজি বানানটা হল schizophrenia। আর সংসদের অভিধানে উচ্চারণ লেখা আছে স্কিটসোফ্রিনিয়া। আমারও না হয় বাংলায় লিখতে স্কিটসোফ্রিনিয়াই লিখব। হ্যাঁ, এই রোগও ঈশ্বর দর্শন সম্ভব এবং এই রোগের অনেক রোগী তা দেখেও থাকেন।

স্কিটসোফ্রিনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু ছোট্ট করে আলোচনা সেরে নেওয়া জরুরি। গতিময়তা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি, তারা যে কোনও বিষয় চট্‌পট্‌ বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীর মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন না। এ'রা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রিনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তারা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে, অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তা থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্কের গতিময়তা আরও কমে যায়। তখন তারা আরও বেশি করে নিজের চিন্তার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের

আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। অবশেষে এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগী মস্তিষ্কের কোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না, বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। মস্তিষ্ক কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় এই অলীক বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ফলে ভূত বা ভগবান রোগীর লীলাসঙ্গী হতেই পারে।

•

রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামে মনোবিজ্ঞানে এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের শেষ প্রতিনিধি ইত্যাদি বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। এই 'রিলিজিয়াস মিসটিক' শ্রেণীর মানুষরা ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ। এরা বিশ্বাস করে সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। আর তেমনটা করলে যে কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা হাতের মুঠোয় ধরা পড়ে।

○

রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামে মনোবিজ্ঞানে এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের শেষ প্রতিনিধি ইত্যাদি বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করে।

○

এরা নিজেদের বিশ্বাস মতো ধ্যান করে, উপাসনা করে, সমাধিতে বসে এবং বেশি বেশি করে নিজের চিন্তার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে থাকে। কর্মজগৎ ও আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। নিজের কল্পনার জগৎকেই বাস্তব জগৎ হিসেবে এক সময় বিশ্বাস করতে থাকে। এই গভীর বিশ্বাস থেকে এরা দিব্য আলো দর্শন করে ; পরমপিতা বা ঈশ্বরের আদেশ শোনে—যেমনটি শুনেছিলেন মোজেস। এদের কেউ বা মনে করে—যা কিছু করছে, তার সব কিছু করাচ্ছে এক অলৌকিক শক্তি। এরা কখনও বা কোনও একটা মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া অদ্ভুত এক অনুভূতিকে বাকি জীবন দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করে বেড়ায়। এমনই মুহূর্তের কোনও অলীক অনুভূতি থেকে মনে করে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের সত্য জানতে পেরেছে। আবার কেউ বা মনে করে—যে পরমব্রহ্মকে জেনেছে। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময়তাকে জেনেছে, যা বলে বোঝানো যায় না ; এ এক অদ্ভুত অনুভূতির ব্যাপার ; এই রহস্যের কথা কাউকে জানানো যাবে না ইত্যাদি।

এই ধরনের মিসটিক ফেনোমেনার (Mystic Phenomena) কেউ কেউ অসংলগ্ন কথা বলে,কারও বা মুখ থেকে এই সময় স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসে কবিতার ছন্দে নানা ধর্মীয় উপদেশ, কেউ কেউ মনে করে পরমপিতা বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। যদিও মনোরোগ চিকিৎসকরা একটি মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে সাধারণত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান না, তবুও তাঁদের অনেকেই মনে করেন—যীশু, হজরত মহম্মদ, চৈতন্যদেব ছিলেন 'রিলিজিয়াস মিস্টিক' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এই ধরনের মিসটিক ফেনোমেনার (Mystic Phenomena) কেউ কেউ অসংলগ্ন কথা বলে,কারও বা মুখ থেকে এই সময় স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসে কবিতার ছন্দে নানা ধর্মীয় উপদেশ, কেউ কেউ মনে করে পরমপিতা বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে।

'রিলিজিয়াস মিস্টিক' শ্রেণীকে মনোবিজ্ঞানে ৫টি 'স্টেজ' বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে উৎসাহীদের বিস্তৃত জানতে মনোরোগ চিকিৎসকদের অতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত "Modern Synopsis of Comprehensive Text Book of Psychiatrist" দেখতে অনুরোধ করছি। লেখক ঃ Harold I. Kaplan & Benjamin Sadock, 3rd edition। প্রকাশক ঃ লন্ডনের উইলিয়ামস অ্যান্ড উইলিয়ামস। পৃষ্ঠা—২৩৪-২৩৫।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম—ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কী মানসিক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর দর্শন করা সম্ভব সেই প্রসঙ্গ নিয়ে। ঈশ্বর দর্শনের দাবিদার অনেকেই কিন্তু কোনওভাবেই ঈশ্বর দর্শন না করেই দাবি করে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে।

কারণ ঃ বত্রিশ

ঈশ্বর যদি না-ই থাকবে, কালী-মনসা-শীতলা এ'সবের যে ভর হয়, সেগুলো তবে কী? ভরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার যে ঘটে, সেগুলোর ব্যাখ্যাই বা তবে কী?

এমন কথা শুধু যে আমজনতার মুখ থেকে উঠে আসে, তা তো নয়, অনেক নামী পত্র-পত্রিকায় দামী সাংবাদিকরাও এ'সব নিয়ে অনেক কিছুই লেখেন। তাতে সাধারণের বিভ্রান্তি বাড়ে, ঈশ্বর-বিশ্বাস গাঢ় হয়। আমাদেরও দায়িত্ব বাড়ে।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনকেই আসুন বিশ্লেষণের জন্য আমরা বেছে নিই।

৩০ মে '৯০। আনন্দবাজার পত্রিকায় বহুবর্ণের তিনটি ছবি সহ একটি বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশিত একটি হলো "পূজারিণীর শরীর বেয়ে" শিরোনামে। শিরোনামের তলায় গোদা বড় হরফে ছাপা "দেবদেবীর ভর হয় পূজারিণীর শরীরে। সে সময় যা বলা যায় তাই মেলে। যা দাওয়াই দেওয়া হয় তাতেই রোগ নির্মূল হয়। ভর হয় কীভাবে?" উৎসাহী পাঠকদের অবগতির জন্য প্রতিবেদনটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

শনিবার বেলা দুটো। ঢাকুরিয়া স্টেশনের পাশে তিন-চার হাত উঁচু ছোট্ট একটি কালীমন্দির। মন্দিরের মাথায় চক্র ও ত্রিশূল। মন্দিরটির নাম 'জয় মা রাঠের কালী'। মন্দিরের সামনে একটি সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল। সেই চাতাল ও পাশের মাঠে ইতস্তত ছড়ানো অনেক লোক। আর সেই দাওয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে এক যুবতী, পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি এলোমেলো, চোখ দুটি বোজা, নাকের পাটা ফোলা, মুখের দুপাশে ক্ষীণ রক্তের দাগ। মহিলাটির ভর হয়েছে। কালী পুজো করতে করতে অচেতন হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন মহিলা। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন, 'স্বামীর লগে এয়েছিস কে?' উপস্থিত জনতার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুর মাঝবয়সী এক আধা-শহুরে মহিলা ঠেলাঠেলি করে সামনে এলেন। মন্দিরে ছোট দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে 'মা' বলে হাতজোড় করে ডাকতে লাগলেন। 'মা' বললেন— 'সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু হবে না আমার জল পড়া খাইয়েছিস?'

'খাইয়েছি মা। সারছে না মা।'

'ওতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর 'মা' উঠলেন, "ব্যবসার জন্য এয়েছিস কে? বোস। আমার কাছে আয়।" শার্ট-প্যান্ট পরা মাঝবয়সী ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। একইভাবে— হাতজোড়। হাঁটু মুড়ে বসা। মায়ের কাছে সমস্যার কথা জানালেন। মা অভয় দিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফের 'মা' ডাকলেন। 'কোমরে পিঠে পেটে ব্যথার জন্য এয়েছিস কে? আয়, আয় সামনে আয়।'

এক এক করে ছেলে মেয়ে বুড়ো মাঝবয়সী সবাই হাজির হতে লাগল। মা তাদের কোমরে, পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারা এক এক করে চলে গেলে একটি যুবক এগিয়ে এল। 'মা' তার পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন নাভিতে হাত রাখলেন। 'মা'য়ের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মায়ের 'ঝাড়া'র রকমই এই।

'সন্তানের লগে এয়েছিস কে?' যুবকটি চলে যেতেই 'মা'-য়ের ডাক। শিশুকোলে এক রমণী এগিয়ে এলেন। 'মা' শিশুটাকে তাঁর বুকের ওপর শুইয়ে দুই হাতে সজোরে শিশুটির পিঠের ওপর চড় মারতে লাগলেন। তারপর শিশুটিকে দু'হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলেন এবং আবার চড় মারতে লাগলেন, এরপর 'মা' শিশুটিকে তার মা-য়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

মায়ের ভরমুক্তির সময় হয়ে এল। মহিলা, পুরুষ ঠেলাঠেলি করে এগোতে লাগলেন। নিজের নিজের সমস্যার কথা বলবেন এঁরা। মায়ের ভরমুক্তি হলো। চিৎ হওয়ার অবস্থা থেকে উপুড় হয়ে শুলেন 'মা'। কিছুক্ষণ পর উঠে বসলেন তিনি। পুজো করতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে, হাততালি দিয়ে দেবীর আরাধনা চলল।

এক মধ্যবয়সী মহিলার হাত-পা কাঁপে। উঠে বসতে পারেন না। কথা বলতেও কষ্ট হয়। জানা গেল, তাঁর অসুখ দীর্ঘদিনের। তাঁকে 'মা' সামনে বসিয়ে প্রথমে মন্ত্র পড়ালেন। তারপর ওঠ বস করতে বললেন। মহিলা ওঠ বস করতে পারছিলেন না। তাঁকে জল পড়া খাওয়ানো হলো। মহিলা উঠে বসলেন। এক মধ্যবয়স্ক পুরুষের পিঠ ও কোমরের ব্যথা এবং এক মহিলার গ্যাসট্রিকের বেদনার একইভাবে উপশম করলেন 'মা'। পরিচয় হলো বিজয়ভূষণ গুহর সঙ্গে। তিনি ন্যাশনাল হেরাল্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিন-চার বছর আগে তাঁর স্ত্রীর হাঁপানি সেরে যাওয়ার পর থেকে তিনি 'মা'য়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। এখন 'মা'য়ের কাছে আসেন নিয়মিত। কোনও উদ্দেশ্য নয়, শুধু 'মা'য়ের টানে আসেন।

মহিলার নাম প্রতিমা চক্রবর্তী। স্বামী রেলে কাজ করেন। ছেলে একটিই, বয়স বারো তেরো। স্বাস্থ্য মাঝারি, চোখগুলি কোটরে বসা, গভীর। চেহারার গড়ন মজবুত হলেও কোথাও একটা ক্লান্তির ছাপ আছে। মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কাজ করতে পারেন না। 'মা'য়ের দয়াতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

যাদবপুর পলিটেকনিকের ঠিক পেছনে শীতলাবাড়িতেও ভর হয়। এখানে একটি নেপালি পরিবার থাকে। যাদবপুর পলিটেকনিকের পিওনের কাজ করতেন ভদ্রলোক। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। তাঁর স্ত্রীর ভর হয় প্রতি শনিবার। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কোঠায়, গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারায় বেশ সুশ্রীভাব আছে। মুখের গড়নটি ভারী সুন্দর। ছেলে, নাতি-নাতনী নিয়ে তিরিশ বছরের পরিপূর্ণ সংসার। '৬৫ সালে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা। যাদবপুর পলিটেকনিকের কর্মী হিসেবে পলিটেকনিকের পিছনেই থাকার জায়গা পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় দিল্লি থেকে আসা ১৬০০ পুলিশ ইউনিভার্সিটির চত্বরেই বাস করতে থাকে। তারা চাঁদা তুলে 'মা'য়ের জন্য পাকা দালান তৈরি করে দেয়। এখন সেই দালানে প্রতি শনিবার ভক্ত সমাগম ঘটে। যে যার সমস্যা নিয়ে আসে। পুজো শুরু করার কিছুক্ষণ পরই 'মায়ে'র ভর হয়। তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং 'মা' প্রশ্নের উত্তর দেন। সব মিলে যায়। একটি বোবা মেয়েকে সারিয়ে তুলেছেন 'মা'। মায়ের দেওয়া জলপড়ায় উপশম ঘটেছে একটি সুন্দরী নববধূর জটিল ব্যাধির, একটি শিশুর কঠিন অসুখ।

কলকাতার বাইরে আন্দুলের রাস্তা দিয়ে ঘেরা একটি পুকুরের পিছনে বহুদিন থেকে একটি বাড়িতে পাশাপাশি রয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ও

কালী। বাংলা ১৩৭১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। তার আগে একটি ছোট্ট বেড়া দেওয়া ঘরে পুজো হতো। তখনই 'মা'-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এখানে ওখানে।

মন্দিরে যিনি পুজো করেন, তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়। শীর্ণকায়। বিধবা, কিছুদিন হলো স্বামী-বিয়োগ হয়েছে। ভক্তদের দেওয়া অর্থেই সংসার চলে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজোয় বসার পর 'মা'য়ের ভর হয়। তখন 'মা'-কে যে প্রশ্ন করা যায়, 'মা' তার উত্তর দেন। প্রশ্ন করার জন্য কুড়ি পয়সা দক্ষিণা। পুজোয় বসার কিছুক্ষণ পর মায়ের মাথা দুলতে থাকে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মাথার দোলাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তারপর একসময়ে 'মা'য়ের হাত থেকে ফুল খসে পড়ে, ঘণ্টা স্খলিত হয়। 'মা' আচ্ছন্ন হয়ে যান। ভর হয়। ভক্তরা তখন প্রশ্ন করতে শুরু করেন। 'মা' আচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তর দিয়ে থাকেন।

এবং উত্তর মিলেও যায়। রোগভোগ সেরে যায়। মানুষগুলির ভিড় তাই বাড়ে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর চিঠি পেয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। প্রশ্নগুলো এই ধরনেরঃ "আপনারা কি ঈশ্বরের ভরে পাওয়া পূজারিণীর মুখোমুখি হবেন ? না কি, তুড়ি দিয়েই প্রতিবেদকের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে চাইবেন ?"

ঈশ্বরে ভর আর ভূতে ভরের প্রশ্নে আজও বহু মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত। আমার পরিচিত এক প্রাক্তন অধ্যাপক গোবিন্দ ঘোষ তুক্-তাক্, ঝাড়-ফুঁক, জ্যোতিষ এই সব কিছুকেও বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিয়েও উড়িয়ে দিতে পারেননি ভরকে। কারণ এ'যে নিজের চোখে দেখা !

আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির উত্তর যথারীতি দিয়েছিলাম। ৩ জুলাই '৯০ চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ঢোকার আগে মুখবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত চিঠিটায় আমরা একবার চোখ বুলিয়ে নিই আসুনঃ

পূজারিণীর শরীরে দেবতার ভর ?

সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'পূজারিণীর শরীর বেয়ে' প্রতিবেদনটি (৩০ মে) পড়ে অবাক হয়ে গেছি। লেখাটি পড়ে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'ভর' হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলি বিষয়ে অবহিত নন এবং উনি ভরগ্রস্তদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। অবশ্য তিনি যদি তাঁর লেখার সত্যতা

বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, থাকেন তবে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে মুক্ত মনে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। সাবর্ণীর হাতে তুলে দেব কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা ভরগ্রস্তদের কাছে প্রশ্ন রাখবেন। তুলে দেব পাঁচজন রোগী। ভর লাগা পূজারিণীরা রোগীদের রোগ মুক্ত করতে পারলে এবং প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে আমরা সাবর্ণীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং আমরা অলৌকিকতা-বিরোধী ও কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকব।

না, ভর লাগা পূজারিণী সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি। এগিয়ে আসেননি সাবর্ণীও।

'ভর' কখনো মানসিক রোগ, কখনো-বা অভিনয়

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসারে 'ভর' কখনও মানসিক রোগ, কখনও স্রেফ অভিনয়। ভরলাগা মানুষগুলো হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ, স্কিটসোফ্রিনিয়া—ইত্যাদি রোগের শিকার মাত্র। এইসব উপসর্গকেই ভুল করা হয় ভূত বা দেবতার ভরের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। সাধারণভাবে যে সব মানুষ শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, পরিবশভাবে প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত, আবেগপ্রবণ, যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা সীমিত তাঁদের মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতাও কম। তাঁরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। দৈবশক্তির বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে অনেক সময় রোগী ভাবতে থাকে, তাঁর শরীরে দেবতার বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। ফলে রোগী দেবতার বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকেন। অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত মানসিক অবসাদগ্রস্ততা থেকেও 'ভর' রোগ হয়। স্কিটসোফ্রিনিয়া রোগীরা হন অতিআবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীরই হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণতা থেকেই রোগীরা অনেকসময় বিশ্বাস করে বসেন তাঁর উপর দেবতা বা ভূত ভর করেছে।

○

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসারে 'ভর' কখনও মানসিক রোগ, কখনও স্রেফ অভিনয়। ভরলাগা মানুষগুলো হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ, স্কিটসোফ্রিনিয়া—ইত্যাদি রোগের শিকার মাত্র। এইসব উপসর্গকেই ভুল করা হয় ভূত বা দেবতার ভরের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।

○

তবে 'ভর' নিয়ে যারা ব্যবসা চালায় তারা সাধারণভাবে মানসিক রোগী নয় : প্রতারক মাত্র।

ভর-লাগা মানুষদের জলপড়া, তেলপড়ায় কেউ কেউ রোগমুক্তও হন বটে, কিন্তু যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁদের ক্ষেত্রে এসব সামান্যতমও কাজ করে না। কাজ করে তাদেরই কারো কারোর উপর, যাঁরা ভর লাগা মানুষদের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। হাড়ে, বুকে বা মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কিয়াল-অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ওষুধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। একে বলে 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি।

'যা বলা যায় তাই মেলে'—এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কিন্তু ভর লাগা মানুষটির নয় : কৃতিত্ব তাঁর খবর সংগ্রহকারী এজেন্টদের।

না, সাবর্ণী দাশগুপ্ত বা ভরে পাওয়া পূজারিণীদের কেউই আজ পর্যন্ত আমার বা আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির কাছে এগিয়ে আসেননি। কারণটা শ্রদ্ধেয় পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। একই সঙ্গে প্রিয় পাঠকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে কোনও ঈশ্বর ভরের খবর আমাদের সমিতির যে কোনও শাখায় দিলে প্রমাণ করে দেব—প্রতিটি ভরগ্রস্তই হয় মানসিক রোগী, নতুবা প্রতারক।

মনসা, শীতলা, কালী, তারা, দুর্গা, চড়কের সময় শিব, কীর্তনের আসরে রাধা বা গৌরাঙ্গের ভর, পীরের ভর, জিন বা পরীর ভর, অপদেবতার ভর, ভূতে ভর ইত্যাদি কত রকম ভরই যে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। যে কোনও ধরনের ভর হওয়া মানুষগুলোর বেশিমাত্রায় খোঁজ মিলবে মফস্বলে, গ্রামে-গঞ্জে। শহর কলকাতাতেও অবশ্য ভর হয়। শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হতদরিদ্র বস্তিবাসীদের মধ্যে ভূতে ভর, জিনে ভরের মানসিক রোগীদের সাক্ষাৎ এখনও মেলে। কিন্তু যেটা অনেকেরই অজানা, সেটা হলো এই কলকাতা, হাওড়া ও দমদম অঞ্চলে বহু ঈশ্বরে ভর হওয়া মানুষের রমরমা ব্যবসা চলছে। এইসব ভরগ্রস্তদের বেশির ভাগই নারী। আর এদের কৃপাপ্রার্থীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালীদের দেখা পাবেন। এই ভক্তরা প্রত্যেকেই কম বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এই শহরের ঈশ্বরে ও পীরে ভরগ্রস্তদের প্রায় সকলেই প্রতারক, মানসিক রোগী নয়। ভরগ্রস্ত কেউ এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করলে অবশ্যই প্রমাণ করে দেব—এরা বাস্তবে কেউ ঈশ্বরজাতীয় কারও এজেন্ট নয়, এরা কারও বিষয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারে না, পারে না রোগমুক্তি ঘটাতে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভরগ্রস্ত বা কোনও অলৌকিক ক্ষমতাধর (!) পাঁচ হাজার টাকা জমা দিলে প্রকাশ্যে তার মোকাবিলা করব। এবং আমি পরাজিত

হলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও জামানতের পাঁচ হাজার টাকা, অর্থাৎ মোট এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা দেব।

এতো গেল 'ভর' ব্যাপারটাই যে ফালতু, এটা প্রমাণ করতে চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জের কথা। কিন্তু ভর ব্যাপারটা তবে ঠিক কী ? আসুন, এবার সেই বিষয় নিয়ে আলোচনায় ঢুকি।

১৯৬৬ সালের মে মাসের ২৭ তারিখ। স্থান—রাঁচীর উপকণ্ঠের পল্লী। সময়—সন্ধ্যা। নায়িকা এক কিশোরী। কোথাও কিছু নেই, বাড়ি ফিরে হঠাৎ প্রচণ্ড মাথা দোলাতে দোলাতে শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে কী সব আবোল-তাবোল বকতে লাগল।

সন্ধেবেলায় জল আনতে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর থেকেই এমনটা ঘটছে। নিশ্চয়ই ভূতে ধরেছে। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গরিব পরিবার। ওরা ভরের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেয় না। সাহায্য নেয় ওঝার। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ওঝা এসে কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে তাতে ধুনো, সরষে আর শুকনো লঙ্কা ছড়াতে শুরু করল। সেই সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্র-পাঠ। মেয়েটি কঠিন গলায় ওঝাকে ধমক দিয়ে ওর লাফালাফি বন্ধ করতে বলল। ওঝা তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। ওঝা জানে, ভর করা ভূতেরা চিরকালই ক্ষুব্ধ হয়। অতএব ভূতের রাগে ওঝার উৎসাহ তো কমলই না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্রসহ নাচানাচি করতে শুরু করল।

কিশোরীটি এবার গম্ভীর গলায় জানাল, সে ভূত নয়, 'বড়ি-মা' অর্থাৎ দুর্গা। ওঝা আর বেয়াদপি করলে শাস্তি দেবে। ওঝা ভূতেদের অমন অনেক ভড়কি দেওয়া দেখেছে। ভূতের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে নিজের সম্মান ও রোজগারের পায়ে কুড়ল মারতে রাজি নয়। সে তার কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে লাগল। ওঝা এক সময় মন্ত্র পড়া-সরষের কিছুটা কাঠকয়লার আগুনে আর কিছুটা কিশোরীটির গায়ে ছুঁড়ে মারতেই কিশোরীটি অগ্নিকুণ্ড থেকে টকটকে লাল একমুখো জ্বলন্ত কাঠকয়লা হাতে তুলে নিয়ে ওঝাকে বলল, "এই নে ধর প্রসাদ।" ওঝার হাতটা মুহূর্তে টেনে নিয়ে ওর হাতে উপুড় করে দিল জ্বলন্ত কাঠকয়লা।

যন্ত্রণায় তীব্রতায় ওঝা চিৎকার করে এক ঝটকায় হাত উপুড় করে কাঠকয়লাগুলো ফেলে দিলে। মেয়েটি কিন্তু নির্বিকার। ওঝার থেকে বেশিক্ষণ জ্বলন্ত কাঠকয়লা হাতে রাখা সত্ত্বেও ওর চোখে-মুখে যন্ত্রণার সামান্যতম প্রকাশ দেখা গেল না। এমনকি হাতে ফোস্কা পর্যন্ত নয়। উপস্থিত প্রতিটি দর্শক এমন অভাবনীয় ঘটনায় হতচকিত। এ মেয়ে 'বড়ি-মা' না হয়েই যায় না। প্রথমেই নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করল ওঝাটি। তার বশ্যতা স্বীকারে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

কিশোরীটি তার মা-বাবাকে নাম ধরে সম্বোধন করে জানাল, "আমার কাছে মানত করেও মানত রাখিসনি বলে আমি নিজেই এসেছি।"

মা-বাবা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। মানত করে মানত রাখতে না পারার কথা তো সত্যি! মা-বাবা মেয়ের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মেয়েটি রাতারাতি 'বড়ি-মা' হয়ে গেল। আশে-পাশের গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মানুষ 'বড়ি-মা' দর্শনের আশায়, কৃপালাভের আশায়, রোগমুক্তির আশায় হাজির হতে লাগল। কিশোরীটির ব্যবহারে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেছে। কেউ জুতো পায়ে, লাল পোশাক পরে অথবা চশমা চোখে ঘরে ঢুকতে গেলেই ভর্ৎসনা করছে। বড়দের নানা ধরনের আদেশ করছে। ভক্তরা ফল, ফুল, মেঠাইয়ে ঘর ভরিয়ে তুলতে লাগলেন।

'বড়ি-মা' আবির্ভাবের দিন দু'য়েকের মধ্যে এক বয়স্কা বিবাহিতা 'বড়ি-মা'র সেবিকা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। তারপর এক সময় 'বড়ি-মা'র মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোষণা করলেন তিনি 'ছোট-মা'। একই ঘরে দু'মায়ের পুজো হতে লাগল।

৩০ মে এই গ্রামেরই এক অষ্টাদশী তরুণী ঘন ঘন মূর্ছা যাওয়ার পর ঘোষণা করল সে মা-কালী। এখানেও ভক্তের অভাব হলো না।

৩১ মে এই গ্রামেরই একটি বিবাহিতা তরুণীকে ভর করলেন 'মাঝলী-মা'। সে রাতেই আর এক মহিলার উপর ভর করলেন 'সাঁঝলী-মা'।

জনমানসে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনাগুলোর দিকে রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালার চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। চিকিৎসকরা ভরগ্রস্তদের পরীক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যেই সাত দিনের মধ্যে ওদের প্রত্যেককে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনলেন। ওই চিকিৎসকরা মত প্রকাশ করলেন—ওই গ্রামের ভরে পাওয়া রোগীরা প্রত্যেকেই পরিবেশগতভাবে বিশ্বাস করত, ঈশ্বর সময় সময় মানুষের শরীরে ভর করেন। প্রথম কিশোরীটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হিস্টিরিয়া নামক মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ে। কিশোরীটি নিজের সত্তা ভুলে গিয়ে 'বড়ি-মা'র সত্তা নিজের মধ্যে প্রকাশিত ভেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, যুক্তি-বুদ্ধি কম, আবেগপ্রবণ। ফলে ওদের মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতাও কম। তাই একজনের হিস্টিরিয়া দ্রুত বহু জনের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে।

'হিস্টিরিয়া' মনোবিজ্ঞানের চোখে কী, একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্প-শিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়া বঞ্চিত শোষিত মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে

এই শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের সহনশীলতা যাদের কম, তারা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, অন্য কোষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ফলে মস্তিষ্কের কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নাম-গান শুনতে শুনতে বা গাইতে গাইতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ার অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো, যুক্তি ও জ্ঞানের আলো ব্যক্তি হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে সভ্য, শিক্ষিত মানুষরাও দলবদ্ধভাবে হিস্টিরিয়া রোগের শিকার হয়।

'৮৭-র জানুয়ারিতে কলকাতা টেলিফোনে অপারেটরদের মধ্যে তড়িতাহতের ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পায় যে, অটোম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জ, আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপারেটররা আন্দোলনে নেমে পড়েন। কানের টেলিফোন রিসিভার থেকে তাঁরা এমনই গভীরভাবে তড়িতাহত হতে থাকেন যে, অনেককে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করতে হয়। পরে রোগীদের মেডিক্যাল রিপোর্টে তড়িতাহতের কোনও সমর্থন মেলেনি। বরং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর জানা যায় তড়িতাহতের ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভয়জনিত কারণে গণ-হিস্টিরিয়া বা গণ-মানসিক রোগ।

ভরগ্রস্ত রোগীদের সিংহভাগই হিস্টিরিয়া রোগীর শিকার হলেও 'স্কিটসোফ্রিনিয়া' বা 'ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ' (Maniac Depresive) বা মানসিক অবসাদের থেকেও 'ভর' হয়। স্কিটসোফ্রিনিয়া নিয়ে আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি। তাই নতুন করে আবার আলোচনায় না গিয়ে বরং আমরা এখন 'ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ' বা মানসিক অবসাদ জনিত কারণে ভর হওয়া নিয়ে আলোচনা করব।

মানসিক অবসাদের রোগীরাও বেশিরভাগই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষা ও যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া মানুষ। পারিবারিক জীবনে এরা অসুখী এবং দায়িত্বভারে জর্জরিত, এবং তার দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত।

প্রায় তেত্রিশ বছর আগের ঘটনা। খড়গপুরের চিন্তামণি বাড়ি বাড়ি বাসন মাজার কাজ করত। যখনকার কথা বলছি, তখন চিন্তামণি তিন ছেলে-মেয়ের মা। ওর জীবনসঙ্গী রেল ওয়াগন ভেঙে মাঝে-মধ্যে যা রোজগার করে তার প্রায় পুরোটাই নেশা করেই ফুঁকে দেয়। মাঝে-মধ্যেই জেলের হাওয়া খেয়ে আসে শ্রীমান। চিন্তামণির শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য চিন্তামণিকেই দোষ দেয়। শ্রীমান মাঝে-মধ্যে নেশার টাকার জন্য চিন্তামণিকে মারধোর করে। এক সময় শ্রীমান মাস কয়েকের জন্য জেল ঘুরে এসে চিন্তামণির

চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। সন্দেহ থেকে রাগ, আর তার ফলে চিন্তামনির ওপর নেমে আসে শারীরিক ও মানসিকভাবে বীভৎস অত্যাচার। এই অত্যাচার চলাকালীন এক রাতে শ্রীমান তর্জন-গর্জন শুরু করতেই চিন্তামণি ততোধিক গর্জন করে শ্রীমানকে আদেশ করল তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে। আদেশ শুনে শ্রীমান তাকে প্রহার করতে যেতেই চিন্তামণি পাগলের মত মাথা দোলাতে দোলাতে দিগম্বরী হয়ে শ্রীমানের দু'গালে প্রচণ্ড কয়েকটি চড় কষিয়ে বলল, "জানিস আমি কে ? আমি মা-কালী।"

চিন্তামণির এই মানসিক অবসাদজনিত কারণে 'ভর' হওয়াটা অনেকের কাছেই ছিল ঈশ্বরের লীলা। রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক চিন্তামণির জীবনসঙ্গীকে ডেকে চিন্তামণির চিকিৎসা করাতে বলেছিলেন। বলেছিলেন এই 'ভর' কোনও ঈশ্বরের লীলা নয়, এক ধরনের পাগলামো। কিন্তু চিন্তামণির জীবনসঙ্গী, শ্বশুর, শাশুড়ি, কেউই চিকিৎসকের সাহায্য নিতে রাজি হয়নি। রাজি না হওয়ার বড় কারণটা মা-কালীর কৃপায় চিন্তামণির রোজগারপাতি মন্দ হচ্ছিল না।

কারণ : তেত্রিশ

হত্যে দিয়ে পাওয়া স্বপ্নাদৃষ্ট ওষুধে, দুয়া-কালামে, পানী-পড়ায়, তাবিজ কবজে কত রোগ ভাল হচ্ছে, দেখেছি মশায়—তারপরও যুক্তিবাদীরা 'হচ্ছে না, হচ্ছে না' বলে চেঁচালে মানব কেন মশায় ?

দেবস্থানে হত্যে দিয়ে স্বপ্নে দেখা ওষুধ পেয়ে রোগ সেরেছে, পীরের দুয়া-কালামে, পানী-পড়া, তেল-পড়ায় রোগী ভাল হয়েছে, অবতারের স্রেফ আশীর্বাদে ডাক্তারের জবাব দেওয়া রোগী দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছে, এমন প্রচুর ঘটনার কথা শোনা যায়। এবং এই শোনা ঘটনাগুলো নিয়ে সত্যানুসন্ধান চালালে কিছু কিছু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ব্যাপারটা সত্যি। স্বীকার করছি। দেবতা ও অবতারদের উপর নির্ভর করে রোগী রোগ মুক্ত হলে তা কি প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকেই স্বীকার করা নয় ? এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় বারবার। মজাটা হল, যেসব ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই রোগ কমে বা নিরাময় হয়, সে'সব ক্ষেত্রেও রোগ কমার কারণ কিন্তু অলৌকিকত্ব নয়। কারণ হল 'বিশ্বাস'। অলৌকিক চিকিৎসার ওপর রোগীর অপার বিশ্বাস।

মজাটা হল, যেসব ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই রোগ কমে বা নিরাময় হয়, সে'সব ক্ষেত্রেও রোগ কমার কারণ কিন্তু অলৌকিকত্ব নয়। কারণ হল 'বিশ্বাস'। অলৌকিক চিকিৎসার ওপর রোগীর অপার বিশ্বাস।

বিষয়টা বোঝাতে আসুন আমরা ফিরে যাই '৮৭-র মে মাসের এক সন্ধ্যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিনে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক, এক সাহিত্যিক-সাংবাদিক এবং জনৈক ভদ্রলোক।

চিকিৎসক জানালেন বছর আড়াই আগে সম্পাদকের স্ত্রীর ডান উরুতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। ছোট্ট অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও ওষুধে ফোঁড়ার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু এরপর ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান নিয়ে শুরু হয় এক নতুন সমস্যা। মাঝে-মাঝেই উরুর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত ও তার আশপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে ব্যথার তীব্রতায় রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে যেসব চিকিৎসকদের দেখান হয়েছে ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার শীর্ষস্থানীয়। ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এঁরা খুঁজে পননি। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র, এক্স-রে ছবি ও রিপোর্ট সবই দেখালেন আমাকে।

রোগিণীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে উরুর শুকনো ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, "একবার খড়গপুরে থাকতে দেখেছিলাম একটি লোকের হাতের বিষ-ফোঁড়া সেপটিক হয়ে, পরবর্তীকালে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, সামান্য ফোঁড়া থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটে।"

রোগিণী বললেন, "আমি নিজেই এই ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী। মেয়েটির হাতে বিষ-ফোঁড়াজাতীয় কিছু একটা হয়েছিল। ফোঁড়াটা শুকিয়ে যাওয়ার পরও শুকনো ক্ষতের আশে-পাশে ব্যথা হতো। একসময় জানা গেল, ব্যথার কারণ গ্যাংগ্রিন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হাত বাদ দিতে হয়।"

যা জানতে গ্যাংগ্রিনের গল্পের অবতারণা করেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের মতই স্পষ্ট যে, সম্পাদকের স্ত্রীর ফোঁড়া হওয়ার পর থেকেই গ্যাংগ্রিন স্মৃতি তাঁর মনে গম্ভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এই ফোঁড়া থেকেই আবার গ্যাংগ্রিন হবে না তো? এই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক থেকেই এক সময় ভাবতে শুরু করেন, "ফোঁড়া তো শুকিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে-মধ্যেই যেন শুকনো ক্ষতের আশেপাশে ব্যথা অনুভব করছি? আমারও আবার গ্যাংগ্রিন হলো না তো? সেই লোকটার মতোই একটা অসহ্য কষ্টময় জীবন বহন করতে হবে না তো?"

এমনি করেই যত দুশ্চিন্তা বেড়েছে, ততই ব্যথাও বেড়েছে। বিশ্বাস থেকে যে ব্যথার শুরু, তাকে শেষ করতে হবে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই।

আমি আর একবার উরুর শুকনো ক্ষত গভীরভাবে পরীক্ষা করে এবং শরীরের আর কোথায় কোথায় কেমনভাবে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে, ব্যথার অনুভূতিটা

কি ধরনের ইত্যাদি প্রশ্ন রেখে গম্ভীর মুখে একটা নিপাট মিথ্যে কথা বললাম, "একটা কঠিন সত্যকে না জানিয়ে পারছি না, আপনারও সম্ভবত গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।"

আমার কথা শুনে রোগিণী মোটেই দুঃখিত হলেন না। বরং উজ্জ্বল মুখে বললেন, "আপনিই সম্ভবত আমার অসুখের সঠিক কারণ ধরতে পেরেছেন।"

আমি আশ্বাস দিলাম, "আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, আমার অনুমান ঠিক কি না। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে আপনার কর্তাটিকে একটু কষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধ-পত্তর আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখবেন, তারপর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শরীরে বহু রোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। আমাদের মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ওপর। সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্মোন্মাদনা, জাত-পাতের লড়াই ইত্যাদি যত বাড়ছে দেহ-মনজনিত অসুখ বা Psycho-somatic Disorder তত বাড়ছে। সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে বলে এই সময় তাঁদের অনেকে দেহ-মনজনিত অসুখের শিকার হয়ে পড়েন।

মানসিক কারণে যে-সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডালেসিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। এইসব অসুখে ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। Placebo কথার অর্থ "I will please." বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি, "আমি খুশি করব।" ভাবানুবাদ করে বলতে পারি "আমি আরোগ্য করব।"

মানসিক কারণে যে-সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডালেসিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। এইসব অসুখে ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া

যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি।

○

রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে জানালাম, ব্যথার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। রোগিণীর মনে সন্দেহের পথ ধরে একসময় বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তাঁর উরুর ফোঁড়া সারেনি, বরং আপাত শুকনো ফোঁড়ার মধ্যে রয়েছে গ্যাংগ্রিনের বিষ। রোগিণীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কেমনভাবে প্ল্যাসিবো চিকিৎসা চালাতে হবে সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসক সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া উরুর ফোঁড়ার ওপর নানা রকম পরীক্ষা চালিয়ে একটা মেশিনের সাহায্যে রেখা-চিত্র তৈরি করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার রেখা-চিত্র তোলা হলো। দু'বারের রেখা-চিত্রেই রেখার প্রচণ্ড রকমের ওঠা মামা লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্তে ঘোষণা করলেন, গ্যাংগ্রিনের বিষের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিউইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দ্রুত আনানো হলো এমনই চোরা গ্যাংগ্রিনের বিষের অব্যর্থ ইন্‌জেকশন। সপ্তাহে দু'টি করে ইন্‌জেক্‌শন ও দু'বার করে রেখা-চিত্র গ্রহণ চলল তিন সপ্তাহ। প্রতিবার রেখা-চিত্রেই দেখা যেতে লাগল রেখার ওঠা-নামা আগের বারের চেয়ে কম। ওষুধের দারুণ গুণে ডাক্তার যেমন অবাক হচ্ছিলেন, তেমন রোগিণীও। প্রতিবার ইন্‌জেকশনেই ব্যথা লক্ষণীয়ভাবে কমছে। তিন সপ্তাহ পরে দেখা গেল রেখা আর আঁকা-বাঁকা নেই, সরল। রোগিণীও এই প্রথম অনুভব করলেন, বাস্তবিকই একটুও ব্যথা নেই। অথচ মজাটা হলো এই যে বিদেশী দামী ইন্‌জেক্‌শনের নামে তিন সপ্তাহ ধরে রোগিণীকে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ্ ডিসটিল্‌ড্ ওয়াটার।

বছর কয়েক আগে আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে দমদমের 'শান্তিসদন' নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ওই সময় শান্তি সদনের অন্যতম কর্ণধার অতীন রায়ের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। তিনি সেই সময় অতি সম্প্রতি আসা এক রোগিণীর কেস হিস্ট্রি শোনালেন। মাঝে মাঝেই রোগিণীর পেটে ও তার আশেপাশে ব্যথা হত। আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রতিবারই ব্যথাটা পেটের বিভিন্ন জায়গায় স্থান পরিবর্তন করত। এই দিকে আর এক সমস্যা হল, ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাক্তার রোগিণীকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বললেন, এটা খান, ব্যথা সেরে যাবে। ক্যাপসুল খাওয়ার পর রোগিণীর ব্যথার কিছুটা উপশম হল। অথচ ক্যাপসুলটা ছিল নেহাতই ভিটামিনের। ব্যথা কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে আবার ফিরে এলো। আবার ভিটামিন ক্যাপসুল দেওয়া হলো। এবারও উপশম হল সাময়িক। এভাবে আর কতবার চালান যায়। ডাক্তারবাবু

শেষ পর্যন্ত রোগিণীকে জানালেন, যে বিশেষ ইন্‌জেক্‌শনটা এই ব্যথায় সবচেয়ে কার্যকর সেটি বহুকষ্টে তিনি যোগাড় করেছেন। এবার ব্যথা চিরকালের মতো সেরে যাবেই।

ডাক্তারবাবু ইন্‌জেক্‌শনের নামে ভিটামিন পুশ করলেন। রোগিণীর ব্যথাও পুরোপুরি সেরে গেল।

কয়েক বছর আগে কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের আশপাশে এক গৌরকান্তি, দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ তান্ত্রিক ঘুরে বেড়াতেন। গলায় মালা (যতদূর মনে পড়ছে রুদ্রাক্ষের)। মালার লকেট হিসেবে ছিল একটা ছোট্ট রূপোর খাঁড়া। বৃদ্ধকে ঘিরে সব সময়ই অফিস-পাড়ার মানুষগুলোর ভিড় লেগেই থাকত। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল তান্ত্রিকবাবার অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের অসুখ বিসুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

সাধুবাবা রোগীর ব্যথার জায়গায় লকেটের খাঁড়া বুলিয়ে জোরে জোরে বার কয়েক ফুঁ দিয়ে বলতেন, "ব্যথা কমেছে না?"

রোগী ধন্দে পড়ে যেতেন। সত্যিই ব্যথা কমেছে কি কমেনি, বেশ কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করে প্রায় সকলেই বলতেন, "কমেছে, মনে হচ্ছে।"

এই আরোগ্য লাভের পিছনে তান্ত্রিকটির কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করত না, কাজ করত তান্ত্রিকটির অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস। কারণ, বেশ কয়েক দিন লক্ষ্য করে দেখেছি এঁদের অসুখগুলো সাধারণত অম্বলের ব্যথা, হাঁপানি, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, বুক ধড়ফড়, অর্শ, বাত ইত্যাদি।

এবারের ঘটনাটা আমার শোনা। বলেছিলেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। ডাঃ রায়ের সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ অমর মুখার্জি। তাঁর কাছে চিকিৎসিত হতে আসেন এক মহিলা। মহিলাটির একান্ত বিশ্বাস, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এর আগে কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন পেটে ব্যথার কারণ গলস্টোন নয়। চিকিৎসকদের এই ব্যাখ্যায় মহিলা আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

ডাঃ মুখার্জি মহিলার গল-ব্লাডারের এক্স-রে করালেন। দেখা গেল কোনও স্টোন নেই। তবু ডাঃ মুখার্জি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন রোগিণীকে বলতে, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এক্স-রে তো দুটো স্টোন দেখা গেছে। অপারেশন করে স্টোন দুটো বার করে দিলেই ব্যথার উপশম হবে।

রোগিণীকে জানান হলো অমুক দিন অপারেশন হবে। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করে পেটের চামড়া চর্বিস্তর পর্যন্ত কাটলেন এবং আবার সেলাই করে দিলেন। ও. টি. স্টাফের হাতে দুটো রঙিন

পাথর দিয়ে ডাঃ মুখার্জী বললেন, রোগিণী জ্ঞান ফেরার পর স্টোন দেখতে চাইলে পাথর দুটো দেখিয়ে বলবেন, এ-দুটো ওঁর পিত্তথলি থেকেই বেরিয়েছে।

রোগিণী কয়েকদিন হাসপাতালেই ছিলেন। সেলাই কেটেছিলেন ডাঃ রায়। রোগিণী হৃষ্টচিত্তে রঙিন পাথর দুটো নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। যে ক-দিন হাসপাতালে ছিলেন সে ক-দিন গলব্লাডারের কোনও ব্যথা অনুভব করেননি। অথচ আশ্চর্য, সাজানো অপারেশনের আগে প্রতিদিনই নাকি রোগিণী গলব্লাডারের প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন।

এবার যে ঘটনাটি বলছি, তা শুনেছিলাম ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জির কাছে। ঘটনাস্থল জামশেদপুর। ডাঃ মুখার্জি তখন জামশেদপুরের বাসিন্দা। নায়িকা তরুণী, সুন্দরী, বিধবা। ডাঃ মুখার্জির কাছে তরুণীটিকে নিয়ে আসেন তাঁরই এক আত্মীয়া। তরুণীটির বিশ্বাস তিনি মা হতে চলেছেন। মাসিক বন্ধ আছে মাস তিনেক। ডাঃ মুখার্জির আগেও অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, মাতৃত্বের কোনও চিহ্নই নেই। ডাক্তারের স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে মেয়েটির পরিবারের আর সকলে বিশ্বাস স্থাপন করলেও, মেয়েটি কিন্তু তাঁর পূর্ব বিশ্বাস থেকে নড়েননি। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি মা হতে চলেছেন এবং মা হলে তাঁর সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। ইতিমধ্যে সম্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পূর্ব ইতিহাস জানার পর ডাঃ মুখার্জি পরীক্ষা করে মেয়েটিকে জানালেন, "আপনার ধারণাই সত্যি। মা হতে চলেছেন। যদি অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চান নিশ্চয়ই তা পেতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে অ্যাবরশন করতে হবে।

সাজানো অ্যাবরশন হল। জ্ঞান ফিরতে রোগিণীকে দেখান হলে অন্য এক রোগিণীর দু'মাসের ফিটাস ট্রেতে রক্তসহ সাজিয়ে।

মেয়েটি সুখ ও স্বস্তি মেশান নিশ্বাস ছাড়লেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি তাঁর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

অনেক পুরনো বা Chronic রোগ আছে যেসব রোগের প্রকোপ বিভিন্ন সময় কমে-বাড়ে। যেমন গেঁটে বাত, অর্শ, হাঁপানি, অম্বল। আবার হাঁপানি, অম্বলের মতো কিছু পুরনো রোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে সেরে যায়। অলৌকিক বাবাদের কাছে কৃপা প্রার্থনার পরই এই ধরনের অসুখ বিশ্বাসে বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা কমলে বা সেরে গেলে অলৌকিক বাবার মাহাত্ম্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারি একবার আমাকে

বলেছিলেন, "মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও আমি কিন্তু অলৌকিক শক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। দীঘার কাছের এক মন্দিরে আমি এক অলৌকিক ক্ষমতাবান পুরোহিতের দেখা পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী গেঁটে-বাতে পায়ে ও কোমরে মাঝে-মাঝে খুব কষ্ট পান। একবার দীঘায় বেড়াতে গিয়ে ওই পুরোহিতের খবর পাই। শুনলাম উনি অনেকের অসুখ-টসুখ ভাল করে দিয়েছেন। এক সন্ধ্যায় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম মন্দিরে। পুজো দিলাম। সন্ধ্যারতির পর পুরোহিতকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। পুরোহিত বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ে আমার স্ত্রীর কোমর ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, এখন ব্যথা কমেছে না?' অবাক হয়ে গেলাম আমার স্ত্রীর জবাব শুনে। ও নিজের শরীরটা নাড়া-চাড়া করে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যথা অনেক কমেছে।' এইসব অতি-মানুষেরা হয়ত কোনও দিনই আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হাজির হবেন না, কিন্তু এদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার পর তা অস্বীকার করব কি ভাবে?"

আমি বলেছিলাম "যতদূর জানি আপনার স্ত্রীর বাতের ব্যথা এখনও আছে।"

আমার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি জবাব দিয়েছিলেন, "পুরোহিত অবশ্য আরও কয়েকবার ঝেড়ে দিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। কাজের তাগিদে আর যাওয়া হয়নি। ত্রুটিটা আমাদেরই।"

এই সাময়িক আরোগ্যের কারণ পুরোহিতের প্রতি রোগিণীর বিশ্বাস, পুরোহিতের অলৌকিক কোনও ক্ষমতা নয়। অথবা, পুরনো রোগের নিয়ম অনুসারেই স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় গেঁটে-বাতের প্রকোপ কিছুটা কম ছিল।

অর্শ রোগীদের অনেকেরই হাতের আঙুলে শোভিত হয় আড়াই প্যাঁচের একটা রুপোর তারের আংটি। যাঁরা এই আংটি পরেন, তাঁদের কাছে কোনও অর্শ রোগী আংটি ধারণ করে নিরাময় চাইলে সাধারণভাবে আড়াই-প্যাঁচি আংটির ধারক তাঁর আংটির তারের ছোট্ট একটা টুকরো কেটে দেন। ওই টুকরো স্যাঁকরাকে দিয়ে আড়াই-প্যাঁচি আংটি তৈরি করে ধারণ করেন অর্শ রোগী। ধারণ করার পর অর্শ রোগ সত্যিই কি সারে? আমি দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। সাধারণত যাঁদের হাতেই আড়াই-প্যাঁচি আংটি দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছি, আংটি পরে কতটা উপকৃত হয়েছেন। শতকরা ৩০ ভাগের মতো ধারণকারী জানিয়েছেন, আংটি পরে উপকৃত হয়েছেন। শতকরা ৪৫ ভাগের মত জানিয়েছেন, আংটির গুণ আছে কি না, এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার মতো কিছু বোঝেননি। বাকি ২৫ ভাগ জানিয়েছেন, কিছুই কাজ হয়নি। অর্শ অনেক সময় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই

সারে। যাঁদের সেরেছে, তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মকেই আংটির অলৌকিক নিয়ম বলে ভুল করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। '৮৮-র ২৯ জুলাই সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেদনে আনন্দবাজার পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে লেখা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

"*প্রীতিভাজনেষু জ্যোতিবাবু,*

আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম আপনি স্পন্ডিলাইটিসে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি স্পন্ডিলাইটিসে অনেকদিন ধরে ভুগেছি। তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রতুল মুখার্জি আমাকে একটা বালা দেন যার মধ্যে হাই ইলেকট্রিসিটি ভোল্ট পাস করানো হয়েছে। সেটা পরে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হই। আমি আপনাকে কয়েকদিনের মধ্যেই একটি তামার বালা পাঠাব, আশা করি সেটা পরে আপনি উপকার পাবেন।

আপনার দ্রুত নিরাময় কামনা করি, আমি এখন আরামবাগে আছি।

পুনঃ সম্ভবপর হলে সাইকেলে অন্তত দৈনিক আধঘণ্টা চাপবেন। আপনি বোধহয় জানেন আমি সাইকেলে চেপে একদা ভাল ফল পেয়েছি।

স্বাঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন

২৮.৭.৮৮

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান, তামার বালা পরেছিলেন ১৯৭৯ সালে। শ্রীসেনের কথায়, "স্পন্ডিলাইটিস হয়েছিল। ডঃ নীলকান্ত ঘোষাল দেখছিলেন। কিছুই হলো না। কিন্তু সেই তামার বালা ব্যবহার করলাম, প্রথম ৭ দিনে ব্যথা কমে গেল। পরের ১৫ দিনে গলা থেকে কলার খুলে ফেললাম।"

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর নাকি তামার বালা বিক্রি খুব বেড়ে গিয়েছিল শহর কলকাতায়। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বক্তব্য এবং জ্যোতি বসুকে লেখা চিঠি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের মধ্যে নয়, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবে শরীরের ওপর ধাতুর প্রভাব কতখানি অথবা বাস্তবিকই প্রভাব আছে কি না, বহু প্রশ্নের ও পত্রের মুখোমুখি হয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের জানিয়েছি, 'শরীরের উপর ধাতুর প্রভাব আছে', এটা সম্পূর্ণ অলীক ধারণা।

'আর্থ' না করে তামার বালা পরে জীবনধারণ করার চিন্তাও বাস্তবসম্মত নয়। তামাকে 'আর্থ' হওয়া থেকে বাঁচাতে বালাধারণকারীকে তবে পৃথিবীর ছোঁয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে জীবন ধারণ করতে হয়। কারণ,

বালাধারণকারী পৃথিবীর সংস্পর্শে এলেই বালার তামা 'আর্থ' হয়ে যাবে। অথচ অনেকেই বলে থাকেন, 'অর্থ' না হতে দেওয়া তামার বালা পরলে অব্যর্থভাবে বাত সারে।

আরও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তামার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে না।

মানবদেহে অল্প পরিমাণে বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে এবং নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসাতে মৌলিক দ্রব্যের ব্যবহার সুবিদিত। গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতার জন্য LIVOGEN CAPSULE বা ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় রয়েছে লৌহ। প্রস্রাব সংক্রান্ত অসুখের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে MERCUREAL DIURETIC (DIAMOX) দেওয়া হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় পারদ রয়েছে। এক ধরনের বাতের চিকিৎসায় অনেক সময় MYOCRISIN দেওয়া হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় সোনা রয়েছে।

যখন রোগিণীকে LIVOGEN CAPSULE বা ঐ জাতীয় ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন তখন পরিবর্তে রোগিণীকে এক কুইন্টাল লোহার ওপর শুইয়ে রাখলেও প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না। কারণ, মৌল দ্রব্য বা ধাতু শরীরে ধারণ করলে তা কখনই শোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে না।

উপরের দু'টি স্তবকে যা লিখেছি তা আমার ব্যক্তি-বিশ্বাসের কথা নয়, বিজ্ঞানের সত্য।

এরপর যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেবে, তা হলো প্রফুল্লচন্দ্র কি তবে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? যদিও আমরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে শিখেছি, সমাজশীর্ষ মানুষরাও মিথ্যাশ্রয়ী হন, তবু তামার বালা পরে প্রফুল্লচন্দ্রের স্পন্ডিলাইটিস আরোগ্যের মধ্যে কোনও অবাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি না।

আমার এই কথার মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধিতা খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু যাঁরা এতক্ষণে প্লাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়টি বুঝে নিয়েছেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের রোগমুক্তির ক্ষেত্রে তামা বা বিদ্যুৎশক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য বা গুণই কাজ করেনি, কাজ করেছিল তামা, বিদ্যুৎশক্তি এবং সম্ভবত ডঃ প্রতুল মুখার্জির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের একান্ত বিশ্বাস।

অ্যাকুপ্রেসার স্যান্ডেলের কথা ব্যাপক বিজ্ঞাপনের দৌলতে অনেকেরই জানা। সর্বরোগহর এক অসাধারণ স্যান্ডেল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মাত্র দুবার হাঁটলেই নাকি নার্ভে সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, দূর হয় হরেক রকমের অসুখ, হজমশক্তির দারুণ রকমের উন্নতি হয়। রোগমুক্তির এমন সহজ-সরল উপায়ে অনেকেই আকর্ষিত হচ্ছেন, কিনেও ফেলেছেন। ব্যবহারের পর অনেকের নাকি অনেক অসুখ-বিসুখ সেরেও যাচ্ছে। অথচ বাস্তব সত্য হলো এই যে, যাঁরা আরোগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের আরোগ্যের পিছনে স্যান্ডেলের কোনও গুণ

বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ করেনি, কারণ কাজ করা সম্ভব নয়। কাজ করেছে স্যান্ডেলের প্রতি রোগীদের অন্ধ-বিশ্বাস।

সুকান্ত মুস্তাফি আমার বন্ধু, রক্তচাপের রোগী। বছর কয়েক আগের কথা। ওর সল্টলেকের বাড়িতে গিয়েছি। ওর পরনে ছিল পাজামা ও স্যান্ডো গেঞ্জি। ডান বাহুতে দেখতে পেলাম ঘড়ির বেল্টের মত একটা বেল্ট। ওটা কি জিজ্ঞেস করায় জানাল, ম্যাগনেটিক বেল্ট। এক বন্ধু বিদেশ থেকে এনে দিয়েছেন। বলেছেন, রক্তচাপ ঠিক রাখতে নাকি অব্যর্থ। সুকান্তও নাকি বেশ ভালই কাজ পাচ্ছে।

বুঝলাম বেল্টের প্রতি বিশ্বাস সুকান্তর রক্তচাপকে ঠিক রাখতে সাহায্য করছে। এও প্ল্যাসিবো চিকিৎসারই ফল।

আবার একই ধরনের বেল্ট পরেও আমার বন্ধু পত্নী অধ্যাপিকা সুচরিতা সান্যাল তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে পারেননি।

এ-বারের ঘটনার নায়ক ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। নায়িকা তাঁর প্রেমিকা এলিজাবেথ। এলিজাবেথ ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। এলিজাবেথের পরিবারের সকলের না-পছন্দ মানুষ ছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং। রবার্ট ব্রাউনিং পরিকল্পনা করেছিলেন এলিজাবেথ নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলে দু'জনে বিয়ে করবেন। এলিজাবেথের বাড়ি ছেড়ে বেরোন ছিল একটা সমস্যা। কারণ শিরদাঁড়ার প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। ব্রাউনিং-এর উৎসাহ এলিজাবেথকে রোগ জয় করতে সক্ষম করেছিল। এলিজাবেথ শিরদাঁড়ার ব্যথা ভুলে বাড়ির উঁচু পাঁচিল টপকে বাইরে এসেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত রবার্ট ব্রাউনিংকে বিয়ে করেছিলেন।

সালটা সম্ভবত '৮৪। এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। হোটেলে পৌঁছতেই রাত দশটা পার হয়ে গেল। এগারোটায় খাবারের পাঠ চুকানোর পর প্রকাশক বন্ধুটির খেয়াল হলো সঙ্গে ঘুমের বড়ি নেই। অথচ প্রতি রাতেই ঘুম আনে ঘুমের বড়ি। বেচারা অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়লেন। "কি হবে প্রবীর ? এত রাতে কোনও ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া অসম্ভব। তোমার কাছে কোনও ঘুমের ওষুধ আছে ?" বললাম, "আমারও তোমার মতোই ঘুম নিয়ে সমস্যা। অতএব সমাধানের ব্যবস্থা সবসময়ই সঙ্গে রাখি। শোবার আগেই ওষুধ পেয়ে যাবে।"

শুতে যাওয়ার আগে প্রকাশকের হাতে একটা ওষুধহীন ক্যাপসুল দিয়ে আমিও একটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপসুলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে প্রকাশক বললেন, "এটা আবার কি ধরনের ওষুধ ? ক্যাপসুলে ঘুমের ওষুধ ? নাম কি ?"

একটা কাল্পনিক নাম বলে বললাম, "ইউ. এস. এ'র ওষুধ।" কলকাতার এক সুপরিচিত চিকিৎসকের নাম বলে বললাম,"আমার হার্টের পক্ষে এই ঘুমের ওষুধই সবচেয়ে সুইটেবল বলে প্রতি তিন মাসে একশটা ক্যাপসুলের একটা করে ফাইল এনে দেন। যে চিকিৎসকের নাম বলেছিলাম তিনি যে আমাকে খুবই স্নেহ করেন সেটা প্রকাশক বন্ধুটির জানা থাকায় আমার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন ঘুম হলো?"

"ফাইন। আমাকেও মাঝে-মধ্যে এক ফাইল করে দিও।"

প্রকাশকের বিশ্বাস হেতু এ ক্ষেত্রে ওষুধহীন ক্যাপসুলই সে রাতে ঘুম আনতে সক্ষম হয়েছিল।

কয়েক বছর আগের কথা। আমার কাছে এসেছিলেন এক চিকিৎসক বন্ধু এক বিচিত্র সমস্যা নিয়ে। বন্ধুটি একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে এক রোগিণী ভর্তি হয়েছেন, তাঁকে নিয়েই সমস্যা। তিনি মাঝে-মাঝে অনুভব করেন গলায় কিছু আটকে রয়েছে। এইসময় তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়। এক্স-রেও করা হয়েছে, কিছু মেলেনি। দেহ-মনজনিত অসুখ বলেই মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় কি ধরনের পদক্ষেপ নিলে রোগিণী তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন বলে আমি মনে করি সেটা জানতেই আসা।

পরের দিনই নার্সিংহোমে রোগিণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন বন্ধুটি। নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে রোগিণী তাঁর উপসর্গের কারণ হিসেবে কি ভাবছেন, এইটুকু জানতে চাইছিলাম। জানতেও পারলাম। চিকিৎসক বন্ধুটিকে জানালাম, রোগিণীর ধারণা তাঁর পেটে একটা বিশাল ক্রিমি আছে। সেটাই মাঝে-মাঝে গলায় এসে হাজির হয়। অতএব রোগিণীকে আরোগ্য করতে চাইলে একটা বড় ফিতে ক্রিমি যোগাড় করে তারপর সেটাকে রোগিণীর শরীর থেকে বার করা হয়েছে এই বিশ্বাসটুকু রোগিণীর মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারলে আশা করি তাঁর এই সাইকো-সোমটিক ডিসঅর্ডার ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক দিন পরে বন্ধুটি আমাকে ফোনে খবর দিলেন রোগিণীর গলা থেকে পেট পর্যন্ত এক্স-রে করে তাঁকে জানান হয়েছিল একটা বিশাল ফিতে ক্রিমির অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অপারেশন করে ক্রিমিটাকে বের করা প্রয়োজন। তারপর পেটে অপারেশনের নামে হালকা ছুরি চালিয়ে রোগিণীর জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে ক্রিমিটা দেখান হয়েছে। এরপর চারদিন রোগিণী নার্সিংহোমে ছিলেন। গলার কোনও উপসর্গ নেই। রোগিণীও খুব খুশি। বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাক্তার বন্ধুটিকে।

বিশ্বাসবোধকে যে শুধুমাত্র চিকিৎসকেরাই কাজে লাগান, তা নয়। অনেক

তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরেরাও বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় ঘটিয়ে অলৌকিক 'ইমেজ' বজায় রাখেন অথবা বর্ধিত করেন।

বিশ্বাসবোধকে যে শুধুমাত্র চিকিৎসকেরাই কাজে লাগান, তা নয়। অনেক তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরেরাও বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় ঘটিয়ে অলৌকিক 'ইমেজ' বজায় রাখেন অথবা বর্ধিত করেন।

কারণ ঃ চৌত্রিশ

ঈশ্বর বিশ্বাস পৃথিবীর সব ধর্মেই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কোনও ধর্মই এই বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলে মনে করে পরিত্যাগ করেনি। সব ধর্মই কি তবে শুরু থেকে ভুলই করে চলেছে?

বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনা করতে পারি।

এক ঃ বিভিন্ন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্মের সৃষ্টি ও আবির্ভাবের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাব, ধর্মগুরুরা যখন ধর্মকে সমষ্টিগত রূপ দিলেন, সংঘের রূপ দিলেন, প্রতিষ্ঠানের রূপ দিলেন, তখন ধর্মগুলো হয়ে উঠল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। প্রায় সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত হল—'আত্মা' বা 'পরমাত্মা'য় বিশ্বাস। এই আত্মা—পরমাত্মায় বিশ্বাস নির্ভর মতবাদই 'অধ্যাত্মবাদ'। অধ্যাত্মবাদের উপর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ চাপিয়েছে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। 'পরমাত্মা' ও নানা ধর্মে পরিচিত হয়েছে নানা নামে। ভগবান—ঈশ্বর—আল্লা—ব্রহ্ম আরও কত কী!

শুরু হল এক নতুন যুগ। ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করে সমষ্টিগত ধর্মের যুগ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যুগ। এক সময় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম পরিণত হল মানুষের উপর প্রভুত্ব করার হাতিয়ারে। শাসক ও শোষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় বা স্পনসরশিপে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কি ভাবে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে জড়িয়ে ফেলেছিল—সে এক দীর্ঘ পরিক্রমার ইতিহাস। আমরা এখানে সে ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় যাব না। আমরা বরং ফিরে তাকাব—ঈশ্বর নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সৃষ্টির আগের মানুষদের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের দিকে।

সে সময় মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে। এ'ছিল প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার লড়াই। শিকার

করতে গিয়ে কখনও শিকার হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসে, বন্যায় আস্তানা ভেসেছে বার-বার। এসেছে মৃত্যু। খরায় মাটি ফেটেছে, ছাতি ফেটেছে। সঙ্গে কত না রোগের আক্রমণ, অপরিশোধিত জল থেকে বাহিত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, মশা-মাছি বাহিত রোগ ইত্যাদি তো ছিলই নিত্যসঙ্গী। অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। ভয় ও শ্রদ্ধা করেছে জল, ঝড়, বৃষ্টি, নদী সমুদ্র, মেঘ, বজ্রপাত, বন্যা, আগুন, পাহাড়-পর্বত, মাটি ইত্যাদিকে। এ সবেরই প্রাণ আছে বিশ্বাসে বসিয়েছে দেবতার আসনে। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি জড় নক্ষত্র ও গ্রহগুলো পূজিত হয়েছে জীবন্ত দেবতা হিসেবে। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করেছে বৃক্ষ, অরণ্য, গরু-ছাগল, শুয়োর এবং আরও নানা ধরনের গৃহপালিত জন্তু এবং সেই সঙ্গে তারাও দেবতা হিসেবে পুজো পেয়েছে। পুজো পেয়েছে বনের বিপদ হয়ে দাঁড়ান পশু বাঘ, সিংহ, হাতি, হনুমান থেকে সরীসৃপ সাপ, কুমির পর্যন্ত। বিপদ থেকে ভয়, আর ভয় থেকেই বিপদের কারণগুলোকে খুশি করতে চেয়েছে মানুষ। সেই খুশি করতে চাওয়াই হয়ে উঠেছে 'পুজো'। ওরা শিকারে সফলকাম হতে নাচ করেছে,বর্ষা নামাতে মেঘের দেবতাকে তুষ্ট করতে নেচেছে, জমির উর্বরতা কামনায় নাচে উদ্দাম হয়েছে। ওদের পুজোয় ধর্মগুরুর কোনও ভূমিকা ছিল না। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গুরুদের তখন আবির্ভাবই হয়নি, যে গুরুরা ধর্মকে সমষ্টিতে রূপ দিয়েছিল। তখন এ'সব পুজোর পুরোহিত ছিল ওঝা, গুনীন, জানগুরু ইত্যাদি এবং তাদের স্তরটা ছিল ব্যক্তিগত।

প্রাচীন ভারতের কর্ম-মীমাংসা দর্শনের দিকে তাকালে দেখাতে পাবেন ওই দর্শন নিখুঁত যাগযজ্ঞগুলোকেই ক্ষমতার উৎস, মনোবাঞ্ছা পূরণের চাবিকাঠি মনে করত। ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে অভীষ্টে পৌঁছবার চেষ্টা করেনি। বলতে কি, ঈশ্বর পরমাত্মার ক্ষমতাকে গণনার মধ্যেই আনতে চায়নি। কর্ম-মীমাংসার যুগে ইচ্ছেপূরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল যাগযজ্ঞের, ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য নয়।

প্রকৃতি পুজোর সময়কার মানুষ পরমাত্মাজাতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না। প্রকৃতিই ছিল তাদের ঈশ্বর। তাদের ঈশ্বরের সংজ্ঞা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঈশ্বরের সংজ্ঞার চেয়ে ভিন্নতর। এদের ঈশ্বর প্রকৃতি।

প্রকৃতি পুজোরও আগের মানুষের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব, তাদের চিন্তা দেবতাশূন্য। প্রকৃতির সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিটি পদক্ষেপে টিকে থাকার লড়াই চালাতে সে সময়কার মানুষদের কোনও দেবতার কাছেই নতজানু হতে হয়নি। তবু তারা টিকে ছিল। দেবতাকে পাত্তা না দিয়েও টিকে ছিল। তাদের টিকে থাকার জন্য সেই ভয়ংকর প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কোনও দেবতার প্রয়োজন হয়নি। তারা যে টিকে ছিল, আমাদের বর্তমান উপস্থিতিই তার প্রমাণ।

সে সময়কার মানুষদেরও একটা 'ধর্ম' অবশ্যই ছিল। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের 'ধর্ম' থেকে মানুষের 'ধর্ম'-এর একটা স্পষ্ট পার্থক্যও ছিল। এই পার্থক্যই মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করেছে, বিশিষ্ট করেছে। সে সময় মানুষের 'ধর্ম' ছিল 'মনুষ্যধর্ম', যা বর্তমান 'মানবতা'রই প্রাথমিক পর্যায়। অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে আদিম মানুষদের এই 'ধর্ম'-এর পার্থক্য ছিল এই, অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ; কিন্তু মানুষ সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার পাশাপাশি প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজেদের অনুকূলে আনতেও সচেষ্ট ছিল।

এই আলোচনার সূত্র ধরে আমরা এখন নিশ্চয়ই বলতে পারি, "ঈশ্বর বিশ্বাস পৃথিবীর সব ধর্মেই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে"—ইত্যাদি জাতীয় প্রতিটি কথা ঐতিহাসিক ভাবেই অসত্য, কারণ 'ধর্ম' বলতে বর্তমানকালের ধর্মীয়বেত্তারা যা বোঝান, সেই 'ধর্ম'ই আবহমানকালের নয়।

"ঈশ্বর বিশ্বাস পৃথিবীর সব ধর্মেই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে"—ইত্যাদি জাতীয় প্রতিটি কথা ঐতিহাসিক ভাবেই অসত্য, কারণ 'ধর্ম' বলতে বর্তমানকালের ধর্মীয়বেত্তারা যা বোঝান, সেই 'ধর্ম'ই আবহমানকালের নয়।

দুই ঃ ঈশ্বর অবিশ্বাসী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ইতিহাসও প্রাচীন। এই ঈশ্বর বাদ দেওয়া ধর্মকেও সমষ্টিগত রূপ দেওয়া হয়েছিল, সংঘের রূপ দেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এমনই দুই ধর্ম যারা নিরীশ্বরবাদী এবং বেদবিরোধী হিসেবে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল।

এই প্রসঙ্গে এটুকু মনে করিয়ে দিলে বোধহয় একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, চার্বাক দর্শনের নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকতাবাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নিরীশ্বরবাদী ও বেদবিরোধী হলেও এই ধর্মের প্রবক্তা চিন্তানায়করা মানুষের পার্থিব জীবনের অনিবার্য পরিণতি দুঃখময় বলে মনে করতেন। পীড়া-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখময় জীবন থেকে নিজেকে বাঁচাতে জীবন বিচ্ছিন্ন এক জীবনকে খুঁজতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এমনই ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ছিল স্পষ্টতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

চার্বাকবাদ নিরীশ্বরবাদী ও বেদবিরোধী অবশ্যই কিন্তু মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতি চার্বাক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট ইতিবাচক। তাঁদের চিন্তার মধ্যে ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ।

এই আলোচনার পর এ'কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি, পৃথিবীর সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল না। পরন্তু কিছু কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলে মনে করত।

তিন ঃ যুক্তির কাছে অন্ধ-বিশ্বাস বা ব্যক্তি-বিশ্বাসের কোনও দাম নেই। যুক্তি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ ধরে। যুক্তিবাদীদের কাছে তথাকথিত ধর্মই আত্মা ও পরমাত্মা নির্ভর প্রতিটি ধর্মই যখন অন্ধ-বিশ্বাস হিসেবে বাতিল তালিকাভুক্ত, তখন ওইসব ধর্ম বা বহু ধর্ম কোন্ বিশ্বাসকে গ্রহণ করল ও কোন্ বিশ্বাসকে গ্রহণ করল না, তাতে যুক্তিবাদীদের কি এলো-গেলো ?

পৃথিবীর বহু ধর্মের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতা বিজ্ঞানের সত্যের আদৌ কোনও প্রমাণ নয়। কোনও ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা শুধু এটুকুই প্রমাণিত হতে পারে, ধর্মটি নিরীশ্বরবাদী নয়, ঈশ্বরবাদী, অর্থাৎ ধর্মটিতে 'ঈশ্বর' নামক এক অলীক-বিশ্বাস জাঁকিয়ে বসে আছে।

পৃথিবীর বহু ধর্মের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতা বিজ্ঞানের সত্যের আদৌ কোনও প্রমাণ নয়। কোনও ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা শুধু এটুকুই প্রমাণিত হতে পারে, ধর্মটি নিরীশ্বরবাদী নয়, ঈশ্বরবাদী, অর্থাৎ ধর্মটিতে 'ঈশ্বর' নামক এক অলীক-বিশ্বাস জাঁকিয়ে বসে আছে।

অধ্যায় ঃ চার

ঈশ্বর বিশ্বাস : মানবতা-সুনীতি-দুর্নীতি

কারণ ঃ পঁয়তিরিশ
কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঈশ্বর ভক্তকে স্বর্গ দিতে পারে ?

প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই সোচ্চারে বলে—স্রেফ তাদের ঈশ্বরই পারে স্বর্গে নিয়ে যেতে, তাদের ধর্মীয় অনুশাসনই স্বর্গের একমাত্র দিশা। শুধু এটুকু বলেই তারা ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু এ'ও বলে, তাদের ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্মে বিশ্বাস রাখলে নরক ছাড়া গতি হবে না। অন্য ধর্মের অনুশাসন কাঁটায় কাঁটায় মেনে চললেও সে'সব ধর্মের সাধ্য হবে না স্মরণাগত ভক্তদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার। সত্যি বলতে কি, স্বর্গে যাওয়া তো দূরস্থান, সাধ্য হবে না ভক্তদের অনিবার্য নরকবাস থেকে বাঁচাবার।

মনুসংহিতায় ও ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাকপন্থী সহ সমস্ত বেদ-বিরোধী (অর্থাৎ মুসলিম, খ্রিস্ট সহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম) নাস্তিক পাষণ্ডদেরই শ্রীভগবান জন্মে জন্মে বার বার নরকে নিক্ষেপ করবেন।

তাহলে কি হিন্দু ভিন্ন অন্য যে কোনও ধর্মই জীবাণুর ভূমিকা গ্রহণ করে ? এবং জীবাণু আক্রমণের ফল ভুগতে হয় মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে ?

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে প্রশ্ন দু'টি এলে তিনি দু'বারই 'হ্যাঁ' বলতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় সমাজে ইসলামের আগমন, সুস্থ মনুষ্যদেহে জীবাণুর আক্রমণের সঙ্গে তুলনীয়। [বাণী ও রচনা, স্বামী বিবেকানন্দ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩।

সমস্ত হিন্দু ধর্মগুরুদের চোখে হিন্দু ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। কিন্তু এই জাতীয় বিশ্বাসে বাধ সেধেছে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাস। তাদের সাফ্ কথা—না না, এ'সব বিলকুল বকওয়াস। হিন্দু কাফেরদের জন্য পরলোকে আছে শুধুই নরকের ব্যবস্থা। ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরাই যেতে পারে স্বর্গে।

কোরআন-এর সূরা আল এমরান ৮৫ তে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম অবলম্বন করে আছে, তার ধর্মপালন সৎ কাজ হিসেবে গৃহীত হবে না। পরলোকে তার ক্ষতিই হবে।

সূরা এনাম ১১৩-তে বলা হয়েছে, কাফের (অ-ইসলামী) মানুষরা শয়তানরূপী মানুষ (প্রিয় পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করুন, এখানে অন্যান্য ধর্মের মানুষরা জীবাণুর পরিবর্তে শয়তান)। তারাও শয়তানের মত ঈশ্বর অনুগ্রহে বঞ্চিত।

সূরা এনাম ৭১-এ আছে, ইসলাম ধর্মই ঈশ্বরের ধর্ম, সে-ই সত্যধর্ম।

বলুন তো,কার কথায় বিশ্বাস করি? কোন্ ধর্মকে 'জীবাণু' বিবেচনায় ধ্বংস করতে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য? কোন্ ধর্মের ঈশ্বর বেশি শক্তিশালী?

প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যখন তাদের কল্পনার ঈশ্বরকেই স্বর্গের টিকিট বিলোবার একমাত্র 'অথরিটি' বলে প্রচার করে চলেছে, তখন যে জরুরী প্রশ্নটা স্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ধার্মিকদের আসা উচিত ছিল, কিন্তু আসছে না, তা হল—কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবি ঠিক? কোন যুক্তিতে দাবিটি ঠিক বলে গণ্য করা হবে? 'নিজের ধর্ম' এই যুক্তিতে? কেউ ধর্মান্তরিত হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? ধর্মান্তরিতের ছেড়ে আসা ধর্মের ঈশ্বর 'ফালতু' হয়ে যাবেন? আর ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে যে ঈশ্বর ছিলেন নেহাতই ফালতু, তিনি মুহূর্তে হয়ে উঠবেন স্বর্গ-নরকে পাঠাবার দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা?

একটি মানুষের ধর্ম পাল্টাবার ক্ষমতার উপর যদি ঈশ্বরের ক্ষমতা একান্তভাবেই নির্ভরশীল হয়, তবে বলতেই হয়—মানুষই ঈশ্বরকে 'ফালতু' ও 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা' তৈরি করার কারিগর।

কেউ ধর্মান্তরিত হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? ধর্মান্তরিতের ছেড়ে আসা ধর্মের ঈশ্বর 'ফালতু' হয়ে যাবেন? আর ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে যে ঈশ্বর ছিলেন নেহাতই ফালতু, তিনি মুহূর্তে হয়ে উঠবেন স্বর্গ-নরকে পাঠাবার দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা?

একটি মানুষের ধর্ম পাল্টাবার ক্ষমতার উপর যদি ঈশ্বরের ক্ষমতা একান্তভাবেই নির্ভরশীল হয়, তবে বলতেই হয়—মানুষই ঈশ্বরকে 'ফালতু' ও 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা' তৈরি করার কারিগর।

'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র নির্বাহী সম্পাদক সৈকত মজুমদার বউবাজারে যুক্তিবাদী সমিতির অফিসের লাগোয়া চায়ের দোকানে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে একটা কথা বলেছিলেন বছর খানেক আগে, "বাবরি মসজিদ ভাঙায় একটা কথা সাফ জাহির হল, রাম বল আর আল্লা বল, দু'জনের ক্ষমতাই স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ। রাম জন্মভূমিতে বাবরি মসজিদই যদি হল, তবে সে মসজিদ রাম কেন ভাঙতে পারলেন না! কেন ভাঙার জন্য প্রয়োজন হল উন্মত্ত রামভক্তদের!

মসজিদ্ ভাঙার পরও ভগবান রাম কেন নিজের জন্মভূমিতে নিজের সামান্য মন্দিরটুকু পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারছেন না? কেন ভগবান রামের শক্তি ভারত সরকারের কাছে, আইনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে?

বাবরি মসজিদ ভাঙল কিছু মানুষ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি পারলেন, সামান্য কিছু মানুষের পেশীশক্তিকে পরাজিত করে বাবরি মসজিদ রক্ষা করতে? কেনই বা আল্লাহ নতুন করে নিজের মসজিদ্ গড়ে তুলতে পারছেন না? কেন আল্লাহের শক্তি ভারত সরকারের কাছে, আইনের কাছে নতজানু?

যাঁরা ইহ-জগতে নিজেদের অধিকারটুকু, নিজেদের ইজ্জৎটুকু রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁরা ইহ-জগতে এবং পর-জগতে দুনিয়ার সমস্ত-কালের মানুষদের রক্ষা ও বিচার করবেন—এমন আজগুবি কথাতে বিশ্বাস রাখবে কারা বলুন তো?"

সৈকতের প্রশ্নের পিঠে মানবতাবাদী সমিতিরই অন্যতম সম্পাদক সুদীপ মৈত্র উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন, মা শীতলার বাহনরা!"

কারণ : ছত্রিশ
'স্বর্গ ভোগ' ও 'নরক ভোগ' কি অধ্যাত্মিক, না শারীরিক?

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের বড়-মেজ-ছোট (জনপ্রিয়তার নিরিখে) বহু ধর্মগুরুদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আর সুযোগ পেলেই তাঁদের টেনে নিয়ে গেছি 'পরলোক' নিয়ে আলোচনায়।

সব ধর্মেই যেহেতু 'আত্মা' আছে এবং আত্মারা অমর, তারই সূত্র ধরে এসেছে মৃত্যুর পর 'পরলোক', এবং পরলোকের বিচারক 'পরমাত্মা', 'ঈশ্বর', 'আল্লাহ'...যে নামেই ডাকুন।

বারবারই তাঁদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে—স্বর্গ বা নরকে অথবা বেহেস্ত বা দোজখে মৃত্যুর পর আত্মারা যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, সেইসব সুখ বা দুঃখ কি শারীরিক না অধ্যাত্মিক? হলফ করে বলছি, তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রাথমিকভাবে উত্তর ছিল—অধ্যাত্মিক। আপনারা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে

পারেন। সব ধর্মের বাবাজি-মাতাজিরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরেও প্রথমে বলবেন ঐ 'অধ্যাত্মিক' শব্দটিই।

এমন উত্তর শোনার পর প্রত্যেক গুরুদের কাছেই জানতে চেয়েছি—আপনার ধর্মের গ্রন্থেই অতি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা। 'স্বর্গ' বা 'বেহস্ত' মানেই ভোগের অফুরন্ত ব্যবস্থা। খানা-পিনা, মদ, নারীদেহ সবেরই বিপুল আয়োজন। আর 'নরক' বা 'দোজখ' মানেই শরীরে ধারাল করাতের আসা-যাওয়া, আগুন-গরম শলাকার দেহতে প্রবেশ, পূঁজ-রক্ত খাওয়া, আগুনে বা গরম তেলে দগ্ধ করা ইত্যাদি মধ্যযুগীয় শাস্তির চেয়েও বর্বরোচিত নানা ব্যাপার-স্যাপার। কিন্তু এইসব বর্ণনা থেকে বুঝতে সামান্যতমও অসুবিধে হয় না, সুখ-দুঃখের বিষয়গুলো আদৌ কোনও অধ্যাত্মিক, আত্মার বা মনের ব্যাপার নয়। অতি স্পষ্টতই শারীরিক ব্যাপার। কারণ, 'আত্মা' বিষয়ে ধর্মের বক্তব্য—আত্মা আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রের আঘাতে আহত হয় না। শরীর আহত বা হত হলেও আত্মা আহত বা হত হয় না। ধর্মের এই বক্তব্য মেনে নিলে আত্মাকে কাটা বা ঝলসানো সবই অসম্ভব।

সাধারণ যুক্তিতেই ধর্মের দেওয়া আত্মার সংজ্ঞাকে মেনে নিলে এ'কথাও মেনে নিতে হয়, আত্মাকে আহত করে শাস্তি দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ('আত্মা' বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগুরুদের মতামত ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জানতে পড়ুন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ৪র্থ খণ্ড)। শুধু তাই-ই নয়, আত্মার পক্ষে পূঁজ-রক্ত বা মদিরা—দুই পান-ই অসম্ভব। অসম্ভব হুরীদের সঙ্গে সহবাস।

পরলোকের ভোগ ও শাস্তি'র কথা সত্যি হলে আত্মার 'শরীর' বা 'জীবদেহ' থাকতে বাধ্য। ভোগ ও শাস্তি অধ্যাত্মিকভাবে সম্ভব নয়। "আত্মা আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রের আঘাতে খণ্ডিত হয় না, আত্মা হত বা আহত হয় না"—এ'জাতীয় ধর্মীয় বক্তব্যকে মেনে নিলে, পরলোকে ভোগ ও শাস্তির কথা মিথ্যে হয়ে যায়। আত্মা একই সঙ্গে জীবদেহ হীন, আবার ভোগ বা শাস্তি গ্রহণে সক্ষম—এ কথা মানলে সোনার পাথরবাটির অস্তিত্বও মানতে হয়। এই স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে একজন ধর্মগুরু হিসেবে আপনি কিছু বলবেন কি?

পরলোকের ভোগ ও শাস্তি'র কথা সত্যি হলে আত্মার 'শরীর' বা 'জীবদেহ' থাকতে বাধ্য। ভোগ ও শাস্তি অধ্যাত্মিকভাবে সম্ভব নয়। "আত্মা আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রের আঘাতে খণ্ডিত হয় না, আত্মা হত বা আহত হয় না"—এ'জাতীয় ধর্মীয় বক্তব্যকে মেনে নিলে, পরলোকে ভোগ ও শাস্তির কথা মিথ্যে হয়ে যায়। আত্মা একই সঙ্গে জীবদেহ হীন, আবার ভোগ বা শাস্তি গ্রহণে সক্ষম—এ কথা মানলে সোনার পাথরবাটির অস্তিত্বও মানতে হয়।

বিশ্বাস করুন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নেতারা এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য হাজির না করে প্রসঙ্গ এড়াতে গোলা গোলা কথা উগরে গেছেন। আপনারা, পাঠক-পাঠিকারা নিজেরা পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, আমার বক্তব্য শতকরা এক'শ ভাগই সত্যি।

'আত্মা' ও 'পরলোক' ধারণাগুলো যদি এ'ভাবে স্ববিরোধিতায় মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে তারপর 'আত্মা' ও পরলোকের বিচারক 'পরমাত্মা'—'ঈশ্বর'—'আল্লাহ' যে নামেই ডাকুন—সে সবের অস্তিত্বও যে মিথ্যে হয়ে যায়!

কারণ ঃ সাঁইত্রিশ
জীবহত্যায় পাপ হয়, না পুণ্য? এতে করে ঈশ্বর রাগেন, না খুশি হন?

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে 'জীবহত্যা মহাপাপ'। এই দুই ধর্মের অনুসারীরা নিরামিষ খাবার খান। তাঁদের দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যেই নিরামিষ খাবার খান। সুতরাং তাঁদের ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে পশু বলি—আরে ছিঃ ছিঃ! ঈশ্বর কখনও কি তাঁরই সৃষ্টিকে, তাঁরই সন্তানকে বলি চরিয়ে আনন্দ পেতে পারেন? ঈশ্বর কি শয়তান?

হিন্দু ধর্মের দিকে তাকান। সেখানে শাক্তরা অর্থাৎ শক্তির উপাসকরা বিশ্বাস করেন, বলিতে দেবতা সন্তুষ্ট হন। হিন্দুদের মধ্যে একসময় নরবলিরও প্রচলন ছিল। এবং বলির মধ্যে নরবলিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। নরবলি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার পর, হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলার ভয়ে এই, প্রথা প্রায় বন্ধ। তবে আজও লুকিয়ে-চুরিয়ে নরবলি হয়।

শক্তির দেবী কালী, তারা, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, দুর্গা, চামুণ্ডা, সাপের দেবী মনসা, কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি রোগের দেবী শীতলার কাছে পশুবলির প্রচলন রয়েছে। বলি দেওয়া হয় সাধারণভাবে পাঁঠা, ভেড়া, মোষ, হরিণ, শুয়োর, কাছিম ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মে 'কোরবানী' একটি বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'কোরবানী'তে বলি দেওয়া হয় গরু, ভেড়া, ছাগল, উট ইত্যাদি। যারা কোরবানী দেয়, তারা ঈশ্বরের প্রিয় হয় বলে মুসলিমরা বিশ্বাস করে।

এরপর যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল—কোন্ ধর্মের কথা ঠিক, হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে জীববলিতে বা কোরবানীতে পুণ্য, নাকি বৌদ্ধ ও জৈন্য ধর্মের বিধান মত জীবহত্যা পাপ?

১

কোন্ ধর্মের কথা ঠিক, হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে

জীববলিতে বা কোরবানীতে পুণ্য, নাকি বৌদ্ধ ও জৈন্য ধর্মের বিধান মত জীবহত্যা পাপ ?

O

কারণ ঃ আটত্রিশ
ঈশ্বর-চিন্তা, পাপ-পুণ্য বোধ কি মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত করে ?

আনন্দবাজার পত্রিকায় ৫ ডিসেম্বর '৯৪ 'ঈশ্বর' শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসের পক্ষে একটি যুক্তি হাজির করেছিলেন, যে যুক্তি বহুজন বহু সহস্রবার হাজির করেই চলেছেন। যুক্তিটা এই—ঈশ্বর বিশ্বাস করার ফলে মানুষ অনেক সময় কুকাজ থেকে বিরত থাকে। "ঈশ্বর পাপ দেবেন" এমন চিন্তাই অনেক সময় কুকাজ থেকে মানুষকে বিরত করে।

O

'ঈশ্বর পাপ দেবেন' চিন্তা মানুষকে দুর্নীতি থেকে বিরত যদি করতেই পারত, তবে ভারতের মত ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দেশ কখনই দুর্নীতিতে বিশ্বের প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পারত না।

O

না, করে না শুভবাবু। আদৌ করে না। 'ঈশ্বর পাপ দেবেন' চিন্তা মানুষকে দুর্নীতি থেকে বিরত যদি করতেই পারত, তবে ভারতের মত ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দেশ কখনই দুর্নীতিতে বিশ্বের প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পারত না। ভারতে নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাদের দেখতে মাইক্রোস্কোপের দরকার হয়। তাহলে একেবারে নিচুতলা থেকে সর্বোচ্চ তলা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কেন এত বিশাল দুর্নীতি ? এ'দেশে সব ধর্মের ব্যবসাই দারুণ জমজমাট। কালীপুজো, দুর্গাপুজো, রামপুজো, শনিপুজো, পিরিরের দরগায় সিন্নি, ইফতার পার্টি, মহরমের তাজিয়া, গির্জায় মোম, পাদ্রি সাহেবদের মাইক ফোঁকা, জৈনদের মিছিল, বিশ্বধর্ম সম্মেলন, মায়াপুরের কৃষ্ণ ভজনা ইত্যাদি রমরমার পিছনে রয়েছে ধনকুবের হুজুরের দল ও তাদের টাকায় নির্বাচনে জেতা শাসকগোষ্ঠি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর স্পনসরশিপ। তবু কেন এত দুর্নীতি শুভবাবু ? বরং ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অকাজ-কুকাজ করেও পার পাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এ'সব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের নিশ্চিত গ্যারান্টি। আর এমন গ্যারান্টি দিয়ে পাপ মুক্ত করার পবিত্র স্থানের ফাঁদ পাতা রয়েছে ভুবন জুড়ে। অতএব মা'ভৈ ! নীতিবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শবোধ সব কিছুকে শিকেয় তুলে রেখে শুধু

ভোগ করে যাও। চিত্তে যা চায়, ভোগ করে যাও। খাও-পিও-মৌজ বানাও। 'ঋণ করে ঘি খাওয়া'র মত কুঁচো চিন্তা ছেড়ে বড় করে ভাবতে শেখ। ঋণ করে মদ খাও, গণ্ডা-গুচ্ছের শয্যাসঙ্গী ও সঙ্গিনী পোষ। ঋণ শোধের কথা না ভাবলেও চলবে। চাই কি বেশি তাগাদা দিয়ে বিরক্ত করলে ঋণদাতাকে পৃথিবী থেকেই নিকেশ করে দাও। ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে শোধ না করার ও সে টাকাকে 'নয়-ছয়' করার যে ট্র্যাডিশন ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের দেশ ভারতে আছে, তারই একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হর্ষদ মেহেতার ব্যাঙ্ক থেকে ছ'হাজার কোটি টাকা মেরে দেওয়া। এতো স্রেফ ধরা পড়ে যাওয়া একটি ঘটনা মাত্র, যা হিমশৈলের ভেসে থাকা মাথার মতই সমগ্রের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। এইসব প্রতারকরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, এবং "এলো-মেলো করে দে মা, লুটে-পুটে খাই"-তেও বিশ্বাসী। এরা জানে পাপ স্খালনের জন্য কুম্ভমেলায় কিংবা সাগরমেলায় একটা ডুব দিলেই যথেষ্টর কিছু বেশি। দিন-ক্ষণ দেখে মেলা হয়। সে সময় ডুব দিয়ে পাপ ধুয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের মত সময় বের করতে না পারলেও কুছ পরোয়া নেই। ব্যস্ত ধনীদের আলাদা ব্যবস্থাও আছে। তিরুপতিতে হিরের প্যাকেট, জগন্নাথের পায়ের তলায় কোটি টাকার বাণ্ডিল, এমন ঘুষ অনেক দেবস্থানেই ধারাবাহিকভাবে পড়েই চলেছে। ভগবানদের ভূমিকা অনেকটা মস্তানদের 'দাদা'র মত। বিপদে পড়লে উদ্ধার করবে। বিনিময়ে কিঞ্চিৎ প্রণামী।

O

ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অকাজ-কুকাজ করেও পার পাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এ'সব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

O

সত্যিই ভাবুন তো, ভোগবাদী, প্রতারক, হত্যাকারী থেকে ধর্ষক, প্রত্যেকের জন্যেই পরম করুণাময় সব ধর্মের ঈশ্বরের কি অপার করুণা! পাপীদের উদ্দেশে ভগবান হেঁকে বলছেন—"লুটে-পুটে খেতে ভয় কি রে পাগল, আমি তো আছি"।

হে ভোগবাদীগণ, আপনারা কেউই চার্বাকের ওই তথাকথিত ভোগবাদী দর্শনের খপ্পরে পড়ে নাস্তিক হতে যাবেন না। ওরা কতটুকু দিতে পারে? ওরা নাকি ঋণ করে ঘি খাওয়ার কথা বলেছে। শেষপর্যন্ত ঋণ শোধ না করলেও চলবে, কারণ এ জীবনেই তো সব শেষ। হে ভোগবাদীগণ, ওদের কথায় প্রলুব্ধ হবেন না। পরলোক আছে। নিশ্চয়ই আছে। আছে পুনর্জন্ম। এ'জন্মের কর্মফল অনুসারেই আগামী জন্মে ফল পাবেন। হে মহান ও বিশিষ্ট ভোগবাদীগণ, আমরা নিশ্চিত করছি, ধর্মের নামে নিশ্চিত করছি, ঈশ্বরের নামে নিশ্চিত করছি—আপনারা আপনাদের মস্তিষ্ক খাটিয়ে যে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছেন, তাকে পর্বত করতে সচেষ্ট হউন। এতে দুষ্টেরা ও পরশ্রীকাতরেরা যদি আপনাদের

শোষক-টোষক বলে গাল পাড়ে তো পাড়তে দিন। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে যত খুশি শোষণ চালিয়ে ভোগ-সাগরে চার বেলা অবগাহন করুন। আপনার সমস্ত পাপকে ধুয়ে সাফ-সুতরো করে পুণ্যের 'আই এস আই' ছাপ মেরে দেব কপালে। তারই ফলে পরলোকে..., বিশ্বাস করুন মদ-মেয়েছেলের যা দারুণ আয়োজন, কোথায় লাগে এই জাগতিক সেরা বার কাউন্টার, সেরা দেহোপজীবিনী, উ—ফ্! তারপর আবার যখন পৃথিবীতে জন্মাবেন, পুণ্যিবলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে. তারপর ভাবুন তো—আবার ভোগ, আবার পুণ্যি, আবার পরলোকে ভোগ, আবার সোনার চামচ মুখে...ব্যাপারটা বৃত্তাকারে ঘুরেই চলবে। ভোগে, রসে-বশে থাকতে পেলে কে এ'জন্মেই সব চুকিয়ে ফেলতে চায়—ভদ্রোমহোদয়গণ! তাই আবারও বলি, চার্বাক দর্শনের খপ্পরে না পড়ে, আপনারা ভক্তিবাদ, বিশ্বাসবাদ, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি ঈশ্বর-নির্ভর দর্শনে মন-প্রাণ সঁপে দিন। হে মহান ভোগবাদে বিশ্বাসী ক্যারিয়ারিস্টগণ, আপনারা নিজেরটা গুছিয়ে নিতে শিখুন। আর শিখুন শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু তুলে দিতে তাঁরই চরণে—যাঁর কৃপাতে হলেন সুখী, পেলেন ধন-জন। আপনি ঈশ্বরকে দেখুন, ঈশ্বর আপনাকে দেখবে।

হে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভোগবাদীগণ, এতক্ষণের বক্তব্য থেকে এখন নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস আপনাদের মধ্যে রোপণ করতে পেরেছি, ঈশ্বর-নির্ভর ভাববাদী দর্শন ভোগবাদ তোষণেরই দর্শন। আমাদের দর্শনের কাছে চার্বাকের তথাকথিত ভোগবাদী দর্শন যেন শ্বেতহাঙরের কাছে নেহাতই পুঁচকে একটা মৌরলা মাছ।

শুভবাবু, আপনাকে একটি খবর শোনাই। ১৯৮৮ সালের ২ মার্চ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত একটি অনুসন্ধান বা সার্ভে চালিয়ে ছিল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। বেছে নেওয়া হয়েছিল ১০০ জন বিভিন্ন ধরনের অপরাধীকে। এই অপরাধীদের মধ্যে ৬৬ জন হিন্দু দেব-দেবীর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে, ৩২ জন আল্লাহের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ২ জন যিশুর অলৌকিক ক্ষমতায় ও করুণাময়তায় বিশ্বাসী। ১০০ জনই পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্বর্গ-নরক জাতীয় স্থান বাস্তবিকই আছে বলে বিশ্বাস করে। পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর কৃপায়, তীর্থদর্শনে, পুণ্য স্নানে, মক্কা দর্শনে এবং 'কনফেস'-এর মধ্য দিয়ে পাপ স্খালন ও পুণ্য সঞ্চয় হয় বলে বিশ্বাস করে।

১০০ জনের মধ্যে ৮৯ জনই বিশ্বাস করে অপরাধ করতে করতে যে কোনও সময় জীবন যেতে পারে। পাপ স্খালনের সুযোগ নেবার আগেই যেতে পারে, আবার নাও যেতে পারে।

শুভবাবু, ঈশ্বর-বিশ্বাস, পরলোক-বিশ্বাস, পাপের ফল নরক যন্ত্রণা—এইসব বিশ্বাস কিন্তু অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

কেন পারেনি? এর কারণ খুঁজে পেতে গেলে শুভবাবু, আপনাকে ফিরে তাকাতেই হবে এ'দেশের আর্থসামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের দিকে।

এ দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ টিঁকিয়ে রেখেছে অসাম্যের সমাজ-ব্যবস্থা। এ সমাজে খাটতে চাইলেও পাওয়া যায় না কাজের গ্যারান্টি। চিকিৎসার সুযোগ, লেখা-পড়ার সুযোগ সংবিধানের পাতাতে শুধু ছাপাই থাকে। ভাত-কাপড়-পানীয় জল ও মাথা গোঁজার ঠাঁই প্রতিটি নাগরিককে দেবার যে সংকল্প সংবিধানে রয়েছে, তার খবরই জানে না দেশের নিরন্ন মানুষগুলো। ওরা আগাছার মতই বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে সমাজের সমস্ত বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্যে। যে বয়সে আপনার আমার বাড়ির শিশু লজেন্স চোষে, সেই বয়সে ওদের বাড়ির শিশু চলন্ত ট্রেনে লজেন্স ফেরি করে। যে বয়সে গাড়ি চেপে আপনার আমার বাড়ির শিশু ফিট্‌ফাট পোশাকে স্কুলে যায়, সে বয়সে ওদের বাড়ির শিশু কালি-ঝুলি মেখে মটোর-গ্যারেজে গাড়ি সারাবার 'ফালতু'। লোডশেডিং নিয়ে যখন আপনি আমি এবং আমাদের পত্রিকাগুলো গলা ফোলাচ্ছে, তখন ওরা অদ্ভুত নির্বিকার। মুক্ত আকাশের নীচে ফুটপাতে বা পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট বস্তির ঘরে দশটা মানুষের স্তূপ। আলো বলতে ফুটপাতে স্ট্রিটলাইট, পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট ঘরে কুপি। কুপি জ্বলে, তবে অনেক হিসেব কষে। আলোই যে দেখেনি, তার আবার আলো হারাবার ভয় কী? হাওয়াই যে পায়নি, তার হাওয়া হারাবার ভয় কী? ওরা অন্ধকার জগতের অনেক কেষ্ট-বিষ্টুদের দাবার ঘুঁটি। ওরা ফালতু-পালতু। কেষ্ট-বিষ্টুদের ইশারায় প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলায় মাতে। ওরা একদিনে তৈরি হয়নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা ওদের একটু একটু করে তৈরি করেছে।

যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে হত্যাকারী, ধর্ষক, গুণ্ডা, ছেনতাইবাজ, ডাকাত, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু পারই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ দু-বেলা ঠাকুর প্রমাণ সেরে, নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবেই; এবং যাচ্ছেও তা। এই তো ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভারতের সামাজিক অবস্থা।

যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে হত্যাকারী, ধর্ষক, গুণ্ডা, ছেনতাইবাজ, ডাকাত, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু পারই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ দু-বেলা ঠাকুর প্রমাণ সেরে, নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবেই; এবং যাচ্ছেও তা।

এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের এমন কিছু শেখাবার চেষ্টা করে চলেছে, যা অন্ধবিশ্বাস নির্ভর, যা অর্ধসত্য, যা একপেশে, যা অধ্যাত্মবাদী ও ভোগবাদী মতবাদের পরিপোষক, যা ক্যারিয়ারিজিমের আঁতুড়ঘর, যা অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক। এই শিক্ষা ব্যবস্থায়

যে-প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে তৈরি হয়ে চলেছে, তারা প্রকৃত শিক্ষিত না হয়ে অসাম্যের এই সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তি হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের শিক্ষা, তাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভুল শিখিয়ে এসেছে 'দেশপ্রেম' সম্পর্কে, 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' সম্পর্কে, 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে, 'জাতীয় সংহতি' সম্পর্কে, 'মৌলবাদ' সম্পর্কে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে, 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে, 'মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব' সম্পর্কে (এই বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়ুন 'সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ)।

টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, গান, নাচ, বৃহৎ পত্র-পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশকরা বিশাল ভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা টেলিভিশনে কতটা মারদাঙ্গা দেখব, কতটা যৌনতা, কতটা ভক্তিরসে আপ্লুত হবো, ধর্মগুরুদের বাণীর দ্বারা কতটা আচ্ছন্ন হবো, কতটা ভাগ্য-নির্ভর হবো, কতটা ঈশ্বর বিশ্বাসী হবো, কতটা ভূতে, "আদর্শ-নারীর গুণ—পতিসেবা, পতির পরিবারের সেবা, লজ্জা"—এই ধরনের নীতিবোধ কতটা আমাদের মাথায় ঠাসবো—এ সবই ঠিক করে দিচ্ছে বিভিন্ন ধনকুবের গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রশক্তি। আমরা কী ধরনের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস কবিতা পড়ব—তা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত করে দিচ্ছে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশকরা। প্রচারমাধ্যমগুলোর সংবাদ সরবরাহের 'নিরপেক্ষ' মোড়কের আড়ালে থাকে একটি একপেশে মূল্যবোধ ও মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে সাধারণ মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেবার দৃঢ় প্রচেষ্টা। এই একপেশে মূল্যবোধ কাদের স্বার্থ-রক্ষায় সহায়ক হবে ? অর্থাৎ, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সহায়ক হবে ? অবশ্যই প্রচারমাধ্যমের মালিক যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই শ্রেণীর। কারণ প্রচারমাধ্যমগুলোর নীতি মালিকের শ্রেণী চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

প্রচারমাধ্যমগুলোর সাহায্যে ধনকুবেরগোষ্ঠী আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে নতুন নতুন উৎপাদিত ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা। আমরা কোন্ ধরনের সিনেমা দেখব, 'অপরাধ' কতটা বীরত্বের সূচক হিসেবে আমাদের চেতনায় ধরা পড়বে, ধর্ষণে কতটা খুঁজে পাব উত্তেজনার মজা, অশ্লীল নাচে কতটা খুঁজে পাবে আধুনিকতার মুক্ত হাওয়া, দেশপ্রেম সম্পর্কে কতটা ভুল ধারণা গেলানো হবে—সে সবই ঠিক করে কোটিপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেন্সর ক্ষমতার অধিকারী সরকার। এমনই সমাজ সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসেবেই দলে দলে উঠে আসছে কিশোর অপরাধী, ঠাণ্ডামাথার কিশোর খুনি, ঠাণ্ডামাথার কিশোর ধর্ষক।

শুভবাবু, এতক্ষণের দেওয়া যুক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার পূর্ব-মতকে পাল্টাতে সমর্থ হয়েছিল। আপনি যদি সুপরিকল্পিতভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ব্যক্তি না হন, যুক্তির প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে, সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠার প্রতি যদি আন্তরিক সহানুভূতি থাকে, তবে নিশ্চয়ই আপনি পাল্টাবেন।

অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত করতে **'ঈশ্বর'** নামের জুজুর ভয়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ নিজেকে সঠিক আদর্শবোধ ও সঠিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত করে, সে কখনই খারাপ কাজ করে না। তাকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করানো যায় না। 'সঠিক আদর্শবোধ', 'সঠিক মূল্যবোধ' শব্দ দুটি ব্যবহারের কারণ, এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে 'বেঠিক আদর্শবোধ' ও 'বেঠিক মূল্যবোধ' প্রবল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত করতে 'ঈশ্বর' নামের জুজুর ভয়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ নিজেকে সঠিক আদর্শবোধ ও সঠিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত করে, সে কখনই খারাপ কাজ করে না।

আমাদের এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্তা ধনকুবেরগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণকে কায়েম রাখতে হাতে রাখে সরকার, প্রশাসন-পুলিশ-সেনাবাহিনী, প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের। ধনকুবেরগোষ্ঠীর শোষণের সহায়ক এই শক্তিগুলো শোষকশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে বহু নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়। এই নীতিবোধ ও মূল্যবোধ ব্যাপক প্রচারের ফলে, ব্যাপক মগজ ধোলাইয়ের ফলে বহুর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও আসলে এগুলো 'বেঠিক নীতিবোধ' বা 'বেঠিক আদর্শবোধ' এবং 'বেঠিক মূল্যবোধ'।

কারণ ঃ উনচল্লিশ
পাপ-পুণ্যের হিসেবে তো বেজায় গোলমাল!

পরলোকে বিশ্বাসী হিন্দুরা মনে করেন, মানুষের পাপ-পুণ্যের সমস্ত হিসেব রাখেন চিত্রগুপ্ত। মুসলিম ধর্মে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের কাঁধের উপর বসে রয়েছে দু'জন করে ফেরেস্তা। এদের নাম 'কেরামান' ও 'কাতেবীন'। একজন লেখেন সৎ কাজের বিবরণ, অপরজন অসৎ কাজের।

মানুষ জন্মেই কখনও 'সৎ' বা 'অসৎ' কাজ করতে পারে না। 'সৎ' বা 'অসৎ' কাজ করার মত ন্যায়-অন্যায় বোধ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপ-পুণ্যের হিসেব চালু হয় না, চালু হয় না কেরামান ও কাতেবীন—এর লেখার কাজ। মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কারও উপর নামাজ ও রোজা ফরজ হয় না। নাবালকের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ, পাপ-পুণ্য বোধ তৈরি হয় না বলেই নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে তাদের ছাড় দেওয়া হয়।

এতদূর পর্যন্ত না হয় শোনা গেল, মানা গেল। কিন্তু তারপরও যে অনেক চিন্তা উঠে আসে। মানুষের তো সাবালক হওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। তবে ঠিক কোন্ সময় থেকে চিত্রগুপ্ত, কেরামান, কাতেবীন ও অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তাঁদের ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেব রাখা শুরু করেন ?

যারা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, যাদের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বোধ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মনে দাগ কাটে না, তাদের ক্ষেত্রে চিত্রগুপ্ত, দুই ফেরেস্তা বা অন্য ধর্মের ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রতিনিধি কীভাবে হিসেব রাখেন! তাদের মৃত্যুর পর কোনও দিনই কি বিচার হয় না ? তারা তো না স্বর্গের অধিকারী, না নরকের! তবে সে সব আত্মাদের কী হয় ? তারা থাকে কোথায় ?

যারা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, যাদের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বোধ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মনে দাগ কাটে না, তাদের ক্ষেত্রে চিত্রগুপ্ত, দুই ফেরেস্তা বা অন্য ধর্মের ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রতিনিধি কীভাবে হিসেব রাখেন। তাদের মৃত্যুর পর কোনও দিনই কি বিচার হয় না ? তারা তো না স্বর্গের অধিকারী, না নরকের। তবে সে সব আত্মাদের কী হয় ? তারা থাকে কোথায় ?

ফেরেস্তা দু'জন যে মানুষের কাঁধে বসে তাদের পাপ-পুণ্যের হিসেব লেখেন, কী দিয়ে লেখেন, অদৃশ্য ফেরেস্তা কি অদৃশ্য কাগজে অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখেন ? এত কিছুর পর পাপ-পুণ্যের হিসাবটা আল্লাহের কাছে দৃশ্যমান হয় তো ? নাকি তাও অদৃশ্যই থেকে যায় ?

পাপ-পুণ্যের হিসেবে এতবড় গোলমাল ধরা পড়ার পর পাপ-পুণ্যের বিচারক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি কী করে ?

কারণ : চল্লিশ

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ? পরলোকের বিচার কি সব প্রাণীদের বেলায়-ই প্রয়োগ করা হয় ?

গরুর রচনার সেই গল্পটা অনেকেরই জানা। সেই যে, সেই ছেলেটা পরীক্ষার জন্য একটি-ই রচনা মুখস্ত করে গেছে। গরুর রচনা। প্রশ্ন পেয়ে দেখে, রচনা এসেছে শ্মশানের। ছেলেটি লিখল—আমাদের গ্রামে একটি শ্মশান আছে। গ্রামবাসী কেহ মারা গেলে সেখানে তাহাকে দাহ করা হয়।

এই দুটি বাক্য লিখেই ছেলেটি শ্মশানে গরুকে এনে ফেলতে একটি লাইন

লিখল, শ্মশানে কচি কচি ঘাস হয়। তারপর আর কি, "এই ঘাস গরুতে খায়" লিখেই সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ল গরুর রচনায়।

আজ পর্যন্ত বহু ধর্মের ধর্মগুরুদের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। অনেকের সঙ্গেই অধ্যাত্মবাদ, আত্মা, পরমাত্মা, নিয়তি, অলৌকিকত্ব, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা যে বিষয়েই হোক, এক সময় তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই গরুর রচনার মত এনে ফেলেছি একটি প্রশ্ন—ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন কোন্ উদ্দেশ্যে ?

প্রত্যেকেরই উত্তর ছিল এক ও অভিন্ন। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঈশ্বরের নাম ভজনা ও গুণ কীর্তন করা। সে ঈশ্বরকে কৃষ্ণ, যিশু, যেহোভা, আল্লাহ বা অন্য যে নামেই ডাকি।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর, আল্লাহ বা ওই ধরনের কোনও পরমাত্মার নাম ভজনা ও গুণকীর্তনই হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য জীব সৃষ্টির কারণ কী ? হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, আরশোলা কি পিঁপড়ে, সব্বাই কি তবে ঈশ্বর ভজনা করে ? ওইসব প্রাণীরা কোন্ ঈশ্বরের ভজনা করে ? কৃষ্ণের না আল্লাহের ? যিশুর না বুদ্ধের ? তাদের ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ? সাকার হলে দেখতে কেমন ? পিঁপড়ের ঈশ্বর কি পিঁপড়ের মত দেখতে, বাঘের ঈশ্বর দেখতে বাঘের মত ?

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর, আল্লাহ বা ওই ধরনের কোনও পরমাত্মার নাম ভজনা ও গুণকীর্তনই হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য জীব সৃষ্টির কারণ কী ? হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, আরশোলা কি পিঁপড়ে, সব্বাই কি তবে ঈশ্বর ভজনা করে ?

আচ্ছা, মৃত্যুর পর সব প্রাণীদেরই আত্মার নিশ্চয়ই বিচার হয় ? সব প্রাণীরই কি ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বোধ আছে ? একটা শুঁয়োপোকা থেকে জেলিফিস, সব্বারই এই ধরনের বোধ আছে ? মানুষ ছাড়া অন্য জীবদের মধ্যে অথবা বহু জীবদের মধ্যে যদি এই ধরনের ন্যায়-অন্যায়বোধ কাজ না করে, সেক্ষেত্রে সে-সব প্রাণীর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় কীভাবে ? ওদের পাপ-পুণ্যের হিসেব রাখার জন্যেও কি চিত্রগুপ্ত, কেরামান—কাতেবীনরা হিসেবের খাতা খুলে তৎপর ? অথবা তৎপর রয়েছেন অন্য কোনও ধর্মের ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি ? ভাইরাস থেকে শ্যাওলা—সব প্রাণীরই কি পাপ-পুণ্যের হিসেব হয় ? সবারই শেষ বিচার করেন ঈশ্বর ?

আচ্ছা, ভাইরাসের পাপ-পুণ্যের বোধোদয় হয় কোন্ বয়সে ?আর, সজনে গাছটার বোধোদয় হয় কোন্, বয়স থেকে ? বীজ থেকে গাছের বোধের উদয় আগে হয় ? না, কলমের গাছের ন্যায়-অন্যায় বোধটা আগে টনটনে হয় ?

গাছেরা কোন্ ঈশ্বরের ভজন-কীর্তন করে পুণ্যি করতে—কে জানে? আহারে, সদ্য অঙ্কুরিত ছোলাগুলো যখন খেয়ে ফেলি, তখন ছোলার অঙ্কুরগুলো বোধহয় একটুও পুণ্যি অর্জনের সুযোগ পায় না।

আমাদের মানুষদের পাপ ধুয়ে ফেলার হরেক রকম ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য জীবদের তীর্থ দর্শনের ও ঈশ্বর দর্শনের সুযোগ নেই। আহা-হা-রে—

মনুষ্যেতর প্রতিটি জীবের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত শেষ বিচারের ব্যবস্থা না থাকলে, মানুষের ক্ষেত্রেই শুধু তা আছে—মানি কোন্ যুক্তিতে? আর, বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্বই না থাকলে বিচারক (ঈশ্বর) কী করবেন?

কারণ : একচল্লিশ
ধর্ম কি ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত? ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ মেনে চলাই কি সৎপথে চলা, মানবিক হয়ে ওঠার দিশা?

'ধর্ম' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম'

আসলে 'ধর্ম' শব্দটাই বেশ গোল পাকায়। 'ধর্ম' শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষিতরাই সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর উৎপত্তিগত অর্থকে টেনে আনেন। বলেন—যা আমাদের জীবনকে ধারণ করে তাই 'ধর্ম'। কিন্তু যা আমাদের জীবনকে ধারণ করে, তা দিয়ে কোনও ভাবেই 'ধর্ম' কি—সে ধারণায় পৌঁছন যায় না। কারণ, অনেক কিছুই আমাদের জীবনকে ধারণ করে। আমাদের জীবন প্রথম যা ধারণ করে তা হল মাতৃগর্ভ বা টেস্টটিউব। আমরা কি মাতৃগর্ভ বা টেস্টটিউবকে 'ধর্ম' বলব? প্রতি দিনকার খাদ্য-পানীয়ের দেওয়া পুষ্টি জীবনকে ধারণ করে। বাতাসের অক্সিজেন জীবনকে ধারণ করে। শিশুকালে পিতা মাতার সাহায্য-সহযোগিতা জীবনকে ধারণ করে। এ'ভাবে পরিবার, বন্ধু, শিক্ষা, শিক্ষক, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সবই তো জীবনকে ধারণ করে রাখে। এ'সবই কি 'ধর্ম'? কিন্তু তা তো নয়।

হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট ইহুদি ইত্যাদি প্রচলিত ধর্মগুলোকে বিশ্লেষণ করে ধর্মের ধারণা বা সংজ্ঞায় পৌঁছতে চাইলে আমরা কী পাব? বেদ, ভগবদ্গীতা, পুরাণে যে বহু সংখক দেব-দেবীর কথা আছে, তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সেই সব দেব-দেবীদের খুশি করতে পুজো-ব্রত-যাগযজ্ঞ ইত্যাদির উপযোগিতায় বিশ্বাস ও আত্মার অমরত্ব, কর্মফল, ভাগ্য, ঈশ্বরসৃষ্ট বর্ণ বৈষম্য ইত্যাদিতে যিনি বিশ্বাস করেন ও মান্য করেন তিনিই হিন্দু। যাঁরা কোরানকে অপৌরুষেয়

মনে করেন, হজরত মোহম্মদকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করেন, কোরান ও হাদিস নির্দিষ্ট পথে চলাকে মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করেন, কেয়ামতে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন বেহস্ত ও দোজখে, আত্মার অমরত্বে ফেরস্তা ও নিপাকে, রোবাক ও মেয়ারাজের অস্তিত্বে, তিনিই মুসলমান। যাঁরা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর কাহিনী অনুযায়ী যিশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করেন এবং মান্য করেন, যিশুর পুনরুত্থানের কাহিনী সত্যি বলে বিশ্বাস করেন, নিউ টেস্টামেন্টের নির্দেশ মত আচার-আচরণকে সদাচার মনে করেন, আত্মা তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তিনিই খ্রিস্টান।

কিন্তু শুধুমাত্র এতেই হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্ট ধর্মগুলো চূড়ান্ত রূপ পায় না। প্রত্যেক ধর্মেরই রয়েছে কাশী, পুরী, মক্কা, মদিনা, জেরুজালেমের মত পবিত্র তীর্থস্থান ; মন্দির, মসজিদ, গীর্জার মত উপাসনাকক্ষ ; ঈশ্বরকে তুষ্ট করার নানা উপচার-পদ্ধতি-প্রকরণ, বেদ-কোরান-বাইবেলের মত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগুরু বা পুরোহিত শ্রেণী। এই সবকিছু মিলিয়ে, সবকিছুকে সম্পর্কীত করে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট এবং আরও বিভিন্ন ধর্মই তাদের সাংগঠনিক কাঠামো বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। তাই এইসব ধর্মকে সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

'ধর্ম' বলতে 'Religion' বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা না বলে আমরা যদি কোনও কিছুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'Property'কে বোঝাতে চাই, বোঝাতেই পারি ; কোনও অসুবিধে নেই। বরং বলা যায় 'ধর্ম' বলতে আত্মা-পরমাত্মা-পরলোক ইত্যাদি অলীক-বিশ্বাস নির্ভর সাংগঠনিক কাঠামোর চেয়ে, 'ধর্ম' বলতে কোনও কিছুর 'গুণ' বা বৈশিষ্ট্য'-কে চিহ্নিত করাই যুক্তির নিরিখে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক। কারণ, প্রথমটি অলীক-বিশ্বাস নির্ভর ; দ্বিতীয়টি বাস্তব নির্ভর, যুক্তি নির্ভর। এরপর আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি—'ধর্ম' মানে শনি, শীতলার পুজো, দরগার সিরনি বা গীর্জার মোম জ্বালানো নয়। 'ধর্ম' মানে আত্মা-পরমাত্মা-পরলোকের অলীক চিন্তায় নতজানু হওয়া নয়। 'ধর্ম' মানে বেদ-কোরান-বাইবেল-কে অপৌরুষেয় মনে করে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশমত অমানবিক জীবন যাপন নয়। 'ধর্ম' মানে জীবে প্রেম বিলোবার নামে দুর্নীতিগ্রস্ত শোষকের প্রতি প্রেম বিলানো নয়। আগুনের 'ধর্ম' যেমন 'দহন', তলোয়ারের 'ধর্ম' 'তীক্ষ্ণতা', মানুষের 'ধর্ম' তেমনই 'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা', যে মানবতা সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়তে শেখায়, মানুষকে এগিয়ে যেতে শেখায়। এই 'এগিয়ে যাওয়া', এই 'প্রগতি' আজকের অসাম্যের সমাজ কাঠামোর 'প্রগতি' নয়, যেখানে 'মানুষের প্রগতি' বলতে মুষ্টিমেয় মানুষের প্রগতি ও তামাম মানুষের দুর্গতিকে বোঝায়।

○

'ধর্ম' বলতে আত্মা-পরমাত্মা-পরলোক ইত্যাদি অলীক-বিশ্বাস নির্ভর

সাংগঠনিক কাঠামোর চেয়ে, 'ধর্ম' বলতে কোনও কিছুর 'গুণ' বা বৈশিষ্ট্য'-কে চিহ্নিত করাই যুক্তির নিরিখে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক।

○

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ধর্মীয় আচরণবিধি ও মানবতা

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত, ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, তেমনই এও সত্যি— ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক কাঠামো না থাকলে শুধুমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো কখনই গড়ে উঠত না। অর্থাৎ 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' ও 'ঈশ্বর বিশ্বাস' উভয় উভয়ের পরিপূরক। এ যেন দুই টলোমলো মাতালের দু'জনের গায়ে ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বাস্তবিকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম না থাকলে ঈশ্বর-বিশ্বাস টেকে না। ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম দাঁড়াতে পারে না।

মানুষের 'ধর্ম' কখনই অলীক বিশ্বাসের ভিতের উপর গড়ে ওঠা হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্ট ইত্যাদি হতে পারে না। এমন ভ্রান্ত 'ধর্ম'-চিন্তা আরোপিত। অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই আরোপিত। মানুষ ধর্মের নামে কৃত্রিম ভাবে এমন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হতে পারে না। মানুষের একটাই ধর্ম—'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা'। 'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা'র সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের মত অলীক বিশ্বাস একান্তভাবেই সুসম্পর্কহীন। সম্পর্ক যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা সংঘর্ষের। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামের। অলীকের বিরুদ্ধে বাস্তবের সংগ্রামের।

○

মানুষ ধর্মের নামে কৃত্রিম ভাবে এমন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হতে পারে না। মানুষের একটাই ধর্ম—'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা'।

○

হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট বা অন্য যে কোনও ধর্মবিশ্বাসীরাই বিশ্বাস করেন, তাঁদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশিত আচরণবিধি মেনে চলাটাই সৎ জীবন যাপন ও আদর্শ জীবন যাপনের দিশারি। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রগুলোর নির্দেশের বিরোধী কোনও আচরণ কখনই 'সৎ' বা 'আদর্শ' আচরণ বলে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে গণ্য হয় না। যদিও সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নির্দেশের বা বাণীর নতুন নতুন ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে, তবুও এখনও পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রগুলোর মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিরিখে একজন ধার্মিক লোক কখনই শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে ইচ্ছে মত আচরণ করতে পারেন না। ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

অস্ত্রত্যাগকারী অর্জুনকে শাস্ত্রের বিধান মেনে ক্ষত্রিয়ের 'যুদ্ধই ধর্ম' বিবেচনায় অস্ত্র ধারণ করাটাই ইহলোকের কর্তব্য বলে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন—যে শাস্ত্র-বিধান না মেনে ইচ্ছে মত কাজ করে, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ করে না। কোনটা কাজ, কোনটা অকাজ, তা নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র। শাস্ত্রের বিধান জেনে শুধু তা পালনের মধ্যেই তুমি ইহলোকের কাজ করতে পার। [ভগবদ্‌গীতা, ১৬/২৩-২৪]

কোরআন-এর দিকে তাকান, সেখানে বলা হচ্ছে—কোরআন সৎপথের দিশারি। যারা এর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে; তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। [কোরআন ৪৫(১১)]

একইভাবে বৌদ্ধরা 'ত্রিপিটক'-এর বিধানকে সৎপথের দিশারি মনে করেন। খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা 'নিউ টেস্টামেন্ট-এর' নির্দেশিত পথই আদর্শ জীবন যাপনের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করেন। ইহুদিরা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট', 'তালমুদ' ও 'তোরাহ'-এর বিধানগুলোকে সৎপথে চলার নির্দেশ বলে মনে করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি, মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতা—এ'সবের কোনও দাম নেই। ধর্মগ্রন্থগুলো যে ছক তৈরি করে দিয়েছে, সেই ছককেই 'চিরন্তন', 'অপরিবর্তনীয়' আদর্শ বলে ধরে নিতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর নির্দেশিত পথ 'মানবিক' গুণে ভরপুর, এমন একটা বিশ্বাস বহু মানুষের চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আচ্ছন্নতার কারণ—ব্যাপক প্রচার। পত্র-পত্রিকার ছাপার অক্ষরকে, টেলিভিশন ও সিনেমার পর্দাকে বুদ্ধিজীবীদের কথা ও কলমকে বিশ্বাস করে মানুষ ভেবেছে—সব ধর্মই মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বিরোধী।

এই ধরনের প্রচার ও বিশ্বাস কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, আসুন খোলা মনে একটু বিচার করে দেখি। দেখি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বাস্তবিকই সাম্যের সমাজ গড়তে কতটা আন্তরিক। যাঁরা আধুনিক যুগের তালে তাল মেলাতে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বলেন, "'ধর্ম' মানে শনি-শীতলার পুজো, দর্গার সিরনি বা গির্জার মোমবাতি নয়, 'ধর্ম' মানে 'way of life' বা একটি বিশেষ জীবন যাপন পদ্ধতি"—আসুন দেখা যাক; ধর্মীয় বিধান-মাফিক জীবন যাপন পদ্ধতি বা 'way of life' কতটা মানবিক। মানবিক কি না—বিচার-বিশ্লেষণের আগে এটা অবশ্যই আরও একবার পরিষ্কার করে বলে দেওয়া প্রয়োজন, প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই পরমাত্মা বা ঈশ্বর আছেন, আছে ঈশ্বরে পূজার নানা রীতি-নীতি-আচার ইত্যাদি।

এই একই সুরে কথা বলছেন রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মীয় বেত্তারা থেকে মুসলিম ধর্মগুরুরা, বাহাই ধর্মীয় নেতারা, খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকরা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম-গুরুরা পর্যন্ত।

এইসব ধর্মগুলো কতটা মানবিক, কতটা মানবতার মূর্ত প্রতীক, তা জানতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ধর্মের বিধানগুলোর দিকে।

হিন্দু ধর্মীয় বিধানে নারী জন্ম-পরাধীন, চির-পরাধীন। মনুর বিধানে [৯:৩] আছে :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা না স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

অর্থাৎ নারীকে—

পিতা রক্ষা করবে কুমারীকালে, স্বামী রক্ষা করবে যৌবনে।
বার্ধক্যে রক্ষা করবে পুত্ররা, স্ত্রী স্বাধীনতার যোগ্য নয় ॥

হঠাৎ মনুর বিধান টানলাম কেন? মনুর বিধান কি হিন্দু ধর্মীয় বিধান, যেমন মুসলিম ধর্মীয় বিধান কোরান বা হাদিস? এমন প্রশ্নের উত্তরে—হ্যাঁ, তাই। মনু কে? হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন, মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। এই হেতু তিনি ব্রহ্মাপুত্র বলে বিবেচিত হওয়ার পাশাপাশি 'স্বয়ম্ভূ' মনু বলেও পরিচিত। মনুর স্ত্রী শতরূপা, ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। কন্যা—আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। এঁদের ছেলে-মেয়েদের থেকেই নাকি মানুষ বা মানবজাতির বিস্তার। মনুর বংশধর বলেই নাকি এই প্রাণীদের নাম হয়েছিল 'মানুষ' বা 'মানব'।

মনু স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ব্রহ্মার কাছে। এই স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র বা প্রাচীন আইনের বিধান। অর্থাৎ হিন্দু আইনের বিধান ছিল সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারই চিন্তার ফসল।

মনুর বিধানে মানুষ বিভক্ত হয়েছিল সরাসরি দুটি ভাগে—'পুরুষ' ও 'নারী'। পুরুষকে প্রভুর ভূমিকায় এবং নারীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও অধম, ধর্ষিতার চেয়েও অত্যাচারিতা এবং গৃহপালিত পশুর চেয়েও হীন ভূমিকায় নামিয়ে এনেছিল মনুর আইন অর্থাৎ হিন্দু ধর্মীয় আইন।

মনুর বিধানে মানুষ বিভক্ত হয়েছিল সরাসরি দুটি ভাগে—'পুরুষ' ও 'নারী'। পুরুষকে প্রভুর ভূমিকায় এবং নারীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও অধম, ধর্ষিতার চেয়েও অত্যাচারিতা এবং গৃহপালিত পশুর চেয়েও হীন ভূমিকায় নামিয়ে এনেছিল মনুর আইন অর্থাৎ হিন্দু ধর্মীয় আইন।

মনুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো একইভাবে নারীকে চূড়ান্তভাবে শোষণ করতে নানা উপদেশ প্রয়োগ করেছে, নানা নীতিকথার নামে দুর্নীতি ছড়াতে চেয়েছে।

শিক্ষা আনে চেতনার মুক্তি, যা দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে

বিবেচনায় মনুষ্যত্বের ও মানুষের চরম শত্রু মনু বিধান দিলেন তাঁর বিখ্যাত মনুসংহিতায় [২ঃ৬৭]ঃ

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোহাগ্নি পরিক্রিয়া॥

অর্থাৎ ঃ
বিয়েই নারীর বৈদিক উপনয়ন।
পতিসেবাই গুরুগৃহবাস, গৃহকর্মই হোমস্বরূপ অগ্নিপরিচর্যা॥

বিধানের এখানেই শেষ নয়। মনু আরও বলেছেন [৫ঃ১৫৪], পতি সদাচারহীন, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কযুক্ত বা গুণহীন হলেও সতী স্ত্রী সেই পতিকে দেবতার মতই পুজো করবে।

তাহলে হিন্দু নারীর বিনোদন কি শুধুই নানা ব্রতপালন ও উপবাস ঘিরেই আবর্তিত হবে?

না, ব্রতপালন, উপবাসের স্বাধীনতা নারীকে দেননি মনু। তাঁর বিধানে আছে [৫ঃ১৫৫]ঃ স্ত্রী'র স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, পতির অনুমতি ছাড়া ব্রত বা উপবাস নেই। নারী স্বর্গে যেতে পারে কেবলমাত্র স্বামী-সেবার সাহায্যেই।

হিন্দু সমাজে পুরুষরা এভাবে নিজেদের লাম্পট্য, অসদাচরণ ও অত্যাচারকে নারীদের কাছে শুধুমাত্র প্রতিবাদহীনভাবে গ্রহণীয় করেনি, নিজেদের দেবতার আসনে বসিয়েছে ধর্মের বিধান খাড়া করে।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিধানে পদে পদে পুরুষের লাম্পট্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পুরুষের লাম্পট্যকে নীতিগতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় [৬/৬/৮৫] বলা হয়েছে, "যজমান, দীক্ষার দিনে গণিকাসাহচর্য বর্জন করবেন, তার পরদিন পরস্ত্রীর সাহচর্য এবং তৃতীয় দিন নিজ স্ত্রীর সাহচর্য বর্জন করবেন।" অর্থাৎ দীক্ষার দিনেও পরস্ত্রীর সাহচর্য বৈধ ছিল। দীক্ষার দিন ছাড়া অন্যান্য দিন গণিকা গমনও বৈধতার ছাড়পত্র পেয়েছিল এবং গণিকাগমন পুরুষের কাছে কখনই দোষনীয় বা লজ্জার বলে চিহ্নিত হয়নি। বরং চিহ্নিত হয়েছিল পৌরুষের প্রতীক হিসেবেই।

মনুসংহিতায়, অর্থাৎ মনুর বিধানে [৯ঃ৪] বলা হয়েছে, নিঃসন্তান স্ত্রীকে বিয়ের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাকে ত্যাগ করা যায় বারো বছর পরে, মৃত সন্তানের জন্মদানকারী স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় পনের বছর পরে।

সন্তানের জন্ম দেওয়ার অক্ষমতার কারণে স্বামীকে কিন্তু ত্যাগ করার কোনও বিধান নেই হিন্দু শাস্ত্রে।

মনু [৯ঃ৪] ঝগড়ুটে স্ত্রীকে তক্ষুনি ত্যাগ করার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু ঝগড়ুটে শুধু নয়, অত্যাচারী স্বামীকেও দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে বলেছেন

এই মনু নামক অমানুষ এক পুরুষ। মানুষের শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু এই মনুকে দেবত্ব আরোপ করেছে হিন্দু পুরুষ সমাজ। মনুকে ব্রহ্মার অংশ হিসেবে চিত্রিত করে মনুর বিধানকেই আইনের বিধান বলে মেনে নেবার কথা বলেছেন হিন্দু শাস্ত্রকার, যাঁরাও মানুষ ছিলেন না অবশ্যই, যাঁরা ছিলেন পুরুষ শ্রেণীর প্রতিনিধি, যাদের হাতে ধর্মের আর এক নাম কখনই মনুষ্যত্ব হয়ে ওঠেনি, বরং যাঁদের হাতে মনুষ্যত্ব হয়েছে খণ্ডিত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিত। শত-সহস্র বছর পরে যখন ধর্মের নামে অধর্মের দিন শেষ হয়ে, মানুষের ধর্ম শুধু 'মনুষ্যত্ব' হওয়ার কথা, আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবী জুড়ে ভোগবাদী তীব্র ক্ষুধা জাগিয়ে তোলার চেষ্টার পাশাপাশি ভাববাদী চিন্তাও মনুষ্যত্বের ধর্ষক ধর্মচিন্তাকে জনপ্রিয় করে তোলার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চলছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায়।

বৃহত্তর ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম এসেছে সবচেয়ে পরে, অর্থাৎ আধুনিকতম। ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছিল কিছু অধিকার যা হিন্দু, খ্রিস্ট বা ইহুদি ধর্ম দেয়নি। তারপর শত শত বসন্ত এসেছে, বিদায় নিয়েছে। ইসলামি পুরুষতন্ত্রের ফাঁস আলগা না হয়ে আরও বেশি করে চেপে বসেছে। নারী আরও বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছে। ইসলামি সমাজের বিবর্তনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রগতির পরিবর্তে সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আবর্তে।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরআন-এ আছে [সূরা নিসা ঃ৩৪], "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন...স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।"

কেন প্রহার ? স্ত্রী কি পুরুষের ক্রীতদাসী ? নারী পুরুষকে সমান চোখে দেখে কোরআন নারীকে এক সঙ্গে চারটি পতি গ্রহণের অনুমোদন দিতে পারেনি। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে কোরআন বলছে [সূরা নিসা ঃ ৩], "বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার।"

ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মানুষ হিসেবে নয়। তারই পথ নির্দেশ রয়েছে কোরআন-এ। সেখানে বলা হচ্ছে [সূরা বাকারা ঃ ২২৩] "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র : তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পার।"

ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মানুষ হিসেবে নয়। তারই পথ নির্দেশ রয়েছে কোরআন-এ। সেখানে বলা হচ্ছে [সূরা বাকারা ঃ২২৩] "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র ; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পার।"

মুসলিম শরীয়াত আইনে নারীকে কিছু আর্থিক ও সম্পত্তির অধিকার দিয়ে কেড়ে নিয়েছে নারীর মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার। মুসলমান স্বামী চারটি স্ত্রীর উপর যখন তখন যৌন অধিকার ফলাতে পারে, যার আর এক নাম অবশ্যই ধর্ষণ। মানবিকতার উপর ধর্ষণ। মুসলমান স্বামীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও স্ত্রীকে শুধু তিনবার 'তালাক' নামক শব্দটি উচ্চারণ করে তাড়িয়ে দেবার। না, শত অত্যাচারের পরও স্ত্রীর কোনও অধিকার নেই অত্যাচারী স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার, তাকে 'তালাক' দেওয়ার। মুসলমান স্বামী এক সঙ্গে চার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার অধিকারী। তাই পুরনো এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী ঘরে এনে আইনি লাম্পট্য চালাতেই পারে। এমন তালাকের সুযোগে পুরুষ সম্ভোগ করতে পারে বহু নারী। এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার পুরুষ সুলভ অধিকার যে ধর্ম দেয় সে ধর্ম অবশ্যই সুন্দর পৃথিবী গড়ার ধর্ম হতে পারে না।

ধর্মের সূত্র ধরে মরক্কোর সংবিধানে স্ত্রীকে স্বামীর আইনি ক্রীতদাসী করা হয়েছে। ও দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে—স্ত্রী বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকবে স্বামীর কাছে, স্বামীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের সম্মান করবে। স্ত্রী যদি তার মা-বাবাকেও দেখতে চায়, স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। ['The Sisterhood of Man' by Newland Kathleen : W. W. Norton & Co., New York : 1979, Page-24]

ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তি। বিয়েতে নারীর সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই সূত্র ধরে ইসলাম ধর্মে শ্রদ্ধাবান বহু মানুষকে বলতে শুনেছি—ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছি কিছু অধিকার যা অন্য ধর্ম দেয়নি।

এ-কিন্তু বাস্তব সত্য নয়। ইসলামে বিয়েতে পাত্র-পাত্রী যে চুক্তিতে আসে, তা পাত্র-পাত্রী ঠিক করে না। চুক্তি সম্পাদন করে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গে একজন গোলামের চুক্তি ভিন্ন যে কিছুই নয়, তা মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসনে নারীদের অবস্থান নিয়ে সামান্য যে আলোচনা করেছি তাতেই যথেষ্টর বেশিই বোঝা গেছে। বিয়েতে নারীর সম্মতির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে এই সম্মতি একটি নিয়মরক্ষা বা অভিনয় বই কিছুই নয়। অভিভাবকরা বিয়ে ঠিক করে ফেলার পর আমন্ত্রিতদের সামনে পাত্রীর সম্মতি, একটি আচারের চেয়ে বাড়তি গুরুত্ব পায়নি।

ইসলামে বিয়েতে পাত্র-পাত্রী যে চুক্তিতে আসে, তা পাত্র-পাত্রী ঠিক করে না। চুক্তি সম্পাদন করে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গে একজন গোলামের চুক্তি ভিন্ন যে কিছুই নয়।

এমন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যের ধনীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তালাক দেওয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে। তালাক দিয়ে নিত্য নতুন মনপসন্দ নারীদের চুক্তি করে বিয়ে করেই চলে ধনী লম্পটরা। তারা যে স্ত্রীকে বন্ধুর পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য বা রক্ষিতা বই কিছু মনে করে না, এ কঠোর বাস্তব। ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা যে কোনও সময় বাতিল হতে পারে। তবে বাতিল করার একমাত্র অধিকার রয়েছে পুরুষের ; নারীর নয়।

আরব অঞ্চলে 'ইদ্দা' নামে একটি ধর্মীয় বিধান রয়েছে। এই বিধান মতো স্বামী তিন মাসের জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং তিন মাস পরে আবার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে। এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্বামী কোনও নারীকে স্ত্রী করে তার চার স্ত্রী রাখার ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখতে পারে। আরবের অনেক পুরুষ 'ইদ্দা' বিধান মত চার স্ত্রীকেই মাঝে মাঝে তিন মাসের জন্য বিদায় দিয়ে নতুন চার স্ত্রীকে নিয়ে যৌন উত্তেজনা উপভোগ করে।

মুসলমান পুরুষ যে কোনও ধর্মের নারীকেই বিয়ে করার অধিকারী। কিন্তু মুসলমান নারী বিধর্মীকে বিয়ে করার অধিকারী নয়। সত্যিই কি বিচিত্র সাম্য ! যে ধর্ম মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সে ধর্ম কখনই মানুষের ধর্ম হতে পারে না। প্রতিটি অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাস নির্ভর ধর্ম নিয়ে সামান্য পড়াশুনো করলেই দেখতে পাবেন এরা কী প্রচণ্ড রকমের মানবিকতার শত্রু। এরা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে ঘৃণা।

খৃস্ট ও ইহুদি ধর্ম একইভাবে নারীকে শয়তানের আসনে বসিয়েছে। আর তাই শোষক শ্রেণীর কাছে 'ধর্ম' আজ এক শক্তিশালী অস্ত্র, যার সাহায্যে শোষিতদের ভেঙে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায় পরম নিশ্চিন্তে, অবহেলে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে।

মুসলিম দুনিয়ার বহু দেশেই 'নারী-খৎনা' নামের এক বীভৎস, বর্বোরোচিত ধর্মীয় প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই প্রথা মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বই কিছু নয়। এই প্রথা পুরুষকে মানুষ থেকে শয়তানে পরিণত করেছে। আর নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে।

খৎনা প্রথা আজও প্রচলিত আছে ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, নাইজিরিয়া, মিশর, সুদানসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। এইসব দেশে নারীদের যৌন কামনাকে অবদমিত করে যৌন-আবেগহীন যৌন-যন্ত্র করে রাখতে পুরুষশাসিত সমাজ বালিকাদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে। নারীর যৌন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যোনির প্রবেশ মুখে পাপড়ির মতো বিকশিত ভগাঙ্কুর। নারীদের খৎনা করা হয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সাধারণভাবে সাত-আট বছর বয়সে। খৎনা যারা করে তাদের বলা হয় 'হাজামী'। দু'জন নারী শক্ত করে টেনে ধরে বালিকার দুই উরু। দুই নারী চেপে ধরে বালিকার দুই হাত। 'হাজামী' ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে ভগাঙ্কুর। এই সময় উপস্থিত নারীরা

সুর করে গাইতে থাকেন, "আল্লা মহান, মহম্মদ তার নবী ; আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে"।

পুরুষ শাসিত সমাজ ওইসব অঞ্চলের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছে, কাম নারীদের পাপ, পুরুষদের পুণ্য। খৎনার পর সেলাই করে দেওয়া হয় ঋতুস্রাবের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে যোনিমুখ। খোলা থাকে মূত্রমুখ। খৎনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বালিকার দুই উরুকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হয়, যাতে যোনি মুখ ভালমতো জুড়ে যেতে পারে। বিয়ের পর সেলাই কেটে যোনিমুখ ফাঁক করা হয়, স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্য। আবারও বলি, স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্যই ; কারণ নারীর কাম তো ওরা পাপ বলে চিহ্নিত করে নারীকে করতে চেয়েছে কাম-গন্ধহীন যৌন-যন্ত্র। সন্তান প্রসবের সময় সেলাই আরও কাটা হয়। প্রসব শেষে আবার সেলাই। তালাক পেলে বা বিধবা হলে আবার নতুন করে সেলাই পড়ে ঋতুস্রাবের সামান্য ফাঁক রেখে। আবার বিয়ে, আবার কেটে ফাঁক করা হয় যোনি। জন্তুর চেয়েও অবহেলা ও লাঞ্ছনা মানুষকে যে বিধান দেয়, সে বিধান কখনই মানুষের বিধান হতে পারে না। এ তো শুধু নারীর অপমান নয়, এ মনুষ্যত্বের অবমাননা।

ইসলামের বেহেশত শুঁড়িখানা আর বেশ্যাপল্লী বই কিছুই নয়। এখানে যৌন-সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার অধিকারী পুরুষ। বেহেশতের হুরেরা সৌন্দর্যে সূর্য, চন্দ্রকেও মলিন করে। পুরুষদের জন্য বেহেশতের সুখ বিষয়ে কোরআন বলছে, "ওদের সঙ্গিনী দেব আয়তনয়না হুর।" [সূরা দুখান ঃ ৫৪] "সাবধানীদের জন্যে রয়েছে সাফল্য ঃ উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।" [সূরা নাবা ঃ ৩১ঃ৩৪] এই আয়তনয়না অসামান্য সুন্দরী হুরদের সঙ্গে বেহেশতে আসা পৃথিবীর পুরুষদের মিলন ঘটাবার লোভ দেখানো হয়েছে [সূরা তূর ঃ ২০] কোরআনে। এইসব স্বর্গসুন্দরীরা যে হবে অনাঘ্রাত ফুল এবং বেহেশতে আসা পুরুষরাই তাদের জীবনের প্রথম পুরুষ, সে নিশ্চিন্ততার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে কোরআনে [সূরা রহমান ঃ ৫৬]।

ইসলামের বেহেশত শুঁড়িখানা আর বেশ্যাপল্লী বই কিছুই নয়। এখানে যৌন-সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার অধিকারী পুরুষ।

কল্পিত স্বর্গ বেহেশতে নারীদের কোনও স্থান হয়নি। বরং মুসলিম নীতি নির্দেশক গ্রন্থ হাদিসে বলা হয়েছে, "নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়।"

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোও একইভাবে নারীকে শয়তান রূপেই চিহ্নিত করেছে। মহাভারত অনুশাসনপর্ব ঃ ৩৮-এ বলা হয়েছে—তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু

মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান সমান হবে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোও একইভাবে নারীকে শয়তান রূপেই চিহ্নিত করেছে। মহাভারত অনুশাসনপর্ব ঃ ৩৮-এ বলা হয়েছে—তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান সমান হবে।

দেবীভাগবত-এ দেখুন [৯ঃ১], সেখানে বলা হয়েছে, নারীরা জোঁকের মত সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মূর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে।

মনুসংহিতায় [৯ঃ১৫] নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে—পুরুষ দেখামাত্রই তারা মেতে ওঠে বলে তারা চঞ্চলচিত্ত ও স্নেহশূন্য ; তাই সুরক্ষিত রাখা হলেও তারা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

নারীকে বশে রাখতে প্রয়োজন স্নেহ-প্রেম ভালবাসা নয়, প্রয়োজন নির্দয় প্রহার—এ কথা হিন্দু শাস্ত্রবাক্যে উচ্চারিত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে [১ঃ৯ঃ২ঃ১৪] বলা হয়েছে, "লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপরে আর কোনও অধিকার না থাকে।"

মনু মনে করতেন, নারী নির্গুণ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "নদী যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলনে নোনা হয়, নারীও তেমন ; যেমন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়, তেমন পুরুষের গুণযুক্ত হয়।" [৯ঃ২২ মনুসংহিতা] .

একমাত্র হিন্দু ধর্মীয় বিধানে নারীর অবিবাহিত থাকা নিষিদ্ধ। বিয়ে ছাড়া নারীর মুক্তি নেই। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে আছে ঋষি কুণির কন্যা সারাজীবন ধর্মপথে থেকে মৃত্যুশয্যায় জানতে পারলেন, চূড়ান্ত ধর্মপালনও একজন নারীর স্বর্গলাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তাকে বিয়ে করতেই হবে। পুরুষদের কিন্তু স্বর্গে যেতে 'চিরকুমার' থাকা কোনও বাধা নয়।

হিন্দু ধর্মের বিধানে পুরুষতন্ত্র বিধবা নারীকে যেভাবে গ্রাস করতে উদ্যত, তেমনটি পৃথিবীর আর কোনও প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে দেখা যায় না। মনুসংহিতা নির্দেশ দিচ্ছে [৫ঃ১৫৭] ঃ "পতির মৃত্যুর পর পত্নী ফলমূলের স্বল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষয় করবে, তবু পর পুরুষের নাম করবে না।" পত্নীর মৃত্যুর পর পতি কী করবে, তারও নির্দেশ আছে মনুর বিধানে। মনুসংহিতা বলছে [৫ঃ১৬৮]ঃ "পত্নীর মৃত্যু হলে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে পুরুষ আবার বিয়ে করবে।"

আমাদের দেশের মানুষদের প্রধান ধর্ম ইসলাম ও হিন্দু বলে এই দু'টি ধর্ম নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। অন্য প্রধান ধর্মগুলোতেও একইভাবে পুরুষ দ্বারা নারীকে অবদমিত রাখার ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবেই উপস্থিত।

ভারতে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিল মনুর দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন। মনু সংহিতা'য় মনু বললেন ঃ

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ [১ঃ৩১]

অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষদের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণ সৃষ্টি করলেন।

ব্রাহ্মণদের কাজ তথা ধর্ম হল—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টি, [১ ঃ৮৮]

ক্ষত্রিয়দের কাজ তথা ধর্ম—প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগাসক্তি নিয়ন্ত্রণ। [১ ঃ ৮৯]

বৈশ্যদের ধর্ম—পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ধনবৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ ও কৃষিকার্য পরিচালন। [১ ঃ ৯০]

শূদ্রদের কাজ বা ধর্ম—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ [১ ঃ ৯১]

অর্থাৎ, ক্ষুণ্ণ না হয়ে, প্রসন্নমনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্তব্য, এই নির্দেশ ব্রহ্মা দিলেন।

'শূদ্র' নামের এই দাসদের পারিশ্রমিক বা বেতন দিতে হত না। দেবার প্রশ্নই নেই। মনু বলেছেন—দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্য বিধাতা শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন—"দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা" [৮ঃ৪১৩]। কিন্তু দাসদের বাঁচিয়ে তো রাখতে হবে, বেগার খাটাবার জন্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিল্প ও কৃষির দ্বারা নিজেদের ভোগকে চরিতার্থ করার জন্য এইসব শিল্প দাস ও কৃষিদাসদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেইজন্য মনু বিধান দিয়েছেন—শূদ্রভৃত্যকে উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন, জীর্ণ শয্যা বা ঘর দান করিবে [১০ঃ১২৫]।

মনু বলেছেন—দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্য বিধাতা শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন—"দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা" [৮ঃ৪১৩]। কিন্তু দাসদের বাঁচিয়ে তো রাখতে হবে, বেগার খাটাবার জন্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিল্প ও কৃষির দ্বারা নিজেদের ভোগকে চরিতার্থ করার জন্য এইসব শিল্প দাস ও কৃষিদাসদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সেইজন্য মনু বিধান দিয়েছেন—শূদ্রভৃত্যকে উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন, জীর্ণ শয্যা বা ঘর দান করিবে [১০ ঃ১২৫]।

প্রায় বিনাখরচে শ্রমশক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনেই উচ্চবিত্তেরা সৃষ্টি করেছিল 'শূদ্র' নামের বর্ণটি। আর সেই সৃষ্টির কাজে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল 'ঈশ্বর-নির্ভর ধর্ম'। ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নির্দেশের নামে সেদিন শূদ্রদের 'মানুষ' বলে বিবেচিত হওয়ার সব অধিকারই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

শূদ্রদের ধন উপার্জনের অধিকার ছিল, কিন্তু সেই ধন ভোগের কোনও অধিকার ছিল না। সব উপার্জিত ধনই দাস-মালিক গ্রহণ করবে, এই ছিল মনুর বিধান—'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ। [৮ ঃ ৪১৬ এবং ৪১৭]

শূদ্রদের আর তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে যাতে চেনা যায়, এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে তিন বর্ণের মানুষদের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম, তিন বর্ণের মানুষদের থেকে তারা ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব—সে জন্যে শূদ্রদের প্রতি মাসে কেশ মুন্ডনের নির্দেশ দিয়েছেন মনু। [৫ঃ১৪০]

ঈশ্বর-নির্দেশে শূদ্রের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় অধিকার, না অর্থনৈতিক অধিকার।

এই স্বল্প পরিসরের আলোচনার মধ্যে দিয়েও আমাদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি, এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্ম তৈরি করেছিল হুজুর ও মজুর শ্রেণী বিভাজন। তৈরি করেছিল নারী-পুরুষে বিভাজন। প্রতিষ্ঠা করেছিল শোষণের। প্রতিষ্ঠা করেছিল পুরুষতন্ত্রের।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্ম তৈরি করেছিল হুজুর ও মজুর শ্রেণী বিভাজন। তৈরি করেছিল নারী-পুরুষে বিভাজন। প্রতিষ্ঠা করেছিল শোষণের। প্রতিষ্ঠা করেছিল পুরুষতন্ত্রের।

হ্যাঁ, আবারও বলি, শোষণের জন্যেই সে সময় রাজশক্তি বা ক্ষত্রিয়দের শক্তির সঙ্গে ধর্মগুরু বা ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি যুক্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা, ধর্মগুরুরা এই অশুভ আঁতাত, শোষণের আঁতাত টিকিয়ে রাখতেই প্রচার করেছিল—ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। মানুষে মানুষে এই বিভাজন ঈশ্বর নির্দেশিত।

এই অশুভ আঁতাতের কথা আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। মনুর শ্লোকেই এর হদিস পাবেন। মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩২২ নম্বর শ্লোকে মনু বলেছেন—

না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না ; ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না ; ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ মিলিত হলে উভয়েরই শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণের মিলন নিজ নিজ ধর্মের স্বার্থেই অতি প্রয়োজনীয় বলে যে নির্দেশ প্রাচীনকালে মনু দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশকে আজও মান্য করেই চলেছে চলমান ধর্ম ও রাজনীতির অশুভ আঁতাত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণের মিলন নিজ নিজ ধর্মের স্বার্থেই অতি প্রয়োজনীয় বলে যে নির্দেশ প্রাচীনকালে মনু দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশকে আজও মান্য করেই চলেছে চলমান ধর্ম ও রাজনীতির অশুভ আঁতাত।

ধর্মকে মানবিক বলে লাগাতার প্রচারের যে চেষ্টা বর্তমানে ব্যাপকতা পেয়েছে, তা শোষণের রাজনীতিকে পালন ও পুষ্ট করার স্বার্থে একান্তভাবেই অন্তঃসারশূন্য প্রচার মাত্র, মিথ্যা প্রচার মাত্র।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম না থাকলে কি সমাজ উচ্ছন্নে যাবে ?

ধর্মের মূলগত অনুশাসনগুলোই যেখানে শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার সহায়ক, মানুষের দ্বারা মানুষকে অবদমিত করে রাখার সহায়ক, সেখানে এই আচরণবিধিগুলোর অনুসরণ কোনওভাবেই আদর্শ জীবনের সহায়ক হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মনির্দেশিত এই 'way of life' কোনও ভাবেই মানুষ হয়ে ওঠার দিশারি হতে পারে না।

এরপরও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বহু মানুষ বলবেন—ধর্ম না থাকলে মানুষ নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে সমাজকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবে। এই ধরনের বক্তব্য বেশ কয়েকটি কারণে একান্তভাবেই অন্তঃসারশূন্য।

দেশের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় আইন সৃষ্টি ও তার প্রয়োগ দ্বারা। শাস্ত্রের বিধান দ্বারা নয়।

কারণ ঃ এক—দেশের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় আইন সৃষ্টি ও তার প্রয়োগ দ্বারা। শাস্ত্রের বিধান দ্বারা নয়। 'গণতান্ত্রিক দেশ' বলে পরিচিত দেশগুলো বাস্তবে জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ধনকুবের গোষ্ঠীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়!

দেশের আর্থসামাজিক-সমাজসাংস্কৃতিক-আইন-এর নিয়ন্তক শক্তি দেশের ধনিককুল। এই সব তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণভাবে যেটুকু শৃঙ্খলা দেখতে পাই, তা ধর্মীয় নীতির চেয়ে বেশি মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আইন ও তার প্রয়োগের কারণে। ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোর দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাব, এ'সব দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর যেমন রমরমা, তেমনই খোলা-মেলা রমরমা দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের। যে সব দেশের শাসক গোষ্ঠী ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে, সে'সব দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন—প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধ্বজা যেমন আকাশচুম্বি, তেমনই সমুদ্র-গভীর সে'সব দেশের স্বৈরতন্ত্র, শোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি কদাচার।

যে সব দেশের শাসক গোষ্ঠী ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে, সে'সব দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন—প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধ্বজা যেমন আকাশচুম্বি, তেমনই সমুদ্র-গভীর সে'সব দেশের স্বৈরতন্ত্র, শোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি কদাচার।

বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝতে একটি উদাহরণ টেনে আনা যাক।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তান। ১৯৯২ সাল থেকে সে দেশে ক্ষমতা দখল করে রয়েছে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত মুজাহেদিনদের বিভিন্ন গোষ্ঠী। আফগানিস্তানে বর্তমানে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। লুঠ, নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী মুজাহেদিনদের নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে বাঁচতে প্রতিদিনই বহু আফগান পরিবার দেশান্তরী হয়েই চলেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস আফগান মুজাহেদিনদের মধ্যে কোনও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করতে পারেনি।

ঠিক এর কয়েক বছর আগের আফগানিস্তানের ইতিহাস কী বলে? সেই সময়গুলোতে, অর্থাৎ সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সরকারের আমলে, 'পাপ করলে নরকবাস'—এ বিশ্বাস না করা সরকারের আমলে কি আফগানিস্তানে এর চেয়েও বেশি রকম জঙ্গলের রাজত্ব ছিল?

না, ছিল না। অতি স্পষ্ট করে এবং সোচ্চারেই আমরা বলতে পারি—সেই সময় ওই দেশে প্রথম দেখা দিয়েছিল নারী প্রগতি। নারীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বেড়েছিল। নারীরা চার-দেওয়াল ও বোরখার অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। নারীরাও মানুষ হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়েছিল। তারই ফলে মুজাহেদিনদের আক্রমণ থেকে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সরকারকে রক্ষা করার জন্য আফগান নারীরা এক দিকে নিজেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, আর এক দিকে জীবনসঙ্গী, ভ্রাতা ও পুত্রদের প্ররোচিত করেছিল।

আমার এই কথাগুলো লেখার উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সরকার বা মুজাহেদিনদের সমর্থন বা অসমর্থন নয়। আমি আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সমাজ-চিত্র তুলে ধরে এটুকুই প্রমাণ করতে চাইছি, 'ধর্ম বিশ্বাস'-এর উপর একটি সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধের উন্নতি নির্ভর করে না।

কারণ ঃ দুই—প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কালের ধর্মগুরু, ধর্মযাজক, পীর-মোল্লাদের ইতিহাসের দিকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা ফিরে তাকান। স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকান। দেখতে পাবেন, এইসব নীতিজ্ঞানী ধর্মীয়বেত্তাদের জীবনে সদাচারের বদলে বার বার জড়িয়ে গেছে ঐশ্বর্যলিপ্সা, বিলাসিতা, ক্ষমতালিপ্সা, দুর্নীতি, ব্যভিচার, বিকৃত-কামনা, ভ্রান্ত-চিন্তা, মিথ্যাচারিতা ইত্যাদি নানা কদাচার। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেখানে ধর্মগুরুদের কদাচারেই লাগাম লাগাতে পারেনি, সেখানে সাধারণ মানুষদের সদাচার শেখাবে কীভাবে ?

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেখানে ধর্মগুরুদের কদাচারেই লাগাম লাগাতে পারেনি, সেখানে সাধারণ মানুষদের সদাচার শেখাবে কীভাবে ?

কারণ ঃ তিন—১৯৮৮ সালে আমাদের দেশের ১০০ জন অপরাধীর উপর একটি 'সার্ভে' বা 'তথ্যানুসন্ধান'-এর কাজ চালিয়েছিল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের এ'জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ১০০ জন অপরাধিদের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাসকে যুক্ত করে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই আত্মা, পরমাত্মা, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আরোপিত বিশ্বাসে পুরোপুরি আস্থাশীল ছিল। এই প্রসঙ্গ নিয়ে 'কারণঃ আটত্রিশ'-এ আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর উপদেশ-ভয়-অলীক বিশ্বাস এইসব অপরাধীদের অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

এই আলোচনার পর একথা বলার আর সুযোগ নেই—'ধর্মগ্রন্থের নির্দেশিত আচরণবিধি কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলাই সদাচার', 'ধর্মের বিধান থেকে গড়ে ওঠা way of life-ই আদর্শ জীবনদিশা', 'পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত করে'।

কারণ ঃ বিয়াল্লিশ

পৃথিবী 'পাপে'-অন্যায়ে-দুর্নীতি'তে ভরে গেলে ঈশ্বর কি অবতার হয়ে পৃথিবীতে এসে সমাজ'কে 'পাপ' মুক্ত করবে ? এই কি সমাজ পাল্টাবার অনিবার্য উপায় ?

পুরানের আমল ছেড়ে ইতিহাসের আমলে পা রাখা থেকে আজ পর্যন্ত যে ইতিহাস

রচিত হয়েছে তাতে অনেক অত্যাচার, অনেক দুর্নীতি, অনেক সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, অনেক স্বৈরাচারী শাসক, অনেক রক্তপাত, অনেক হত্যা বহমান। তা'সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত পৃথিবীকে এইসব 'পাপ' থেকে মুক্ত করতে অবতারের ভূমিকা।

সমাজ সচেতনতার সঙ্গে ইতিহাসে চোখ রাখলে বরং এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অবতার-পয়গম্বররা শাসক ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছে। অসাম্য-অবিচার-দুর্নীতি-শোষণের সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে চলেছে।

একবার ভাবুন তো, শোষিত মানুষ অসাম্য, শোষণ ও দুর্নীতির সমাজ পাল্টাবার দায়-দায়িত্ব ঈশ্বর-অবতারদের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কী হবে ? শোষিত মানুষের অলীক চিন্তার সুযোগ নিয়ে অসাম্য, শোষণ ও দুর্নীতির সমাজ কাঠামো নিরুপদ্রবে তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে।

ইতিহাস এ'কথাই বলে, যে সব দেশের মানুষ সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সমাজকে পাল্টে দিয়েছিল (হতে পারে এই পাল্টানো ছিল সাময়িক। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবনে নেতৃত্বের অক্ষমতার দরুন সাম্য-চিন্তা স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া ধাক্কা খেয়েছিল, ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ক্ষমতালোভী ঘুণ পোকাদের অবাধ দংশনে), সে'সব দেশের মানুষ ঈশ্বর ও অবতারদের হাতে সমাজ পাল্টাবার ভার স'পে না দিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল বলেই সাফল্য পেয়েছিল।

শোষিত মানুষ অসাম্য, শোষণ ও দুর্নীতির সমাজ পাল্টাবার দায়-দায়িত্ব ঈশ্বর-অবতারদের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কী হবে ? শোষিত মানুষের অলীক চিন্তার সুযোগ নিয়ে অসাম্য, শোষণ ও দুর্নীতির সমাজ কাঠামো নিরুপদ্রবে তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে।

চূড়ান্ত সাফল্য পেতে, শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়তে, নিপীড়িত মানুষকেই নামতে হবে সংঘর্ষে ও নির্মাণে। ঈশ্বর-অবতার-পয়গম্বরদের উপর নির্ভরশীলতাকে বিসর্জন দিয়েই নামতে হবে জয়কে ছিনিয়ে নিতে।

শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়তে, নিপীড়িত মানুষকেই নামতে হবে সংঘর্ষে ও নির্মাণে। ঈশ্বর-অবতার-পয়গম্বরদের উপর নির্ভরশীলতাকে বিসর্জন দিয়েই নামতে হবে জয়কে ছিনিয়ে নিতে।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

ঈশ্বর বিশ্বাস : আপ্লুত বিজ্ঞানী ও মৌলবাদী চক্রান্ত

হিন্দু-বিজ্ঞানী ও মৌলবাদী চক্রান্ত

'দেশ' পাক্ষিক পত্রিকার ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যার ৪৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছিঃ

"বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়ে থাকে, তার নাম মানুষমুখী নীতি (Anthropic Principle)। এতে দেখান হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বিভিন্ন সময়ে বহু সম্ভাবনার মধ্যে একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এভাবে বহু সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা বাস্তবায়িত হয়েছে, ফলে মানুষ পর্যন্ত এসেছে। যদি একবারও এর ব্যতিক্রম হত, তবে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হত না।"..."অর্থাৎ প্রথম থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানুষমুখী। ক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে কর্তার মনে, কাজেই এই উদ্দেশ্যটা ভগবানেরই ছিল। এই নীতি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের teleological principle-এর একটা বৈজ্ঞানিক রূপ।"

প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বিজ্ঞান ও ভগবান', লেখক ঃ হৃষীকেশ সেন।

বাস্তবিকই কিছু কিছু বিজ্ঞান পেশার মানুষ বিজ্ঞান-মনস্কতাকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের বিশ্বাস-নির্ভর চিন্তাকে হাজির করতে শুরু করেছেন নতুন ভাবে, নতুন মোড়কে, বিজ্ঞানের শব্দ যুক্ত করে, বিজ্ঞানের এসেন্স মাখিয়ে। তাঁরা ভুলে যান বা ভুলে থাকতে চান—বিজ্ঞানের বেঁচে থাকার 'অক্সিজেন', 'জিজ্ঞাসা', 'সন্দেহ' ও 'প্রমাণ'। বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে, কার্যকারণের

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও প্রকৃতির জগতে, বস্তুজগতে নিয়মের বন্ধন। এ'সবের অনুপস্থিতিতে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান থাকে না। বিজ্ঞানীরা কেন এমন বিজ্ঞান-বিরোধী, স্ববিরোধী, কেবলমাত্র বদ্ধমূল ধারণার উপর গড়ে ওঠা, চিন্তা এবং যুক্তিহীন অবিন্যস্ত বিচিত্র সব চিন্তা প্রকাশ করেন? কারণ দু'টি হতে পারে। **এক:** পরিবেশগতভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য। **দুই:** অসাম্যের সমাজ কাঠামো বজায় রাখার নিয়ন্ত্রক শক্তির কাছ থেকে আখের গোছাতে। সাধারণভাবে দেখা যায়, এই ধরনের বিজ্ঞান-বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি কারণই উপস্থিত থাকে। তবে হতে পারে, সেই উপস্থিতি কখনও কখনও অসচেতনতা থেকে আসে।

যাই হোক, এই ধরনের বক্তব্যের উত্তরে রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার কী বলেন, শুনি আসুন।

রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োফিজিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক।

রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের কথায়, "*ল অফ প্রোব্যাবিলিটি বলে একটা কথা আছে। প্রোব্যাবিলিটি মানে সম্ভাবনা। গণিতে সম্ভাব্যতা-সম্ভাবনার পরিমাপকে বলে প্রোব্যাবিলিটি। অর্থাৎ সম্ভাবতা ও মোট সম্ভাবনার যে অনুপাত তা-ই প্রোব্যাবিলিটি। তারও একটা নিয়ম আছে। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো ঘটনা ঘটলেও নিয়মের বাইরে ঘটে না, ঐ প্রোব্যালিটির নিয়মের মধ্যে থেকেই ঘটে। এ জিনিস ইতিহাসেও আছে, বিজ্ঞানেও আছে।*"

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো ঘটনা ঘটলেও নিয়মের বাইরে ঘটে না, ঐ প্রোব্যালিটির নিয়মের মধ্যে থেকেই ঘটে। এ জিনিস ইতিহাসেও আছে, বিজ্ঞানেও আছে।

বিরাট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ যদি না-ই আসত, তাতেই বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী এসে যেত? পৃথিবীতে মানুষ যত বছর ধরে রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বছর ধরে ডাইনোসররা পৃথিবী কাঁপিয়েছে। ডাইনোসররা এসেছিল, বার বার বহু সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছিল বলেই এসেছিল। একবারও যদি এর ব্যতিক্রম হত, তাহলে ডাইনোসরদের উদ্ভব সম্ভব হত না। অর্থাৎ প্রথম থেকেই সৃষ্টির উৎস ছিল ডাইনোসরমুখী। ক্রিয়াব উদ্দেশ্য থাকে কর্তার মনে, কাজেই এই উদ্দেশ্যটা ভগবানের ছিল। কি, এমনটা কি বলা যায় না?

বিজ্ঞানী অরুণকুমার শর্মাও প্রচারের চেষ্টায় আছেন, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষের সৃষ্টি—সবের মধ্যেই রয়েছে একটা পরিকল্পিত পরিকল্পনা।

অরুণকুমার শর্মা আমাদের দেশের বড় মাপের বিজ্ঞানী। এই বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির গোল্ডেন জুবলি প্রফেসর। ফেডারেশন অফ এশিয়ান সায়েন্টিফিক অ্যাকাদেমিজ অ্যান্ড সোসাইটিজের প্রেসিডেন্ট। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্স অ্যাকাদেমির প্রাক্তন সভাপতি।

অরুণবাবুর প্রশ্ন, "এই যে অ্যাকসিডেন্টাল ফর্মে লাইফ এল, এর পুরোটাই কি অ্যাকসিডেন্ট ?"

উত্তর অরুণবাবুই দিয়েছেন, "পুরোটা অ্যাকসিডেন্টে চলছে না, প্রোগ্রাম করে চলছে—একজন প্রোগ্রামার আছেন। তাঁকেই আমি ঈশ্বর বলে মানি। তিনি সাকার নন, নিরাকার, সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। আমরা বাইরে যা দেখছি তা তাঁরই অভিব্যক্তি। আমাকে আপনি অদ্বৈতবাদী বলতে পারেন।"

অবশ্য তারপরই একটা বেফাঁস কথা শ্রীশর্মা বলেছেন। তাঁর কথায়, "আমি ধ্যান করি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের মূর্তি কল্পনা করে কিছুক্ষণ আমি ধ্যান করি, তাঁকে আমি মনের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। অবতাররা তো ঈশ্বর নন, তাঁরা ঈশ্বরোপলব্ধির পথপ্রদর্শক। তাঁরা গুরু। আমার গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

শিষ্য অরুণবাবু সোচ্চার ঘোষণা রেখেছেন—ঈশ্বর সাকার নন, নিরাকার। গুরু রামকৃষ্ণ সাকার কালীর সঙ্গে কথা বলেছেন, দেখেছেন, মায় খুনসুটি পর্যন্ত করেছেন। অরুণবাবুর কথায়, "ঈশ্বরকে ধরাছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না।" তবু তারপরও অরুণবাবুর গুরু রামকৃষ্ণ ! সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ ! এখানে বিজ্ঞানীর মুখ থেকেই গড-গড় করে বেরিয়ে আসে জ্ঞানহীনের মত বিপরীত চিন্তা, বিশৃঙ্খল চিন্তা, যুক্তিহীন চিন্তা, বিজ্ঞান-বিরোধী চিন্তা। এদেশে বুদ্ধিজীবীর সম্মান পান অপুষ্ট বুদ্ধির মানুষ ?

বিজ্ঞানী অরুণকুমার শর্মা যে লাইফ বা প্রাণের আবির্ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের প্রোগ্রামকে আবিস্কার করেছেন, সেই প্রাণের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে প্রাণ, কোনও কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। তাঁর কথায়, "*ঈশ্বর এসব কিছুই সৃষ্টি করেননি, এসব সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির নিয়মে—এবং হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই পৃথিবীতে যা-কিছু দেখছেন—সমস্ত পদার্থ, গাছপালা পশু পাখি কীট পতঙ্গ মানুষ ইত্যাদি সমস্ত কিছু—কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি, a collection of atoms। মানুষের ক্ষেত্রে শুধু collection of atoms বললে হয় না, বলতে হয় a highly organised collection of atoms। কারণ প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ হচ্ছে সর্বোন্নত জীব, মানুষ এসেছে সবার শেষে।*

"*বিজ্ঞান বলে, এই পৃথিবী যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি মানুষও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে হঠাৎ*

এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই বিস্ফোরণ 'বিগ ব্যাং' নামে খ্যাত। বিস্ফোরণের পর প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে যা ঘটেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোটা ইতিহাসে আর কখনও তা ঘটেনি। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ঐ তিন মিনিট সময়ের মধ্যেই ধরা আছে। তখনই প্রকৃত অর্থে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের বিশ্বে আমরা যা-কিছু দেখি তার বীজ সৃষ্টি হয়েছিল তখন। তখন নিউক্লিয়ন ইত্যাদি বহু কণিকা গঠিত হয়েছিল এবং কণিকাগুলো পরস্পরের উপর ক্রিয়া করতে আরম্ভ করেছিল। এই যে পারস্পরিক ক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে মিথস্ক্রিয়া। বহুকাল ধরে বিভিন্নভাবে এই মিথস্ক্রিয়া হওয়ার ফলে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি। এইভাবেই আস্তে আস্তে উদ্ভিদ, পশু, পাখি, মানুষ, প্রভৃতি জীব সৃষ্টি হয়েছে।

"ঐ যে 'বিগ ব্যাং'-এর পর নিউক্লিয়ন ইত্যাদি কিছু কণিকা সৃষ্টি হয়েছিল, সে তো শূন্য থেকে হয়নি। নিশ্চয় কিছু ছিল যা থেকে হয়েছিল। কারণ, বিজ্ঞানের গোড়ার কথাই হল—Matter cannot be created nor can it be destroyed। শুধু ম্যাটার নয়, এনার্জির বেলায়ও এই কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ম্যাটার আর এনার্জি বিশ্বসৃষ্টির আগেও ছিল, বিশ্ব যদি কোনোদিন ধ্বংস হয়ে যায় তখনও থাকবে। তবে আজ যেভাবে আছে সেইভাবে হয়তো থাকবে না। হয়তো আবার 'ব্ল্যাক হোল'-এর মতো একটা-কিছু হয়ে ম্যাটার-ট্যাটার সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে, যেমন দেড় হাজার কোটি বছর আগে 'বিগ ব্যাং'-এর আগে ছিল। তার মানে, ম্যাটার আর এনার্জি আগেও ছিল, পরেও থাকবে--চিরকালই থাকবে। কেবল রূপ বদলাবে হয়তো।

"ম্যাটার আর এনার্জির আলটিমেট ইউনিট হচ্ছে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণা আর ফোটন। আগেই বলেছি, ম্যাটার হচ্ছে কিছু অ্যাটমের সমষ্টি। অ্যাটমের আবার নিজস্ব জগৎ আছে। তার মধ্যে ইলেকট্রন আছে, নিউক্লিয়ন আছে। নিউক্লিয়নের মধ্যেও আবার অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কণিকা আছে। ম্যাটার আর এনার্জি ডিফরান্ট ইউনিটে, ডিফারেন্ট লেভেলে এবং ডিফারেন্ট ফর্মে অর্গানাইজড্ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে অর্গানাইজড্ হয়ে যখন একটা নতুন অ্যাটম তৈরি হচ্ছে তখন তার নতুন ধর্ম দেখা যাচ্ছে। এইভাবে কতকগুলো অ্যাটম মিলে মলিকিউল তৈরি হল। আবার কতকগুলো মলিকিউল মিলে ম্যাক্রো-মলিকিউল তৈরি হল। কতকগুলো ম্যাক্রো-মলিকিউল মিলে টিস্যু আর অর্গ্যান তৈরি হল। তারপর বিভিন্ন অর্গ্যান মিলে একটা অর্গ্যানিজম্ তৈরি হল।

"অর্গানিজম্ মানে জীব। তা সে উদ্ভিদও হতে পারে, প্রাণীও হতে পারে। প্রথমে উদ্ভিদের সৃষ্টি। তারপর প্রাণীর। পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির পর দুটি ধারায় জীবজগৎ বিভক্ত হয়ে গেল—একটি উদ্ভিদজগৎ আর একটি প্রাণিজগৎ। উদ্ভিদজগৎ আর প্রাণিজগৎ মিলে জীবজগৎ।

"সৃষ্টির এই যে তত্ত্ব, বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'ইভলুশনিজম্' অর্থাৎ

'বিবর্তনবাদ'। 'বিগ ব্যাং'-এর পর কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তন হতে হতে সৃষ্টি আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ঈশ্বর নেই। বিবর্তনের এই ধারায় ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন হয়নি।"

আরও এক বড় মাপের বিজ্ঞানী, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত তারকমোহন দাসও কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, *"ঈশ্বর সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেননি। জীব জন্তু পশু পাখি কীট মানুষ, কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। এসবই সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির নিয়মে, ইভলুশনারি প্রসেসে। এই দেখুন না, প্রাণের ইউনিট যে অ্যামিনো অ্যাসিড তা ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ প্রাণের উপাদান আমরা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে ফেলেছি। কে জানে, একদিন হয়তো প্রাণও তৈরি করে ফেলব। বিজ্ঞান যেভাবে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে, তাতে মনে হয়, ল্যাবরেটরিতে একদিন প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যে জিনিস এখন ল্যাবরেটরিতে হতে চলেছে, সুদূর অতীতে এইভাবেই সে জিনিস প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছিল, এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করেননি।"*

○

প্রাণের ইউনিট যে অ্যামিনো অ্যাসিড তা ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ প্রাণের উপাদান আমরা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে ফেলেছি। কে জানে, একদিন হয়তো প্রাণও তৈরি করে ফেলব।

○

অজিতকুমার সাহা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহার পুত্র ও বিজ্ঞানী হিসেবে বিভিন্ন দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মেলনে এ'দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রধানত কাজ করেছেন নিউক্লিয়র ফিজিক্স ও সলিড স্টেট ফিজিক্স নিয়ে। শ্রীসাহা মনে করেন, জগতে সবই উদ্দেশ্যহীন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনে কোনও উদ্দেশ্য বা প্রোগ্রাম ছিল না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির নিয়মে, কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই।

শ্রীসাহার কথায়, যতদূর পর্যন্ত জানা যায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়নি। একটি বিশ্ব ছিল, যার মধ্যে ছিল তেজপূর্ণ প্রচণ্ড শক্তি। কেমন তার শক্তি, কি তার বৈশিষ্ট্য—এখনও জানা যায়নি। শুধু জানতে পারা গেছে, ওই তেজঃপূর্ণ, প্রচণ্ড শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বে সে ধরনের কোনও পদার্থ ছিল না, যে সব পদার্থের সঙ্গে বর্তমানে আমরা পরিচিত।

তারপর এক সময় ওই তেজঃপুঞ্জ বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের সময়—এক হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে। গড় ধরে বলা যেতে পারে, আনুমানিক দেড় হাজার কোটিবছর আগে। সেই বিস্ফোরণের নাম দেওয়া হয়েছে

'বিগ ব্যাং'। এই বিস্ফোরণের পরেই সৃষ্টি হল কোয়ার্ক ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু কণা। তখনই বিশ্ব সৃষ্টি হল। বিস্ফোরণের পর বিশ্ব যেমন আয়তনে বাড়তে লাগল, তেমনই এক সময় তার উত্তাপ কমতে শুরু করল। বিশ্ব সম্প্রসারিত আর শীতল হতেই থাকল। একটা পর্যায়ে সৃষ্টি হল হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন তারকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এইভাবে সৃষ্টি হল তারার। সৃষ্টি হল, আবার ধ্বংসও হল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভব হল বিভিন্ন ভারী পদার্থের, ইংরেজিতে যাকে বলে হেভি এলিমেন্ট।

নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অণু-পরমাণুর সৃষ্টি হতে লাগল এবং তাদের রূপান্তরও ঘটতে লাগল। অণু ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করল। শেষে রেপ্লিকেটিং মলিকিউল এল। রেপ্লিকেটিং মলিকিউল মানে সেই ধরনের মলিকিউল, যা থেকে ঠিক ওই ধরনের মলিকিউল তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক সময় এল ইউক্যারিয়োটিক সেল। এই সেল বা কোষের মধ্যে এল জেনেটিক কোষ। এই কোষ থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হল। প্রথমে এল এককোষী প্রাণী, তারপর বহুকোষী।

মানুষ এসেছে সবার শেষে। মানুষের আগমন মাত্র তিরিশ লক্ষ বছর আগে। মানুষ একবারে পৃথিবীতে আসেনি। এককোষী প্রাণীর থেকে যে রূপান্তর সৃষ্টি হয়েছিল, তারই শেষ পরিণতি মানুষ।

প্রকৃতির রাজ্যে যে রূপান্তর জন্ম-লগ্ন থেকে শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণই উদ্দেশ্যহীনভাবে আজও ক্রিয়াশীল। কোষের মধ্যেও উদ্দেশ্যহীনভাবেই মিউটেশন হচ্ছে। এই মিউটেশনই মূল কথা। এই মিউটেশনের জন্যই এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের পথ ধরে এসেছে কোটি কোটি কোষের প্রাণী—মানুষ। এই মিউটেশনের জন্যেই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

•

বাইবেলে বলা হয়েছে, 'God created man in His own image'। বাইবেলের কথাটা বদলে বলা যায়, Man created God in his own image। প্রায় সব ধর্মেই তাই। তাইতো আমরা দেখি দেব-দেবীদের সবাই মানুষেরই মত। তারা দুঃখে কাতর হন, আনন্দে উল্লাসিত, ক্রোধে উন্মাদ।

○

বাইবেলে বলা হয়েছে, 'God created man in His own image'। বাইবেলের কথাটা বদলে বলা যায়, Man created God in his own image। প্রায় সব ধর্মেই তাই। তাইতো আমরা দেখি দেব-দেবীদের সবাই মানুষেরই মত। তারা দুঃখে কাতর হন, আনন্দে উল্লাসিত, ক্রোধে উন্মাদ।

○

আর এক বিজ্ঞানী অশোক বড়ুয়া ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে বাইবেলে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক থিওরি। অশোক বড়ুয়া ইন্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর ডিরেক্টর। শ্রীবড়ুয়া পদার্থ বিজ্ঞানী। তিনি বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞানের আধুনিক 'বিগ ব্যাং' থিওরির কথা হাজার হাজার বছর আগেই লেখা হয়েছে বাইবেলে। তাঁর কথায়, "বাইবেলে আছে, In the begining God created the heaven and the earth। আরও আছে And God said, let there be light : and there was light। 'বিগ ব্যাং' থিওরিও বলছে, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটল, তারপরই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হল। সুতরাং 'বিগ ব্যাং' থিওরিও যা, কনভেনশনাল গডও তা। কোনো পার্থক্য নেই।"

বিকাশ সিংহ। সল্টলেকের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ভেরিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারের ডিরেক্টর। একই সঙ্গে নিউক্লিয়র ফিজিসিস্ট এবং বিভিন্ন ধর্ম পুস্তকে খুঁজে পান আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে।

'বিগ ব্যাং' থিওরির প্রসঙ্গে বিকাশবাবুর অভিমত, "মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিন্তাধারার অনেক মিল আছে। বিশ্ব সৃষ্টির আগে যে মহাতেজ ছিল, সেই মহাতেজ কোথা থেকে এসেছিল, বিজ্ঞানী হিসেবে তার উত্তর আমার জানা নেই। (যাকে 'বিগ ব্যাং'বলি—তার আগে কী ছিল, বিজ্ঞান সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না।) দার্শনিক হিসেবে আমি স্বীকার করতে রাজি আছি, ঈশ্বরই সেই তেজ সৃষ্টি করেছিলেন—এবং তারপর মহাভারতে বিশ্বরূপদর্শনের যে বর্ণনা পাই, সেই বর্ণনার সঙ্গে পনের শ কোটি বছর আগেকার ঐ বিস্ফোরণের দৃশ্যের অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"

ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল সায়েন্স অ্যাকাদেমির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট মৃণালকুমার দাশগুপ্তও মনে করেন, এই মহাবিশ্ব বিষয়ে আজকের বিজ্ঞান যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, সে সব কথা হাজার হাজার বছর আগেই বলে গেছে বেদ ও উপনিষদ। তাঁর কথায়, "এই বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের বেদ ও উপনিষদে যে কথা আছে, আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে তা অনেকখানি মিলে যায়। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আজকের বিজ্ঞান যে কথা বলছে, আমাদের উপনিষদ বহুকাল আগে প্রায় সেই কথাই বলে গেছে।"

মৃণালবাবু খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "ওপেনহাইমার তো গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের তেজ দেখে তিনি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস মহাত্মনঃ।"

মৃণালবাবু বোঝাতে চেয়েছেন—হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত।

২২ এপ্রিল '৯৫-এর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হৃষীকেশ সেন-এর 'বিজ্ঞান

ও ভগবান' লেখাটির প্রসঙ্গে আবার আমরা ফিরছি। ৪৫ পৃষ্ঠার ১ম কলমে বলা হয়েছে, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ-এর দ্বৈত বিশ্বের (Duplex world) যে ধারণা দিয়েছেন, তা সাংখ্য দর্শনের অব্যক্ত-ব্যক্ত তত্ত্বের মত। ৪৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'বিগ ব্যাং'-এর সেই মহাবিস্ফোরণের কথা 'তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ', 'কঠক সংহিতা' ইত্যাদি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন-এর চৈত্র ১৪০০ সংখ্যার ১৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানীমহলে জনপ্রিয় তত্ত্ব 'বিগ ব্যাং' (Big Bang)-এর বর্ণনা বিজ্ঞানীদের লেখায় যা পাই, প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে তার আশ্চর্য-রকম মিল। "বিজ্ঞানের এই ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায় শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত সৃষ্টি বর্ণনা ঃ "সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর সেই সকল হইতে একটি অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল।...ঐ অণ্ড বহির্ভাগে ক্রমশ দশগুণ বর্ধিত প্রধানাদি জলাদি দ্বারা পরিবৃত। সেই অণ্ডেই ভগবান হরির মূর্তিস্বরূপ লোকসমূহ বিস্তৃত আছে। আবার তিনি দশাঙ্গুলি পরিমিত হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। মায়ার অধীশ্বর সেই ভগবান বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্তকাল, অদৃষ্ট ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন।"

যে প্রবন্ধ থেকে এই অংশটি তুলে দিলাম, তার নাম, 'বিজ্ঞানমনস্কতা, ভগবদ্বিশ্বাস ও কুসংস্কার'। লেখক—বিশ্বরঞ্জন নাগ।

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা পেলাম, তেজঃপূর্ণ, শক্তিপূর্ণ যে বিশ্ব বিস্ফোরিত হয়ে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই বিশ্ব আবার সৃষ্টি হয়েছিল সকল পদার্থের আলোড়িত হয়ে মিলনের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক 'বিগ ব্যাং'—তত্ত্বের সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিলের পরিবর্তে বড় রকম গরমিলই তো চোখে পড়ছে। এরপরও বিশ্বরঞ্জনবাবু আশ্চর্য রকম মিল খুঁজে পেলে, সেটা বিশ্বরঞ্জনবাবুর কথার সত্যতা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞান যখন বলছে, 'বিগ ব্যাং' থিওরি যখন বলছে, শক্তিপূর্ণ ওই বিশ্বে সে ধরণের কোনও পদার্থ ছিল না, যে সব পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত, জল বায়ু প্রাণী ইত্যাদি তো দূরের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্ফোরিত হওয়ার আগের তেজঃপূর্ণ বিশ্ব 'জলাদি দ্বারা পরিবৃত' থাকার বর্ণনা পড়েও যাঁরা আশ্চর্য হন, তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যে 'আশ্চর্য' হওয়ার ভান করেন, এটুকু বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

হিন্দু মৌলবাদী, রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন-এর ওই সংখ্যার ১৪৫ পৃষ্ঠাতেই বলা হয়েছে, 'ব্ল্যাক হোল'-এর কথা বিজ্ঞানে নতুন হলেও হিন্দু ধর্মে তা আদৌ নতুন নয়।

হিন্দু ধর্মে ব্ল্যাক হোলের কথা কীভাবে আছে? তাও উদাহরণ হিসেবে

তুলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণটা এই—'ব্ল্যাক হোল' (কৃষ্ণ গহ্বর)—জাতীয় মহাশূন্যের তথাকথিত 'সিঙ্গুলারিটি'তে (গাণিতিক উৎসবিন্দু), যেখানে নতুন পদার্থ জন্ম নিচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভাবা হয় যে, সময় সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাধারণের মধ্যে বহুল-প্রচলিত কথা 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছর' এরই প্রতিধ্বনি।"

'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছর', কথাটা নাকি 'ব্ল্যাক হোল'—এর সমার্থক শব্দ? 'ব্ল্যাক হোল'-এর অস্তিত্বেরই ঘোষণা! অস্তিত্বেরই প্রতিধ্বনি!! এটা আপনার আমার মনে না হোক, রামকৃষ্ণ মিশনের মনে হয়েছে, হিন্দু ধর্মের প্রচারক বৃহত্তম সংস্থাটির মনে হয়েছে। এরকম অনেক কিছুই ওদের মনে হয়। ওদের মনে হয়—নলজাতক শিশু (Test-tube baby), বিকল্প মা (surrogate mother), এইসব আধুনিক বিজ্ঞানের দান বলে আমরা মনে করলেও তা আসলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কাছে নতুন কিছু নয়। দ্রোণ ও দ্রোণীর জন্মকথা, সত্যবতীর জন্মকথা, এ'সব পুরাণের ঘটনা তারই প্রমাণ। যে 'পেট্রিয়ট মিসাইল' (Patriot missile) নামের বিধ্বংসী অস্ত্র (উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল) আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হয়ে গেছে 'বরুণ-বাণ' ও 'অগ্নি-বাণ' আদৌ কোনও কল্পনা ছিল না।

এই সবই লেখা রয়েছে উল্লেখ করা 'উদ্বোধন'-এর ১৪৫ পৃষ্ঠায়। এই পৃষ্ঠাতে এ'কথাও বলা হয়েছে—হিন্দু পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে, মহাকাব্যে বর্ণিত অধিকাংশই রূপক। রূপকগুলোর ব্যাখ্যা করলেই দেখতে পাব, বিজ্ঞানের নবতম কোনও আবিষ্কারই নতুন নয়। ওই আবিষ্কার আসলে নতুন করে ফিরে দেখা। "আসলে আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানরাশিকে অবহেলা করে পাশ্চাত্যের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ বলে মনে করি।... বিদেশের বিজ্ঞানী প্রশংসা না করলে ভারতীয় বিজ্ঞানী স্বীকৃতি পান না। বিদেশী পত্রিকায় ছাপা না হলে ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র গণ্য হয় না। দেশের কবিরাজী ঔষধকে হেয় প্রতিপন্ন করাই আমাদের ডাক্তারদের 'উন্নত' শিক্ষার পরিচয়।"

এই পত্রিকায় ১৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সত্যকে জেনেছিলেন। সেই সত্যকে তাঁরা 'পরমব্রহ্ম' বলতেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরমব্রহ্মের স্বরূপ—তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরোধী নয়। কাজেই ভগবদ্বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানমনস্কতায় কোন বিরোধ নেই।"

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রচারিত এই অমূল্য বাণী বিশ্লেষণ করলে আমরা পাচ্ছি ঃ

এক ঃ বিজ্ঞানের সব নবতম আবিষ্কারই বাস্তবে নতুন কোনও আবিষ্কারই নয়। এ'সবই প্রাচীন যুগে হিন্দুরা আবিষ্কার করেছিল। প্রাচীন হিন্দু পুরাণে, মহাকাব্যে এইসব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোর উল্লেখ আমরা পাই।

দুই ঃ প্রাচীন হিন্দু পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোর উল্লেখ রয়েছে রূপক আকারে। প্রয়োজন—রূপকগুলোর ব্যাখ্যার। প্রয়োজন—আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে রূপকগুলোর পুনর্ব্যাখ্যার।

তিন ঃ ভারতের বৃহত্তম হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন আহ্বান জানাচ্ছে, আমাদের ঋষিদের অধ্যাত্মবাদী জ্ঞান ও ঈশ্বরবাদী জ্ঞান যা আসলে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান দ্বারা পাশ্চাত্যের অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে অপসারণ করতে হবে। এবং এ'ভাবেই আত্মবিস্মৃত জাতিকে উঠে দাঁড়াতে হবে।

চার ঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও যুক্তিমনস্কতা বা বিজ্ঞানমনস্কতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

পাঁচ ঃ হিন্দু দর্শন অবশ্যই বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বড় বিজ্ঞান।

যদিও অবশ্য সেটা প্রমাণ করতে গেলে আবার হিন্দু দর্শনের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্বই 'খুঁজে বার' করতে হয়।

এই কথাগুলো শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন প্রচার করছে না, এই একই ধরনের বক্তব্য প্রচারে বিপুলভাবে আসরে নেমেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল। সঙ্গে গলা মেলাতে পেয়েছেন কিছু হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীকে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও মৌলবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জনতা পার্টির (অবশ্য ভারতের নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক প্রতিটি দলই ব্যাপক অর্থে মৌলবাদকে জিইয়ে রাখতে চায় ভোট-বাক্সকে স্ফীত করার লোভে। আর এই লোভেই রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের অলীক ঈশ্বর বিশ্বাস, অমানবিক ধর্মীয় বিশ্বাস, ভ্রান্ত নিয়তিবাদকে জনগণের মন থেকে সরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ভোট হারাবার ঝুঁকি নিতে নারাজ) সুরে সুর মেলাতে হাজির হয়েছে বাঙলাভাষী ইন্টেলেকচুয়ালদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'। 'দেশ' বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে লাগাতারভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাসের পক্ষে বস্তাপচা যুক্তি উগরেই চলেছে।

২২ এপ্রিল, ১৯৯৫ সংখ্যার 'দেশ' থেকে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কুযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। ওই সংখ্যার ৪৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মডেল হিসেবে 'উর্ণনাভ' বা মাকড়সার উল্লেখ আছে, বেদান্তে। বাস্তবের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মাকড়সার আশ্চর্যরকম মিলও খুঁজে পেয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে 'আঁতেল' হবার সুখ দেওয়া 'দেশ' পত্রিকা। মিল কোথায় ? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শূন্য থেকে প্রসারিত হতে শুরু করেছে, আবার সঙ্কুচিত হয়ে একদিন শূন্যে পরিণত হবে। মাকড়সা না হোক, মাকড়সার জালও প্রসারিত হয়, আবার জাল গুটিয়েও নেওয়া যায়। অতএব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বেদান্ত বর্ণিত মাকড়সার দারুণ মিল খুঁজে পাওয়া গেল !

'দেশ' পত্রিকায় এমন বালখিল্যবৎ উদাহরণ হাজির করা দেখে আমার সাথী দেবকুমার হালদার হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন, "ব্যাখ্যা খুঁজে বের করবই ভাবলে যে কোনও কিছু থেকেই টেনে-টুনে একটা যা হোক ব্যাখ্যা হাজির করা যায়-ই।

"ধরো, একজন মাতালকে জিজ্ঞেস করলে—'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মডেল বিষয়ে তোমার কোনও ধারণা আছে?

"মাতাল তোমার কথার জবাব না দিয়ে বোতল বের করল। তারপর ঢক্-ঢক্ করে গলায় ঢালল গোটা বোতলের গলিত আগুন। ফাঁকা বোতলটা নামিয়ে রেখে এলো-মেলো পায়ে বেরিয়ে গেল।

"মাতালের এই ঘটনার মধ্যে থেকেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব মডেলের সঙ্গে মিল খুঁজে বের করা যায়, বের করার তাগিদ থাকলে।

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শূন্য থেকে সৃষ্টি, সেটা বোঝাতেই মাতাল শূন্য হাত বোতলে পূর্ণ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে শূন্যে পরিণত হবে বোঝাতেই মাতাল তার গলায় শেষ মদ-বিন্দু ঢেলে বোতল শূন্য করেছিল। এবং নামিয়ে রেখেছিল বোতল।"

মুসলিম-বিজ্ঞানী ও মৌলবাদী চক্রান্ত

ফতেহ মোহাম্মদ পেশায় বিজ্ঞানী। নিবাস, পাকিস্তানে। কোয়ান্টাম মেকানিকস-এর থেকে শুরু করে জিন, সবই পবিত্র মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরআনের আলোকে অনুধাবন করা যায়—এই প্রসঙ্গে একটি ঢাউস বই লিখেছেন মোহাম্মদ সাহেব। প্রকাশক, পাকিস্তানের সামরিক পুস্তক ক্লাব। সরকার বইটির দারুণ প্রশংসা করেছে। বইটিতে ব্যাখ্যা সহকারে দেখানো হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারই নানা রূপকের আকারে রয়েছে কোরআনে। লেখক নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন (অনেক মুসলিম ধর্ম-বিশ্বাসীদের মতে প্রমাণ করে ছেড়েছেন), 'ব্ল্যাক হোল' বা 'কৃষ্ণ গহ্বর' হল কোরআন বর্ণিত 'দোজখ' বা নরক।

পারভেজ আমিরালী হুদোভয় পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু পদার্থবিদ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড-এর এম. আই. টি. থেকে পি-এইচ. ডি.। ইতালির ট্রায়েস্টে আই. সি. পি. টি.-তে সম্মানীয় অতিথি বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছেন। ১৯৮৪ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়—পাকিস্তানে ইসলামি মৌলবাদের উত্থান ও বিজ্ঞানের আদর্শগত সংকট। প্রবন্ধে লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "পাকিস্তানে একটি ক্রমবর্ধমান নতুন আন্দোলন হাজির হয়েছে, ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসকে বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন।

আন্দোলনকারীরা আধুনিক বিজ্ঞানকে পশ্চিমা উপদ্রব হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে হটিয়ে ইসলামি বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। [আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানকে হটিয়ে হিন্দু বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠার আহ্বানের সঙ্গে কী অসাধারণ মিল ! দু' দেশের মৌলবাদী চিন্তানায়কদের চিন্তার আশ্চর্য রকম মিল পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।] অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হচ্ছে, বিজ্ঞান একটি আদর্শগত বিষয় এবং ইসলামি বিজ্ঞান খ্রিস্টিয় বিজ্ঞান বা কমিউনিস্টদের বিজ্ঞান থেকে ভিন্নতর ও উৎকৃষ্ট। ইসলামি বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা এবং পবিত্র কোরআন ইসলামি বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা। ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ব্যহবহুল ইসলামিক বিজ্ঞান সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলো থেকে আগত শত শত বিজ্ঞান প্রতিনিধিদেব বক্তব্য থেকে এই মতটাই উঠে এসেছিল।

"ইসলামিক দর্শনকে বিজ্ঞান বলে যারা চালাতে চাইছে, তাদের মধ্যে প্রধান নেতৃত্বে রয়েছে 'জামাত-ই-ইসলাম' নামের একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠন, [প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটু লক্ষ্য করলেই খুঁজে পাবেন, এ'ক্ষেত্রেও দু' দেশে অসাধারণ মিল। এ'দেশে হিন্দু দর্শনকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চাইছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি, রামকৃষ্ণ মিশন, ইত্যাদি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল।] যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন যোগাড় করেছে। জামায়তি প্রচারের বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমা বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। জামাত-ই-ইসলামের সবচেয়ে বাকপটু নেতাদের মধ্যে একজন মরিয়ম জামিলাহ।...মরিয়ম জামিলাহর মতে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে ওঠার কোনও প্রয়োজন নেই মুসলিম বিজ্ঞানের। এটা অভিপ্রেতও নয়। কারিগরি শিক্ষার সংকীর্ণতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে জামিলাহব সুপারিশ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে অধ্যাত্মবাদী ইসলামি সাধকদের ফিরিয়ে আনতে।" আমাদের দেশে মৌলবাদী ও প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে মৌলবাদী প্রতিটি শক্তিই আধুনিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে ফিরিয়ে আনতে চাইছে অধ্যাত্মবাদী হিন্দু সাধকদের, ঋষিদের। দু'দেশের মৌলবাদী চিন্তায় কী আশ্চর্য রকমের মিল !

ডঃ পারভেজ তাঁর প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, "গত কয়েক বছরে 'ইসলামি বিজ্ঞান'-এর প্রবক্তারা একটি নতুন ব্যাখ্যা হাজির করতে শুরু করেছে—এই 'ইসলামি বিজ্ঞান' শুধুমাত্র সেকেলে মুসলমানদের বিজ্ঞান নয়। বরং এটা এমনই এক বিজ্ঞান যা সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে কোরআনের আলোতে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। এইজাতীয় বক্তব্যেব সমর্থনে ইসলামি বিজ্ঞানের প্রবক্তরা যুক্তি হাজির করেন যে—কোরআন একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধান। কোরআনে রয়েছে সব বিজ্ঞান।" হিন্দু মৌলবাদীরা যেমন বলেন—আমাদের বেদে, পুরাণে, গীতায় সব আছে।

ডঃ পারভেজ জানাচ্ছেন, কিছু কিছু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী পেশার বড় মাপের মানুষ ইসলামি অধ্যাত্মবাদের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের লুকনো নানা তত্ত্ব।

ডঃ পারভেজ উদাহরণ হিসেবে হাজির করেছেন এমনই কিছু বিজ্ঞান-বিরোধী 'ইসলামি বিজ্ঞানী'কে। "প্রথম উদাহরণ একজন পাকিস্তানী অধ্যাপক। লন্ডনের নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. করেছেন। পাকিস্তানের জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উন্নয়ন সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং একটি বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শিক্ষাবিদ। এই বিজ্ঞানী বর্তমানে জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও কারিগরি কমিশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি। ১৯৭৯ সালের 'ইসলামিক বিজ্ঞান সম্মেলন'-এ একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন—একঃ প্রতি সেকেন্ডে আলোর যা গতি, তার চেয়ে কম গতিবেগ হওয়ার কারণে 'বেহেশত' বা 'স্বর্গ' আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান অবস্থান থেকে সরে গেছে। দুইঃ শবেবরাতের পূণ্য রজনীর এক উপাসনা, সাধারণ রাতের সহস্র উপাসনার চেয়ে শ্রেয়। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে টেনে এনেছেন। তিন ঃ কোরআনে বর্ণিত 'সাত আসমান' তত্ত্ব বিষয়ে প্রফেসর সাহেব বলেন, এগুলো পরমাণুর কোয়ান্টাম স্তরের মত। যেভাবে শক্তি শোষণ বা বর্জন করে পরমাণু স্তর পরিবর্তন করে, সেভাবে পাপ বা পূণ্য করেও এক আসমান থেকে অন্য আসমানে যাওয়া যায়।

"আরেকজন ইসলামি বিজ্ঞানী যাঁকে আমরা সোজাসুজি ডঃ বি. এম. বলে উল্লেখ করব, তিনি পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি কমিশনের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত। শুধু গভীরভাবে ধার্মিক নন, সামাজিক ব্যাধিগুলোর সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে ইসলামি বিজ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে কৃতসংকল্প। তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছেন, কোরআনে বর্ণিত অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন অগ্নিময় জীব আসলে জিনের অস্তিত্বের রূপকাকার। এই ধার্মিক বিজ্ঞানী আর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন কৃষ্ণ গহ্বর (Black Hole)-এর অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন হলেও হাজার হাজার বছর আগে রচিত কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কোরআনে যে বেহেশত্-এর অর্থাৎ স্বর্গের উল্লেখ আছে, তা আসলে কৃষ্ণ গহ্বর।" (হিন্দু ধর্ম প্রচারক রামকৃষ্ণ মিশন বলছে, 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছর'. বাক্যটি কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি) বিশিষ্ট ইসলামি বিজ্ঞানী ফতেহ মোহাম্মদ প্রমাণ করতে সচেষ্ট—'দোজখ' বা নরকই হল কৃষ্ণ গহ্বর। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বড় মাপের বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন, কৃষ্ণ গহ্বর আসলে 'বেহেশ্ত' বা স্বর্গ। ঈশ্বর, আল্লাহে বিশ্বাসী মানুষগুলোও যে মৌলবাদী বিজ্ঞানীদের এমন উল্টো-পাল্টা কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পরবেন! আরও বেশি বেশি করে ধর্মাত্মা বিজ্ঞানীদের মতামত নিলে, আরও বেশি বেশি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাই প্রবল!

পাকিস্তানের একটি উল্লেখযোগ্য নতুন বই 'গড ইউনিভার্স অ্যান্ড লাইফ'। লেখক, মোহাম্মদ মুনির। যাঁরা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন, তাঁদের কাছে বইটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। বইটির ২৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন, "আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, পারমাণবিক অবদানগুলো অধ্যাত্মিক। বস্তুবাদীরা আমাদের যে ভাবে প্রোটন ও নিউট্রনে আকর্ষণের ক্ষেত্রে তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তিকে বিশ্বাস করতে বলেন, আসলে তা কিন্তু সত্যি নয়। ভাবতে অবাক লাগে, যখন নর ও নারী একে অপরের পিছু ছুটছে, প্রেমে লিপ্ত হচ্ছে, তখন সেই নর-নারীরাই এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি, যে প্রোটন ও নিউট্রন দুই লিঙ্গে বিভক্ত।"

বুঝুন ব্যাপারটা! পরমাণুর মধ্যে আত্মার আবিষ্কার এবং প্রোটন ও নিউট্রনে দুই বিপরীত লিঙ্গের আবিষ্কার! মুনির সাহেব তাঁর এমন যুগান্তকারী আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অবহেলে নোবেল জিতে নিতে পারেন।

মিশরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ রাশাদ খলিফা অত্যাধুনিক কম্পিউটারের সাহায্যে কোরআন বিশ্লেষণ করে, বিশ্লেষিত তথ্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কোরআন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রচনা এবং কোরআনই অলৌকিকের অস্তিত্বের প্রমাণ। ডঃ খলিফা এ' বিষয়ে একটি বইও লিখে ফেলেছেন, 'দি কম্পিউটার স্পিকন্ গডস্ মেসেজ টু দি ওয়ার্ল্ড'। খলিফা সাহেবের আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে মোঃ আবদুর রজ্জাক লিখেছেন, 'আল-কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা এবং উনিশ'। 'মোজেযা' কথার অর্থ 'অলৌকিক ব্যাপার'। 'মোজেযা' এবং 'উনিশ' শব্দ দুটি নামকরণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সার্থকতা এই যে, আল্লাহে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী খলিফা সাহেব কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—'উনিশ সংখ্যাটি পরম বিস্ময়কর ও চরম অলৌকিকত্বের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্তারিত নির্ভুল বর্ণনা'!

কোরআন যে আল্লাহেরই রচনা, তাই চূড়ান্ত বিজ্ঞান, এবং অলৌকিক অস্তিত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ—এ'কথা জানিয়ে 'জনাব প্রবীর ঘোষ-কে প্রীতি ও শুভেচ্ছার উপহার হিসেবে' একটি চিঠিসহ বইটি পাঠিয়েছিলেন লেখক।

সে সময় উত্তর দিইনি। মনে হয়েছিল এ'সব পাগলামীর যোগ্য জবাব হতে পারে—উপেক্ষা। কিন্তু আজ পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ও ঈশ্বরের মেলবন্ধন ঘটাবার যে চেষ্টা শুরু হয়েছে, তাতে এইসব বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পাগলামী কতটা নির্ভেজাল, কতটা নির্ভেজাল তাঁদের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস—এই নিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে। প্রচার-মাধ্যমগুলো, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলগুলো প্রচার শুরু করেছে—বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ও ঈশ্বরের কোনও বিরোধ তো নেই-ই, বরং মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সময় হয়েছে। এঁরা নিজেদের

বক্তব্যের সমর্থনে বিজ্ঞানের ভারী ভারী কথা আমদানি করে যেমন এক রহস্যময় কুয়াশা সৃষ্টি করে গোটা বিষয়টাকেই গুলিয়ে দিচ্ছেন, তেমনই কখনও বা হাজির করছেন বিজ্ঞানীদের ভাঁড় ভাঁড় কথা। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শোষক ও রাষ্ট্রশক্তির মগজ ধোলাইয়ের এই পরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের এ' জাতীয় পাগলামী বা উদ্দেশ্যমূলক কুযুক্তির বিরুদ্ধে বর্তমানে কলম ধরতে হচ্ছে, বক্তব্য রাখতে হচ্ছে।

খলিফা সাহেব বাস্তবিকই কি মনে করেন—হজরত মোহাম্মদ আল্লাহের পাঠানো 'বোরাক' নামের এক আশ্চর্য মা-প-পা (মানুষ + পশু + পাখি)-র পিঠে চেপে কোটি কোটি বছরের পথ পার হয়ে আল্লাহের কাছে গিয়েছিলেন? আল্লাহের সঙ্গে মোহাম্মদের কথা-বার্তা হয়েছিল? আল্লাহ মোহাম্মদকে দুটি মহারত্ন উপহার দিয়েছিলেন—'নামাজ' ও 'রোজা'! তারপর আবার কোটি কোটি বছরের পথ ফেরা! যাতায়াত, আল্লাহের সঙ্গে কথা-বার্তা, সব মিলিয়ে মোহাম্মদের সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক মিনিট। বিজ্ঞানী খলিফা সাহেব, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন এমনটা ঘটা সম্ভব? বিজ্ঞান মেনেই সম্ভব?

'বোরাক'-এর দেহ ঘোড়ার, মাথা সুন্দরী যুবতীর, পিঠে পাখির ডানা। বোরাকের পাখা ছিল। বোরাক উড়তে পারত। এ' সব ধরে নেবার পরও প্রশ্ন থেকে যায়—ডানায় নির্ভর করে শূন্যে উড়তে বায়ুর প্রয়োজন হয়। যেখানে বায়ু নেই, সেখানে ডানার সাহায্যে ওড়া বিজ্ঞানের নিয়মেই অসম্ভব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার পর এক ফুট ওড়াও যেখানে অসম্ভব, সেখানে কোটি কোটি মাইল উড়ল কী করে? কল্পনায় ভর করে ছাড়া ওড়ার আর কোনও ব্যাখ্যা তো পাই না!

এখন যে-ভাবে সব ধর্মীয় কল্পনার গায়ে 'রূপক' ছাপ মেরে গোঁজামিল ব্যাখ্যা হাজির করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাতে 'বোরাক'কে আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন যান অথবা 'টাইম-মেশিন' বলে কোনও ধার্মিক বিজ্ঞানী ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা হাজির করলে বিন্দুমাত্র অবাক হব না।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যখন সর্বত্র বিরাজ করছেন, তখন মোহাম্মদের সঙ্গে কথা বলতে কোটি কোটি মাইলের পথ উড়িয়ে নিয়ে গেলেন কেন? মাথায় ঢোকে না।

○

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যখন সর্বত্র বিরাজ করছেন, তখন মোহাম্মদের সঙ্গে কথা বলতে কোটি কোটি মাইলের পথ উড়িয়ে নিয়ে গেলেন কেন? মাথায় ঢোকে না।

○

বিজ্ঞানী খলিফা সাহেব উত্তরে হয় তো বলবেন—মোহাম্মদকে আরশ, বেহেস্ত ও দোজখ দেখাতেই আল্লাহ এই ভ্রমণ বা 'মোয়ারাজ'-এর ব্যবস্থা

করেছিলেন। যিনি যুক্তির ধার ধারেন না, তাঁর এমন কথা বলতে কোনও অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়। এমন ভাবার পক্ষেও খলিফা সাহেবের কোনও অসুবিধে নেই যে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর, রবিবার, সকাল ৯টায়। আবার এমন উদ্ভট বিজ্ঞান-বিরোধী তথ্যকে বিজ্ঞানের ছাপ মেরে দিতে উন্মাদ বা ধান্ধাবাজ কোনও বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মিশনের দেওয়া উদাহরণের অনুকরণে বলতেই পারেন,—'বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছর' জাতীয় কথা। সঙ্গে এটুকুও বলে দেবেন সালের হিসেবটা ঈশ্বরের করা, ওটা মানুষর বছরে পরিবর্তিত করতে.... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোরআনের বেহস্ত বা স্বর্গের সাতটা ভাগ ও দোজখ বা নরকের সাতটা ভাগকে কিছু মুসলিম বিজ্ঞানীরা যেভাবে পরমাণুর কোয়ান্টাম স্তরেরই রূপক বলে প্রচারে নেমেছেন, তাতে বেহেস্তে মদ ও মেয়েছেলের ঢালাও ব্যবস্থাকে 'রূপক' ছাপ মেরে একটা অকিঞ্চিতকর ব্যাখ্যা হাজির করতে কতক্ষণ?

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭—১৮৯৮) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—আল্লাহের বাণীর বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে বাস্তব সত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সেখানে আল্লাহের বাণীকে 'রূপক' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

সৈয়দ সাহেবের এই নীতিটা বিভিন্ন প্রধান ধর্ম দারুণভাবে গ্রহণ করেছে এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানের মুক্ত হাওয়া থেকে এনে 'হিন্দু-বিজ্ঞানী', 'মুসলিম-বিজ্ঞানী', 'খ্রিস্টান-বিজ্ঞানী' ইত্যাদি খাঁচায় পুরে সুন্দরভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

খ্রিস্টান-বিজ্ঞানী ও মৌলবাদী চক্রান্ত

স্বর্গের কথায় আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল। বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ফ্র্যাংক জে টিপলার-এর কথা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টিউলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। বিষয়ঃ আপেক্ষিকতা। ডক্টরেট হওয়ার পরও জ্যোতিঃপদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন বার্কলে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখেছেন একটি বই, 'দি ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটি'। তাতে টিপলার লিখছেন—কুড়ি বছর আগে যখন আমার কেরিয়ার জ্যোতিঃপদার্থবিদ হিসেবে শুরু করেছিলাম, তখন ছিলাম কট্টর নাস্তিক। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, একদিন আমিই লিখব এমন কোনও বই, যার উপজীব্য হবে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের মূল দাবিগুলোর সত্যতা প্রমাণ।

টিপলার ওই ঘোষণা করেছেন, "কচিৎ-কখনও আমরা পদার্থবিদরা দেখি, আমাদের বহু আগে বাতিল তত্ত্বকেই পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের এখন বাতিল ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

আমার আশা, এই গ্রন্থে বিজ্ঞানীদের সে কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারব। এখন সময় এসেছে ধর্মতত্ত্বকে পদার্থবিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার। স্বর্গকে একটা ইলেকট্রনের মতই বাস্তবে পরিণত করার।"

টিপলার তাঁর 'ওমেগা পয়েন্ট' তত্ত্বে বলেছেন, স্বর্গ আছে, আছেন ঈশ্বর, আছে পুনর্জন্মের ব্যবস্থা।

এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ে গেল। পুনর্জন্মে বেজায় বিশ্বাসী। তাঁর প্রবলতর বিশ্বাস থেকে ধ্বনিত হয়েছে, "ঈশ্বর আছেন, প্রতিটি মানুষকে এই সত্যে একদিন-না-একদিন আসতেই হবে। এ জন্মে না হলে পরের জন্মে, না হলে তার পরের জন্মে। একজন্মে-না-একজন্মে তার ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবেই।"

বহুজন্ম ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ না চালিয়েই কী প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত বলুন তো! বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এমন ডাকাবুকো অন্ধ বিশ্বাসী বিরল।

এই বিরল প্রজাতির বিজ্ঞানীর নাম—বিধানরঞ্জন রায়। ডঃ রায় একজন খাদ্য বিজ্ঞানী; কলকাতার সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরির প্রাক্তন ডিরেকটর। ইন্ডিয়ান অ্যাকাদেমি অব ফরেনসিক সায়েন্স-এর সভাপতি।

ডঃ টিপলার সাহেবের পুনর্জন্ম ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা। তাঁর থিওরি মত এমন কম্প্যুটর ভবিষ্যতে তৈরি হবে, যে কম্প্যুটরকে একটি প্রাণীর তাবৎ উপাদানের ডিটেল ইনফরমেশন জানালে কম্প্যুটর প্রাণীটিকে ফের বানিয়ে দেবে। একটি প্রাণীর উপাদানের খুঁটিনাটি তথ্যসমূহ কে জানাবে? জানাবে ভবিষ্যতের একটি অত্যাধুনিক কম্প্যুটর? এ'ভাবেই 'ওমেগা পয়েন্ট'-এ মৃত্যুর পর একদিন আবার আপনি আমি জন্ম নেব আধুনিক কম্প্যুটরের দয়ায়।

ডঃ টিপলারের এজাতীয় তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের মাথায় গ্রহণযোগ্য করে ঢুকিয়ে দিতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম তড়িঘড়ি কাজে নেমে পড়েছে। 'দেশ' পত্রিকা '৯৫-এর কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় 'ভাললাগা বই' হিসেবে টিপলারের বইটি দশ দশটি পাতা জুড়ে প্রবল বিক্রমে বিরাজ করছে। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মন্তব্য, "ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল গ্যালিলিওর সময়ে তা বোধহয় শেষ হচ্ছে এত দিনে। শেষ হচ্ছে জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ফ্র্যাংক জে টিপলার-এর প্রচেষ্টায়।"

একটি ঘটনার দিকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ম্যুনিখ-এর ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিট্যুটের তরফ থেকে একটি সেমিনারে জ্যোতিঃপদার্থের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ডঃ টিপলারকে। আমন্ত্রণ জানানো ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার মাঝখানেই প্রকাশিত হয় 'দি ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটি' বইটি। বইয়ে বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য বাতিল করা হয় টিপলারকে জানানো বক্তৃতার আমন্ত্রণ। ফ্যাক্স পাঠিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, কল্পনায় তিনি এতটাই দূরে চলে গিয়ে এমন সব উদ্ভট বক্তব্য রেখেছেন, যাতে বস্তুত বিজ্ঞানের সুনামই নষ্ট হতে পারে।

ঈশ্বর-পরলোক-নিয়তি চর্চায় মগ্ন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে দেশীয় বিজ্ঞান সংস্থাগুলো কবে এমন দৃঢ় ঋজু পদক্ষেপ নেবে ? কবে এইসব বিজ্ঞান-পেশার বিজ্ঞান-বিরোধী মানুষগুলো বয়কটের সম্মুখীন হবেন ? গা শোঁকাশুঁকি বন্ধ করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসার মত সৎ বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ কি আমরা অদূর ভবিষ্যতে পাব না ?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী. ওয়েনবার্গ তাঁর 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিট্স্'-এ লিখেছেন, "মানুষ এ বিশ্বাসকে কিছুতেই ঠেলে দিতে পারে না, এই বিশ্বের সঙ্গে তার একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। মানতে চায় না, তার অস্তিত্ব মোটামুটি কতগুলো আকস্মিক ঘটনার পরিণতি। এই আকস্মিক ঘটনাগুলোর সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের তিন মিনিটের মধ্যে। ..... এই পৃথিবী বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য একটা ক্ষুদ্রাংশ, এটা মানা মানুষের পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। ..... এই বিশ্ব একদিন বিলীন হবে অসহনীয় তাপে কিংবা সীমাহীন শীতলতায়—এটা মেনে নেওয়া মানুষের পক্ষে আরও কষ্টকর। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যতই বোধগম্য হয়, ততই উদ্দেশ্যহীন মনে হয় তাকে।"

ওয়েনবার্গ যখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাবকে উদ্দেশ্যহীন বলছেন তখন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক জন ব্যারো টিপলারের মতই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষের আবির্ভাবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষের আবির্ভাবের জন্যই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। এই প্রস্তুতি-পর্ব ছিল সৃষ্টিকর্তার মর্জিমাফিক। তাঁর মতে—ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বকে বাদ দিয়ে বিশ্বতত্ত্বকে কখনই জানা সম্ভব নয়!

স্টিফেন হকিং বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও মাঝে-মধ্যে বিজ্ঞানকে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরকে কাছে টেনে নেন। দ্বিতীয় বিয়েটাও সেরেছেন চার্চে গিয়ে ঈশ্বর ও ঈশ্বর পুত্রকে সাক্ষী রেখে। তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থণা করে। বাঁচোয়া, হকিংকে বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষিত সমাজ শ্রদ্ধা করেন তাঁর বিজ্ঞান চর্চার জন্য, ঈশ্বর ও ধর্ম চর্চার জন্য নয়!

হকিং তাঁর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে লিখেছেন, "ভগবান আমাদের মত প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এভাবে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

না, হকিং বা ঈশ্বর বিশ্বাসী কোনও বিজ্ঞানীর অন্ধ বিশ্বাসই প্রমাণ করে না—ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শুধু এটুকুই প্রমাণ করে, তাঁরা বিজ্ঞানী হলেও মাঝে-মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাসে নতজানু।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় মাপের বিজ্ঞানী পল ডেভিস মাঝে-মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে সাময়িক ছুটি দিয়ে ভাবনার পাল তুলে ভেসে যান অধ্যাত্মিক জগতের কাছাকাছি। তিনি 'গড অ্যান্ড দি নিউ ফিজিক্স' গ্রন্থে লিখছেন, "বিশ্ব

একটি মন ঃ যে নিজেকে দেখছে ও একই সঙ্গে নিজেকে তৈরি করছে। আমাদের ব্যক্তিগত 'মন' বা 'চেতনা'কে বিশ্বব্যাপী মনের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন কিছু দ্বীপ বলে ভাবা যেতে পারে। (প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এখানে **'ভাবা যেতে পারে'** কথাটির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। 'ভাবা যেতে পারে' কথাটি আরও একটি ইঙ্গিত বহন করে—'না-ও ভাবা যেতে পারে'।) এই ভাবনা স্মরণ করিয়ে দেয় অতীন্দ্রিয়বাদের সেই ধারণাকে—ঈশ্বর বিভিন্ন খণ্ডিত ব্যক্তি-মনের সমষ্টিস্বরূপ। অধ্যাত্মিক প্রগতির উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হলে মানুষের মন তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সেই অখণ্ড-মনে লীন হয়ে যায়।"

অধ্যাত্মবাদীদের 'আত্মা-পরমাত্মা' চিন্তার সঙ্গে পল ডেভিসের চিন্তার সাদৃশ্য থাকায় অধ্যাত্মবাদীরা আনন্দে উদ্বেল, যেন এই সাদৃশ্য অধ্যাত্মবাদকে বিজ্ঞান'-এর শিলমোহর দেবে। পরিবর্তে পল ডেভিসের এ-জাতীয় কল্পনা নির্ভর চিন্তা তাঁকে 'ধার্মিক-বিজ্ঞানী' হিসেবে চিহ্নিত করছে মাত্র।

আর এক ঈশ্বর ভক্ত বিজ্ঞানী ক্যাফাটস পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হলেও ঈশ্বর চিন্তায় পল ডেভিসের কাছাকাছি তাঁর অবস্থান। ক্যাফাটস তাঁর 'দি কনসাস ইউনিভার্স' গ্রন্থে লিখছেন, "যদিও আমরা আমাদের বোধের গভীরে 'সমগ্র'-এর অন্তর্নিহিত ঐক্যকে বুঝতে পারি, বা অনুভব করতে পারি [অর্থাৎ, লেখক ও তাঁর সমমানসিকতার মানুষরা অনুভব করতে পারেন, তাঁদের আত্মা পরমাত্মারই অংশ। এই 'আত্মা-পরমাত্মা' ব্যাপারটা তাঁদের কাছে শুধুমাত্র মানসিকভাবে অনুভবের বিষয়। এমনই অনুভবের মধ্য দিয়েই মানসিক কারণে কত যে শারীরিক অসুখ হয়, অলীক-দর্শন, অলীক-শ্রবণ ইত্যাদি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, শুধু এই নিয়েই একটা বড় বই লিখে ফেলা যায়। এবং লেখার ইচ্ছেও অবশ্য রয়েছে।] কিন্তু বিজ্ঞানে শুধুমাত্র বিভিন্ন 'অংশ'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করা সম্ভব। অবিভাজ্য-পূর্ণ যা থেকে অংশের জন্ম, সেই পূর্ণ সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না [পূর্ণ = পরমাত্মা সম্পর্কে অনুভব ছাড়া কোনও প্রমাণই যখন নেই, তখন বিজ্ঞান 'পূর্ণ' সম্পর্কে কিছু বলবে—প্রত্যাশা রাখাটাই পাগলামী।]

ক্যাফাটস-এর এই উক্তিকে টপ্ করে লুফে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর ৯৬তম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ক্যাফাটস-এর উল্লিখিত অংশটি তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা হিসেবে লিখছে, "যাঁরা বেদান্ত পড়েছেন বা 'কথামৃত' পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করবেন যে, বেদান্তের ব্রহ্ম বর্ণনা ("সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম") বা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ লোককে বোঝাবার জন্য যেভাবে ব্রহ্মের কথা বলেছেন ("ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত, ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।"), তার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্‌দের 'পূর্ণ'-এর বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।"

আর এক পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপরা 'দি টাও অফ ফিজিক্স' গ্রন্থে পরমাণুর নড়া-চড়া বা কম্পনের মধ্যে নটরাজের নৃত্যকে অনুভব করার

কথা জানালেন (এ সেই মেঘের মধ্যে বাঘ, নৌকো, মানুষের মুখ ইত্যাদিকে অনুভব করার মত ব্যাপার।))।

বিজ্ঞান পেশার সঙ্গে যুক্ত যে সব বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি দূরে সরে গিয়ে ঈশ্বর অস্তিত্বের পক্ষে উল্টো-পাল্টা বক্তব্য রাখেন, তাঁদের সম্পর্কে আমরা ম্যুনিখ-এর মাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটের সেই কথার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি—কল্পনায় আপনারা বিজ্ঞানের থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়ে এমন সব উদ্ভট বক্তব্য রেখেছেন, যাতে শুধুমাত্র আপনাদের সুনাম নয়, বিজ্ঞানের সুনামও নষ্ট হচ্ছে।

ধর্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বেজায় রকম সংখ্যালঘু, তবু প্রচারে বিশাল

এখানে অবশ্য মূল প্রসঙ্গ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের সুনামের নয়। মূল প্রসঙ্গ বা সমস্যা অন্য জায়গায়। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা একটু ভাবুন তো, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য যখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি মানুষ যখন প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে না (এনসাইক্লোপিডিয়ার ৯০ দশকের যে কোনও সংস্করণে চোখ বোলালেই এই বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পারবেন), ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা যখন প্রচণ্ড রকম সংখ্যালঘু, তখন আঙুলে গোনা কিছু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পক্ষে করা মন্তব্য বা বক্তব্যকে বিশাল করে প্রচার করা হচ্ছে কেন? পাশ্চাত্যে ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেমন, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে হাতের কাছে না থাকলেও আছে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আইনস্টাইনোত্তর যুগের অন্যতম সবচেয়ে খ্যাতিমান নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গের একটি মন্তব্যঃ

"খুব কম বিজ্ঞানীই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতি মনোযোগ দেন। আমি দু'জন জেনারেল রিলেটিভিস্টকে জানি, যাঁরা ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথেলিক ; জনাকয়েক তত্ত্বীয় পদার্থবিদ যাঁরা ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস-টিশ্বাস করেন ; একজন পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ যিনি খ্রিস্টধর্মে নতুনভাবে দীক্ষিত হয়েছেন ; একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ যিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ; এবং একজন গাণিতিক পদার্থবিদ যিনি ইংলন্ডের চার্চ থেকে পবিত্র আদেশ নিয়েছেন। সন্দেহ নেই, এমন ধার্মিক বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই আছেন, যাঁদের আমি চিনি না বা যাঁরা নিজের মত নিজের কাছেই রাখেন। তবু নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আমি যতদূর বলতে পারি, আজকালকার বেশিরভাগ পদার্থবিদই একজন বলিয়ে-কইয়ে নাস্তিক হিসেবে নাম কেনার খাতিরেও ধর্ম নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান না।" [ড্রিমস্ অফ এ ফাইনাল থিয়োরি, ভিন্টেজ, ১৯৯৩ : পৃষ্ঠা ২০৫]

বলাই বাহুল্য, স্টিফেন ভাইনবার্গের পরিচিত বিজ্ঞানীদের বৃত্তটা স্বাভাবিকভাবেই সাংঘাতিক রকমের বড় এবং পৃথিবী জুড়ে। প্রসঙ্গত এটুকুও জানিয়ে রাখা ভাল, তাঁর পরিচিত বিজ্ঞানীদের ধর্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। জানার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি কাজে লাগাতেন সাধারণভাবে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লাঞ্চ টেবিলের আড্ডা বা চায়ের আড্ডা। স্টিফেন ভাইনবার্গের নিজের কথায়, "এইসব নিয়ে [অর্থাৎ ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে] মাথা ঘামানোর ব্যাপারে আমি বোধহয় আজকের বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রমী" [ঐ বইয়ের ঐ পৃষ্ঠাতেই]।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একবার ভাবুন তো, অতি সাম্প্রতিককালে কী এমন ঘটল যে প্রচার-মাধ্যম ও তাঁদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের বক্তব্যগুলোকে বার বার বিশাল করে প্রচারের আলোকে আনতে লাগল? এমন কী ঘটল যে এ'দেশের ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের খুঁজে বের করে ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে তাঁদের যুক্তিকে লাগাতারভাবে হাজির করতে শুরু করেছে প্রচার মাধ্যমগুলো? এ'দেশের নাক উঁচু পাক্ষিক পত্রিকা, সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক এ' জাতীয় প্রচারকে এমনই তুঙ্গে নিয়ে গেছে যে তার প্রভাবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধরা লেখকরা সাধারণভাবে গ্রহরত্নধারী, ঈশ্বরের নামে কপালে হাত ঠেকানো ডাক্তার বা বিজ্ঞানীদের প্রবল উপস্থিতির কথা তাঁদের লেখায় প্রায়ই নিয়ে আসছেন। বাস্তব চিত্রটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ' দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা সংখ্যালঘু। আমার কাছে নির্ভরযোগ্য কোনও পরিসংখ্যান নেই। তবে আছে অভিজ্ঞতা। আন্দোলনের সূত্রে বিজ্ঞানীমহলে পরিচিতির যে বৃত্ত, সেখানে দেখেছি, ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞান পেশার মানুষরা স্পষ্টতই সংখ্যালঘু। কী এমন হল যে, ঈশ্বর বিশ্বাসের পিঠে বিজ্ঞানের পাখা জুড়ে দিতে অতিসাম্প্রতিককালে প্রবলভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মধ্যম ও ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা? রাজনৈতিক দলগুলোর কেউ সরাসরি ধর্মের জিগির তুলছে, কেউবা ধর্মস্থান ও ধর্মগুরুদের আপ্লুত শ্রদ্ধা নিবেদন করে জনমানসে ধর্মের সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আবার কেউবা একই সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাস, নিয়তি বিশ্বাসকে শোষণের অহিংস কিন্তু প্রবল কার্যকর হাতিয়ার মনে করার পাশাপাশি মানুষের এইসব অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'রা' কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে 'বিচ্ছিন্নতা' নামক জুজুর ভয় দেখিয়ে। নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলো তাদের এই ধরনের আচরণের মধ্য দিয়ে এ' কথাই প্রমাণ করে—তারা শেষ পর্যন্ত ধনকুবের শোষকদেরই সহযোগী।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতের তথা পৃথিবীর সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশে একটি বিশাল ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে চলেছে--আধুনিক যুক্তিবাদের অগ্রগমন। কোনও সন্দেহ নেই, আধুনিক যুক্তিবাদের আগ্রাসন ঠেকাতে যে বহুতর পরিকল্পনা দ্রুত গড়ে উঠছে, এ'জাতীয় কর্মকাণ্ড সেই.বৃহৎ পরিকল্পনারই অংশ।

অধ্যায় ঃ ছয়

ঈশ্বর বিশ্বাস : আপ্লুত বিজ্ঞানী ও ভুরু কোঁচকানো বিজ্ঞানী

কিছু বাঙালি বিজ্ঞানী ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বর মানার পক্ষে তাঁদের যুক্তিগুলো এই অধ্যায়ে হাজির করব। বিজ্ঞানীদের এইসব যুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার দায়িত্ব নিয়েছিল বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'যুগান্তর'। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, প্রথম কিস্তির লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালের 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস'—এ অর্থাৎ ১ মার্চ।

আমরা অবশ্য এখানে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের যুক্তিগুলোকে হাজির করেই ক্ষান্ত হব না, বিশ্লেষণ করে দেখব—যুক্তিগুলো বাস্তবিকই কতটা যুক্তি।

এক ঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, প্রাক্তন উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ইংলন্ডের রয়্যাল ইন্সটিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ফেলো। ভারতে নামী-দামি রসায়নবিজ্ঞানী যাঁরা আছেন, তাঁদেরই একজন।

মার্কস-এঙ্গেলস্ নিয়ে প্রচুর পড়াশুনো করেছেন এককালে। বর্তমানে মার্কসবাদের চেয়েও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজিমের প্রবক্তা) মানবতা বিকাশের পথনির্দেশকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন, এবং সে কথা সোচ্চারে প্রচারও করেন। ১৯৮৯-এ পৌঁছে মণীন্দ্রমোহন জানালেন, "বস্তুবাদে বা জড়বাদে মানুষের মুক্তি নেই! নাস্তিকতা মানুষকে শান্তি দিতে পারে না।"

তাহলে শোষণ থেকে মুক্তি পেতে, অসাম্যের সমাজ কাঠামোর অনিবার্য ফল যে 'অশান্তি', তাকে বিদায় দিয়ে 'শান্তি'কে ফিরিয়ে আনতে কী করতে

হবে ? সে পথনির্দেশও দিয়েছেন মনীন্দ্রমোহন, "আধ্যাত্মিক পথেই মানুষের মুক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাসই মানুষের মনের শান্তি।"

মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী অধ্যাপক মানুষ। তাঁর পক্ষে শোভা পায় না, রাজনৈতিক নেতাদের মত, কিচ্ছুটি না জেনেও সে বিষয়ে জনগণকে প্রচুর জ্ঞান দেওয়ার প্রবণতা। অতএব, আশা করছি তিনি ভালমত জেনে বুঝেই বলছেন— অধ্যাত্মবাদ নিয়ে চর্চা করলে মানুষের মুক্তি আসবে। তিনি নিশ্চয়ই 'অধ্যাত্মবাদ' কথাটির অর্থ বিষয়েও ওয়াকিবহাল। অর্থাৎ তিনি জানেন, 'অধ্যাত্মবাদ' মানে 'আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ', যার হাত ধরা-ধরি করে উঠে আসে পরমাত্মা-ঈশ্বর-আল্লা ইত্যাদিরা। উঠে আসে পরলোক, ভূত, জীন, পরলোকের বিচার ইত্যাদি আরও কত কী ! অবিনশ্বর আত্মার সুতো ধরে টান মারলেই এ'সবই এক এক করে সারি-সারি উঠে আসে। আত্মার অমরত্বকে প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছে 'অধ্যাত্মবাদ'। আত্মার অমরত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্নেরই অবকাশ নেই অধ্যাত্মবাদে। কারণ, আত্মা অমরত্ব হারালে অধ্যাত্মবাদের গোটা তত্ত্বটাই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

'আত্মা' কাকে বলে ? অর্থাৎ, 'আত্মা'র সংজ্ঞা কী ? আত্মার সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বহু মতের নির্যাস থেকে বেরিয়ে আসে প্রধান দু'টি মত।

এক'ঃ 'চিন্তা', 'চেতনা,' 'চৈতন্য' বা 'মন'ই আত্মা। দুই ঃ 'চিন্তা', 'চেতনা', 'চৈতন্য' বা 'মন' আত্মারই কাজ-কর্মের ফল।

বিজ্ঞান পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—মন, চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য বলে আমরা যাকে চিহ্নিত করি, তা হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কাজ-কর্মের ফল।

মানুষের মৃত্যুর পর এক সময় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বাস্তব অস্তিত্বই বিলীন হতে বাধ্য। কারণ, মৃত্যুর পর সাধারণভাবে দেহও বিলীন হয় পুড়ে ছাই হয়ে কবরের মাটিতে মিশে গিয়ে, অথবা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে পচে-গলে-জন্তুর পেটে গিয়ে। দেহ বিলীনের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও বিলীন হয়। এরপর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নেই, কিন্তু তার কাজ-কর্ম আছে এবং কাজ-কর্মের ফল হিসেবে মনও আছে—এমনটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব।

অধ্যাত্মবাদীদের 'আত্মা'র সংজ্ঞা নিয়ে যে দ্বিতীয় মতটি রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন হল আত্মারই কাজ-কর্মের ফল। এই সংজ্ঞাটিকে মেনে নিলে বলতে হয়—আত্মা হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ।

মানুষ মরণশীল। গোটা মানুষটাই যখন মরণশীল, তখন তার দেহাংশও যুক্তিগতভাবে মরণশীল হতে বাধ্য। অতএব, আমরা এরপর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি—মানুষের দেহাংশ মস্তিষ্কস্নায়ুকোষও মরণশীল। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ মরণশীল হলে 'আত্মা'ও মরণশীল হতে বাধ্য।

'আত্মা' না বাঁচলে 'অধ্যাত্মবাদ'ও যে বাঁচে না। যে অধ্যাত্মবাদ দাঁড়িয়ে আছে 'আত্মা অমর' এই অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিতের উপর। সেই মিথ্যের এক 'বাদ' বা 'ism'-এর পথ ধরে কখনই মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। আসতে পারে শুধু সর্বনাশ (আত্মা ও অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা পড়তে পারেন, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর ৪র্থ-খণ্ড)।

মণীন্দ্রবাবু, বাস্তবিকই আপনি কি মনে করেন, যে মায়ের চোখের সামনে ছেলের দু'চোখ উপড়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের পোষা খুনেরা, সেই মায়ের মনের শান্তি ফেরাতে হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির চেয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ অনেক বেশি ফলপ্রসূ দাওয়াই ?

মণীন্দ্রবাবু, আপনি কি সত্যিই মনে করেন, যে সন্তানের চোখের সামনে মা'কে সম্পূর্ণ নগ্ন করে প্রকাশ্য রাজপথে পেটাই করেছে মহল্লার রাজনৈতিক মস্তানরা, সেই সন্তানের দাউ দাউ অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ? মস্তানদের কঠোর শাস্তি ও রাজনৈতিক সততার জন্য দাবি তোলা, দাবি আদায়ে শেষতক যাওয়ার চেষ্টায় কি শান্তি নেই ? অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে কি অশান্ত মনে শান্তি আসে না ?

যে ডাক্তারের অবহেলায় শিশু পাপড়ির মৃত্যু হয়েছিল, সেই ডাক্তারদের অকর্মণ্যতা, অবহেলা ও হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে পাপড়ির বাবা-মা দরবার করেছেন মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে। আইনের লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পেরেছেন। পেরেছেন তাঁকে জেলে ঢোকাতে। পাপড়ির বাবা-মা ডাক্তারটির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে জয়ী হয়ে যতটুকু শান্তি পেয়েছিলেন, লড়াই না চালিয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে ততটুকু কি পেতেন ? তাঁদের এই লড়াই এক দিকে যেমন ডাক্তারদের স্বেচ্ছাচারী অবহেলাকে কিছুটা হলেও সংযত করেছে, তেমনই অবহেলিত রোগীদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। ফলে ভবিষ্যতে চিকিৎসকের অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু ও তার দরুন অশান্তির কিছু কারণ নিশ্চয়ই দূর করা গেছে। চিকিৎসকদের দুর্নীতিকে তাড়াতে এবং সেই দুর্নীতির কারণে চেপে বসা অশান্তিকে তাড়াতে সামাজিকভাবেই লড়াই চালাতে হবে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে অশান্তির সঙ্গে সহাবস্থানকেও মেনে নিতে হবে।

মণীন্দ্রবাবু, সত্যিই কি আপনি মনে করেন, যে বাবা-মা'র চোখের সামনে কিশোরী কন্যা দলবদ্ধ পুরুষদের কামনার শিকার হয়, সে বাবা-মা ধর্ষণকারী দলবদ্ধ পশুদের বুক ফুলিয়ে শিস্ দিয়ে মহল্লায় টহল দিতে দেখার পরও প্রতিরোধের পথে না গিয়ে, ঠাকুর ঘরে দরজা বন্ধ করে চোখের জলে ভাসে, সে-ই পায় পরম শান্তি, যার কোনও বিকল্প নেই ?

মণীন্দ্রবাবু, বন্ধ কারখানার শ্রমিক দেখেছেন ? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চিমনি থেকে ধোঁয়া না ওঠা কারখানার শ্রমিক দেখেছেন ? ওদের

ঘরে কোনও দিন পা রেখেছেন ? দেখেছেন অসংখ্য জঞ্জালের মাঝে জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল, খুক্-খুক্ কাশি ? এরাই তো সপরিবারে শেষ ডিনার খেতে বসে ফলিডল কি বেগন স্প্রে সাজিয়ে। এরাই পরম অবহেলায় নদীর স্রোতে একে একে ছুঁড়ে দেয় রক্তের সম্পর্কগুলো। রেল লাইনে সারি-সারি গলা পেতে অপেক্ষা করে মৃত্যুর। ঈশ্বর কখনই এদের খিদেয় ভাত-রুটির বিকল্প হয়ে ওঠে না ; তাই চিরশান্তি পেতে বার বার এরা ঈশ্বরের চেয়ে মৃত্যুকেই কাম্য জ্ঞান করেছে।

মণীন্দ্রবাবু, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন, এই দুর্নীতিতে ভরা অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখেও মানুষের মনে শান্তি আনা সম্ভব ? স্রেফ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে দুঃখ ভোলার মধ্য দিয়েই সম্ভব ?

এই দুর্নীতিতে ভরা অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখেও মানুষের মনে শান্তি আনা সম্ভব ? স্রেফ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে দুঃখ ভোলার মধ্য দিয়েই সম্ভব ?

তাত্ত্বিকভাবেই তা সম্ভব নয়। কারণ, অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা থাকলে বঞ্চিত মানুষদের দুঃখ থাকবেই। মণীন্দ্রবাবু, এই সহজ-সরল সত্যকে আপনি কেন ভুলে থাকতে চাইছেন ? আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনার এই ভুলের পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে ? এর ফলে দারিদ্র্যের নগ্ন লাঞ্ছনায় নুয়ে পড়া বহু মানুষ তাদের উপর নেমে আসা প্রতিটি বঞ্চনাকে 'ভাগ্যের লিখন' ধরে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকবে।

মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী ? তাঁরই কথায়, "ঈশ্বর আছেন সেই উপলব্ধি আমার হয়েছে। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, কী করে ? তার উত্তরে আমি বলব, এই যে জগৎ চলছে, এ তো শুধু শুধু নয়—কতকগুলো নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু কে সেই নিয়মগুলো তৈরি করেছেন ? এই মহাবিশ্বে, প্রত্যেকেই আপন পথে আপন আপন নিয়ম মেনে ঘুরে চলেছে। নিয়ম না মানলে কী দারুণ সঙ্কট সৃষ্টি হত ভাবতেও পারি না।...তাহলে একটা শক্তি নিশ্চয় আছে যে শক্তি এই জিনিস ঘটাচ্ছে। বিশ্বজগতের সমস্ত নিয়ম তার সৃষ্টি, সে-ই সবকিছু চালাচ্ছে। মানুষের সাধ্য নেই তাকে অতিক্রম করে।"

অর্থাৎ, মণীন্দ্রবাবুর বিশ্বাস মত, ঈশ্বর একটা শক্তি ; যে প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা শক্তি। ঘুরিয়ে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিই তাঁর ঈশ্বর।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর জীবনে কখনও কি এমন কিছু ঘটেছে, যাতে তাঁর মনে হয়েছে—ঈশ্বর আছেন, এবং এ তারই প্রমাণ ?

এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচক্রবর্তীর বক্তব্য, "হ্যাঁ,...আমার মনে খুব ইচ্ছা ছিল, ইংল্যান্ডের লিভারপুলে গিয়ে প্রফেসর টি. পি. হিলডিচের কাছে পি-এইচ. ডি. করব। প্রফেসর হিলডিচ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রিতে এক দিকপাল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রিতে, বিশেষ করে গ্লিসারাইড কেমিস্ট্রি অর্থাৎ তৈল রসায়নে এত বড়ো অথরিটি এখনও পর্যন্ত আর একজনও হননি। আমি চিঠি লিখলাম প্রফেসার হিলডিচকে। পত্রপাঠ তিনি আমাকে জানালেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, আমার কাছে এখন অনেক ছাত্র, বেশ কয়েক বছর আমার কাছে জায়গা হবে না।' তখন মাস্টারমশাই প্রফেসর বীরেশ গুহ চিঠি লিখলেন প্রফেসর হিলডিচকে। পরের ডাকেই আমার কাছে চিঠি এল, 'চলে এস যত তাড়াতাড়ি পার।' বলুন, এটা ঈশ্বরের দান ছাড়া আর কী!"

ভাল! অধ্যাপক চক্রবর্তীর কথায় আমরা জানতে পারলাম, প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা শক্তি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজের বাইরে কাউকে কাউকে দিয়ে চিঠি-টিঠিও লিখিয়ে থাকে, কারও বা পি-এইচ. ডি. করার ব্যবস্থা করে দেয়।

অধ্যাপক চক্রবর্তী হিলডিচের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে তাঁর মাস্টারমশাই বীরেশ গুহর কাছে অনুরোধ করেছিলেন কেন, হিলডিচকে চিঠি লেখার জন্য? এ তো রোগীকে একই সঙ্গে ঠাকুরের চরণামৃত ও ওষুধ খাওয়াবার মতই এক ঘটনা, অসুখ সারলে চরণামৃতের গুণ!

ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ করতে অধ্যাপক চক্রবর্তীর হাজির করা পি-এইচ.ডি.-কাহিনী বলেছিলাম আমার বান্ধবী মিস্টুনকে। শুনে মিস্টুন বলেছিলেন, "উনি তো ঈশ্বর আছেন-এর পক্ষে একটা প্রমাণ হাজির করেছেন, নেই-এর পক্ষে অমন লক্ষ-কোটি প্রমাণ আমি হাজির করতে পারি। একবার ভাবতো, ভারতের কয়েক লক্ষ বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের প্রার্থনা পূরণ করতে কারখানার তালা কেন খুলছেন না ঈশ্বর? কেন ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়ে প্রার্থনা পূরণ করতে পারছে না ঈশ্বর? কেন সমস্ত প্রার্থনাকে ব্যর্থ করে রোগীরা মরছে? ঈশ্বর কি কোনও এইডস রোগীর প্রার্থনা পূরণ করে তাকে রোগ মুক্ত করতে পারবেন? পারবেন না; যতদিন পর্যন্ত না এইডসের ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন পারবেন না।"

ঈশ্বর কি কোনও এইডস রোগীর প্রার্থনা পূরণ করে তাকে রোগ মুক্ত করতে পারবেন? পারবেন না; যতদিন পর্যন্ত না এইডসের ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন পারবেন না।"

মিস্টুনের সওয়ালটা অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর জবাব প্রত্যাশায় এখানে তুলে দিলাম।

অধ্যাপক চক্রবর্তীকে একটা ঘটনা শোনাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। ভারতের বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের জবানীতেই বলি :

"যদি প্রশ্ন করো, ভগবান মানেন কি না, এককথায় তার উত্তর—না। যদি জিজ্ঞেস করো, কেন না—তাহলে একটা ঘটনার কথা বলি শোনো। আমার বয়স তখন বার-তের। মোহনবাগানের সঙ্গে একটা ইংরেজ টিমের খেলা। মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডেকে বলেছিলাম, মোহানবাগান যেন অন্তত একটা গোল করতে পারে। কিন্তু সেদিন আমাকে চোখের জলে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল—মোহনবাগান একটা গোলও করতে পারেনি, বরং তিনটে গোল খেয়েছিল। সেইদিনই বুঝেছিলাম, ভগবান-টগবান সব বাজে, গোল দিতে হলে নিজেদেরই দিতে হবে। বলতে পার, সেটা আমার জীবনের একটা turning point."

দুই : জগৎজীবন ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন বিভাগের শতবার্ষিকী অধ্যাপক। জীবরসায়নের ক্ষেত্রে যে সব বিজ্ঞানী ভারতে কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নামী বললে বোধহয় ভুল হবে না।

জগৎবাবু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তাঁর কাছে ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী? ঈশ্বর কি প্রকৃতি চালনাকারী একটা শক্তি? নিরাকার শক্তি? না কি, তাঁর আকার আছে?

এ'বিষয়ে জগৎবাবুর উত্তর ভারি কৌতূহল-উদ্দীপক!

"*সাকার ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না, ঈশ্বরকে আমি একটা ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা হিসেবে মানি*" [বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৭]

ওই বইয়েরই ৪০ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে :

"*জগৎবাবু কালীভক্ত। তাঁর মনে হয়, কালীর কালো রঙে মহাকাল এসে সংহত হয়েছে। কালীমূর্তি সামনে রেখে মনটাকে নিবদ্ধ করে তিনি শান্তি পান। প্রতি শনিবার বউবাজার ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি গিয়ে ধ্যানে বসেন।*"

জগৎবাবু যখন কালী ওরফে আদ্যাশক্তির ধ্যান করেন, তখন তাঁর অনুভূতি প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন :

"*আমি তখন সেই আদিশক্তিকে স্মরণ করি : আমার তখন মনে হয়, একটা স্যুপার পাওয়ার আমাকে চালনা করছে।*"

কোনওরকম ভাব-আবেশ হয় কি?

"*না। আমি তো সাধুসন্তদের মতো মাটি ছাড়িয়ে উপরে উঠতে পারিনি। এই মাটিতে বসেই আমি তখন মনে একটা শক্তি অনুভব করি।*"

জগৎবাবুর এই উত্তরগুলো থেকে আমরা জানতে পারলুম—

এক : তিনি সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। দুই : ঈশ্বর তাঁর কাছে

নিরাকার এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা। তিন ঃ তিনি কালীভক্ত। কালীতে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। চার ঃ ধ্যানে সাধুসন্তরা মাটি ছাড়িয়ে উপরে উঠতে পারেন।

জগৎবাবুর কর্মকাণ্ডের ভিতরই যেহেতু মস্তিষ্কের রসায়ন পড়ে, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা ছিল, তাঁর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে আজন্ম-লালিত বিশ্বাস স্থান পেলে পেতে পারে, কিন্তু স্ববিরোধী বিশ্বাস কখনই স্থান পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত ঘটনাই ঘটল! মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গোলমালেই কি এমনটা ঘটল? আর, সাধুদের ধ্যানে শূন্যে ভেসে থাকার ব্যাপারটা? অমনটা কি অনেকবারই ঘটতে দেখেছেন? না কি, না দেখে স্রেফ শোনা কথায় বিশ্বাস করে বসে আছেন?

(জগৎবাবুই সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। জগৎবাবুর কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, ধ্যানে শূন্যে ভাসে এমন সাধুর সাক্ষাৎ পেলে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির যে কোনও শাখায় যোগাযোগ করবেন। গ্যারান্টি দিচ্ছি, সেই তথাকথিত সাধুর বুজরুকি ফাঁস করে তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে আনব।)

নাকি না দেখে অন্ধ-বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ? আপনার জন্য দুঃখিত, জগৎবাবু। একই মস্তিষ্কে বিজ্ঞান-চিন্তা ও বিজ্ঞানবিরোধী-চিন্তার সহাবস্থানে দুঃখিত, এবং সেই সঙ্গে শঙ্কিত। আপনার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যতটা শঙ্কিত, তারচেয়েও বেশি শঙ্কিত, আপনি পেশায় বিজ্ঞানী হওয়ায় আপনার চিন্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে ভেবে।

তিন ঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের খয়রা প্রফেসর ছিলেন কুড়ি বছর। ১৯৮২ তে নিয়মতান্ত্রিক অবসর গ্রহণ। তবু নিয়মিত ক্লাশ নেন। ১৯৭৩-এ কলকাতা সাইন্স কলেজেই গড়ে তোলেন 'সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন দি কেমিস্ট্রি অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস'। প্রতিষ্ঠানটির কাজ—গাছগাছড়ার ভেষজমূল্য নিয়ে উন্নত পর্যায়ে গবেষণা চালানো। ১৯৭৫-এ ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। ওই বছরই পান 'পদ্মভূষণ'। রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য হন ১৯৮২ সালে।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঈশ্বর আসলে কী? তাঁরই কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে চলছে, গ্রহ-উপগ্রহ-তারকারা ঠিকমতো ঘুরছে—দিন হচ্ছে, রাত্রি হচ্ছে; ভোর হতেই পাখিরা ডেকে উঠছে, আবার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে যাচ্ছে; মানুষ জন্মাচ্ছে এবং যে জন্মাচ্ছে সে মারা যাচ্ছে—গোটা জগৎ যে একটা নিয়মবন্ধনে চলছে, এর নিশ্চয় একজন কর্তা আছেন। কর্তা ছাড়া তো কর্ম হয় না! বিশ্বনিয়ন্ত্রণের এই যে মহাকর্তা, তিনিই ঈশ্বর।"

শুধু অসীমা চট্টোপাধ্যায় নন, অনেক বিজ্ঞান-পেশার ব্যক্তিই বলেন—এই

যে বিশ্বের সৃষ্টি, এই যে নিয়মবন্ধনে চলা, এসবের নিশ্চয় একজন কর্তা আছেন, একজন স্রষ্টা আছেন।

এ'জাতীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে 'ইন্সটিটিউশন অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্স (ইন্ডিয়া)-র ফেলো, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ডঃ জয়ন্ত বসু'র স্পষ্ট বক্তব্য, "তাই যদি বলেন, আমিও পালটা প্রশ্ন করতে পারি, তাহলে সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে ? তাঁরও তো একজন স্রষ্টা থাকা উচিত, কারণ তিনিও তো সৃষ্টি হয়েছেন।"

এর উত্তরে কোনও কোনও বিজ্ঞানী 'রা' কাটেন না। কেউ বা বলেন, "ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েছেন।"

জয়ন্তবাবুর পাল্টা বক্তব্য, "বেশ, ধরে নিলাম ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, আপনা থেকে জন্মেছেন, তাহলে এই কথাটা প্রকৃতির বেলায় বলি না কেন—যার মধ্যে এই জগৎ আছে ? প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভু বলতে আপত্তি কোথায় ? আমাকে যদি সেইখানেই যেতে হয়, শেষ উত্তর যদি আমি দিতে না পারি তাহলে প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভু বলতে দোষ কী ?"

অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের ঈশ্বর, অর্থাৎ মহাবিশ্বের নিয়ন্তক শক্তি কিছু কিছু মানুষকে 'মেসেজ' পাঠান। অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "আমি মনে করি, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের মতো একটা মেসেজ আসে। রিসিভার ভালো হলে সেই মেসেজ ধরা যায়। আমি যদি ভালো রিসিভার হই তাহলে সেই মেসেজ আমি ধরতে পারি। তবে তার জন্য সাধনা দরকার।"

যাক, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের সাধনায় একটা দারুণ তথ্য জানা গেল, একটা শক্তি, যা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই শক্তি আবার বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষদের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় কথাও বলে। অর্থাৎ, শক্তির স্বর-যন্ত্র আছে ! দেহ নেই, কিন্তু স্বর-যন্ত্র আছে—ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে দারুণ গবেষণার বিষয় !

এ'বার দেখা যাক, কী ধরনের সাধনার প্রয়োজন হয় প্রকৃতির নিয়ন্তক শক্তির মেসেজ ধরতে ?

উত্তরে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আমি আমার বাবা ভাই বোন স্বামী সন্তান ছাত্রছাত্রী পাড়াপ্রতিবেশী সকলের প্রতি কর্তব্য করেছি ; আমি জ্ঞানত সৎপথে চলেছি, সরলভাবে জীবন যাপন করেছি, কখনও কারও ক্ষতি চিন্তা করিনি, কারও প্রতি হিংসা করিনি, কারও ভাল হলে আনন্দ হয়েছে, যথাসাধ্য মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছি। পুজো পাঠ স্তব সবই করি। দুবেলাই করি। বার বছর সত্যনারায়ণের পুজো করেছি। এছাড়া বাঙালীর ষষ্ঠী অষ্টমী এসব তো আছেই।"

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, বিশ্বের নিয়ন্ত্রক শক্তি, অর্থাৎ কিনা ঈশ্বরের কাছ থেকে নানা উপদেশ, পথ নির্দেশ ইত্যাদি

পাওয়া যায়। তবে তা পেতে গেলে আচরণগত কিছু বিধি পালন, পুজো, স্তব, মন্ত্র-টন্ত্র পাঠ ইত্যাদি করতে হয়। মন্ত্রশক্তির সাহায্যে ঈশ্বর নামক পরমশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, "আপনার মনে যদি পবিত্রতা আসে—নির্জনে শুদ্ধচিত্তে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আপনি যদি তাঁর প্রতি মনঃসংযোগ করতে পারেন তাহলে তাঁকে আপনি দেখতেও পারেন।"

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, "শুধু তা-ই নয়, যেসব প্রিয়জন অনেকদিন চলে গেছেন, এই পৃথিবীতেই নেই—খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে পারলে, খুব মনঃসংযোগ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারলে—তাঁদেরও দেখা যায়। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় যদি আরও একটি স্টাডি সেন্টার খোলেন, সেই কেন্দ্রের গবেষণার বিষয়বস্তু হবে—বিশ্ব নিয়ন্তক শক্তির পথ-নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত রিসিভার হয়ে ওঠার উপায় : দেহ বা দেহাংশ স্বর-যন্ত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় কথা বলার বিজ্ঞান ; বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পদ্ধতি ; বিশ্বনিয়ন্তক শক্তির উপর মন্ত্রের প্রভাব ; বিশুদ্ধ সত্যনারায়ণ ব্রতপালন পদ্ধতি ; বিভিন্ন ব্রতপালন ও পুজোআচ্চার দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তক শক্তিকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ; ঈশ্বর দর্শন ও মৃত প্রিয়জন ও বিখ্যাতজনদের দর্শনলাভের পদ্ধতি ইত্যাদি।

না, না ; শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে একটুও ঠাট্টা করছি না। বরং আন্তরিকভাবেই চাইছি, গাছগাছড়ার ভেষজমূল্য নিয়ে গবেষণা মূলতুবি রেখে এই নব-অধ্যাত্মিক গবেষণাকেন্দ্রের কর্ণধার হয়ে বসুন। তাতে আমাদের সমাজের বিশাল লাভ হবে। ক্যানসার থেকে এইডস যে কোনও রোগ সারাবার ওষুধ তৈরির ফর্মুলা ঈশ্বরের কাছ থেকে জেনে নিলেই যখন চলবে, তখন কোনও ওষুধ নিয়ে গবেষণা চালাবার নামে পৃথিবী জুড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ নেহাতই অর্থ ও শ্রমের অপচয় নয় কি ?

যাঁরা আমার এতদূর কথা শুনে ঠোঁটের ফাঁকে হাসছেন, তাঁদের হাসি বন্ধ করে দেওয়ার মত কথা শোনাই। শ্রমতী চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানেই আছে, তিনি এ'ভাবেই নির্দেশ পেয়ে সুষনিশাক আর জটামাংসী দিয়ে মৃগীরোগের একটা দারুণ ওষুধ তৈরি করেছিলেন।

দুষ্টেরা বলতে পারেন, কোনও কিছু নিয়ে গভীরভাবে চর্চা বা গবেষণা চালাবার সময় সেই সংক্রান্ত বহু চিন্তা উঠে আসাটাই স্বাভাবিক। এমনই উঠে আসা চিন্তাকেই শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বার বার 'মেসেজ' বলে ভুল করেছেন।

দুষ্টদের এমন কথায় নব-অধ্যাত্মিক গবেষণা কেন্দ্রের কাজ বন্ধ করা যায় না। বরং, এমন গবেষণা সাকসেসফুলি চালাতে পারলে আর কোনও বিষয়ে

কোনও গবেষণা চালাবারই প্রয়োজন থাকবে না। মা ভৈ! পৃথিবীতে অধ্যাত্মবাদ নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার ভবিষ্যৎ চিত্রের কথা চিন্তা করে এখনি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!

চার ঃ দিলীপকুমার সিংহ গণিতজ্ঞ। ফলিত গণিত তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার বিষয়। ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, সোশ্যাল, এনভায়রনমেন্টাল ইত্যাদি বহু বিজ্ঞান শাখার গাণিতিক মডেল তিনি তৈরি করেছেন। দেশ-বিদেশের বহু সোসাইটি ও আকাদেমির তিনি ফেলো। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

সিংহমশাই ঈশ্বর প্রসঙ্গে সিংহবিক্রমে প্রশ্ন তুলেছেন, "কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কোন বিজ্ঞানী বলতে পারেন, তিনি ভগবান মানেন না? বিজ্ঞান তো কোনোকিছু অবিশ্বাস করতে বলে না।"

ভালো, ভালো, খুব ভালো। আশা করি সিংহমশাই কথায় ও কাজে এক। এবং তিনি কুমড়োপটাশ, হাঁসজারু, বকচ্ছপ, টিয়ামুখো গিরগিটি, রামগরুড়ের ছানা, শাকচুন্নি থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া পর্যন্ত সব কিছুই মানেন। কারণ, সত্যিই তো কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলবেন, 'আমি ওসব মানি না'। বিজ্ঞান তো কোনও কিছুকেই অবিশ্বাস করতে বলে না।

গণিতবিজ্ঞানী দিলীপবাবুর কথায়, "যাঁরা অনুসন্ধান না করেই বলেন, ভগবান মানেন না, তাঁরা অবৈজ্ঞানিকভাবে বলেন, হাততালি পাবার জন্য গায়ের জোরে বলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো রাজনৈতিক নেতা নন, তাঁদের হাততালি পাবার দরকার কী? বিজ্ঞানীদের হাততালি পাবার কোনো দরকারই নেই।"

দিলীপবাবু বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে বলেছেন। অনুসন্ধান না চালিয়ে 'ঈশ্বর নেই' বলার ব্যাপারটাকে দারুণ রকম নিন্দা-মন্দ করেছেন। দিলীপবাবুর এ'জাতীয় মতামতকে গুরুত্ব দিলে কুমড়োপটাশ থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া পর্যন্ত সব্বার ক্ষেত্রেই গভীর অনুসন্ধান চালাবার আগে 'নেই' বলার অধিকার বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হয়।

দিলীপবাবুর বক্তব্যের পিঠে দারুণ চপেটাঘাতের মতই এসে পড়েছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তারকমোহন দাসের চাঁচা-ছোলা কথাবার্তা। তারকমোহনবাবুর পরিচয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট ফিজিওলজি বিভাগের প্রফেসর, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের কো-অর্ডিনেটর। ভারত সরকারের গঙ্গাদূষণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন, চালাচ্ছেন বায়ুদূষণে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা।

তারকমোহনবাবু ঈশ্বর মানেন না। কেন মানেন না? তাঁর কথায়, "ঈশ্বর থাকলে এতদিনে বেরিয়ে যেতেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁকে আবিষ্কার করা যেত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা যায়নি। যাবেও না কোনোদিন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল—প্রথমে একটা প্রশ্ন থাকবে, তারপর সেটা নিয়ে

এক্সপেরিমেন্টেশন হবে, তারপর ইনফারেন্স হবে এবং শেষে সেই ইনফারেন্স অনুসারে ব্যাখ্যা হবে। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এসব কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই, আমি কোথাও কোনো রেফারেন্স পাইনি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিজ্ঞানে প্রমাণ পাচ্ছি ঈশ্বর আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঈশ্বর আছেন মানতে রাজি নই।"

দিলীপকুমার সিংহ স্বীকার করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তাঁর কথায়, "আসলে এটা অনুভূতির প্রশ্ন—এবং অনুভূতি অনেকটা সংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমরা লেখাপড়া শিখেছি বলেই পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত, একথা কখনই বলা যায় না। আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু সংস্কার আছে, সেই সংস্কারই গোড়ায় ঠিক করে দেয় ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কী হবে। সংস্কার তো ছেলেবেলা থেকেই গড়ে ওঠে, তাই আপনি যদি ঈশ্বর আছেন এই সংস্কারের মধ্যে বড়ো হন তাহলে ঈশ্বর আছেন, আপনার মানতে ইচ্ছা হবে।" ঝুলি থেকে বিড়াল বেরুল! তাহলে ঈশ্বর কি শুধুই সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও অনুভূতির ব্যাপার মাত্র? নাকি বিজ্ঞানী দিলীপকুমার সিংহের 'ঈশ্বর' অন্ধবিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে 'প্রত্যয়' হয়ে প্রতিষ্ঠিত?

দিলীপবাবুর কথায়, "আমার স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই, আমার মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব আছে, আমি প্রচণ্ড একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি—ঈশ্বর আছেন একথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না, আবার জোর দিয়ে বলতেও পারছি না—হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন।"

('সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার বাবা?' ব্যাপারটা এমনই দাঁড়াল না কি? আশা করছি, দিলীপবাবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ 'অবৈজ্ঞানিকভাবে' করেননি। হাততালি পাবার লোভে এমনটা বলেননি। কিন্তু তাহলে কেন ঈশ্বর-অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানীদের গাল-পারা! ধুৎ-তারি-ছাই! এত উল্টো-পাল্টা কথা-বার্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাবে দেখছি!)

কিন্তু এ'সব কথার পরেও সিংহমশাই ঈশ্বর প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা সত্যিই চমকপ্রদ! তাঁর কথায়, "অবিশ্বাস কী করে করি বলুন তো! আমি নিজে একেবারেই কিছু টের পাইনি, তা তো নয়।"

কীভাবে টের পেয়েছেন, বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন, "আমার বোনেদের ভালো বিয়ে হয়েছে, ভাইয়েরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমিও নেহাত খারাপ নেই। নিশ্চয়ই কেউ অদৃশ্য হাতে আমাকে সাহায্য করেছে। সে ঈশ্বরও হতে পারে, একটা শক্তিও হতে পারে।...তাকে ঈশ্বর বলুন না, দোষ কী!"

দিলীপকুমার সিংহের বোনেদের ভালো বিয়ে ও ভাইদের প্রতিষ্ঠা যদি ঈশ্বর অস্তিত্বের একটা প্রমাণ হয়, তবে বহু মানুষের বোনেদের খারাপ বিয়ে ও তাদের ভাইদের অপ্রতিষ্ঠা কি ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় না? দিলীপবাবু কী বলেন?

পাঁচ : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধিকর্তা, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সাইন্স'-এর সভাপতি। ভারতসরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কমিটির প্রাক্তন সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সারা ভারত বিজ্ঞান জাঠার (১৯৮৭) অন্যতম নেতা (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য— বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল, তার মধ্যে বিষয় হিসেবে স্থান পায়নি 'কুসংস্কার', স্থান পায়নি যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার প্রয়াস)। মৃত্তিকাবিজ্ঞান ও কৃষিরসায়ন নিয়ে কাজের জন্য ভারতে যাঁরা অগ্রগণ্য, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের একজন।

সুশীলবাবু কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ? এ'বিষয়ে তাঁর সাফ জবাব, "দেখুন, ঈশ্বর নিয়ে আমি কখনও চর্চা করিনি। বিজ্ঞানী কেন, যে কোনো যুক্তিবাদী লোকই বলবে, 'যা নিয়ে তুমি কখনও চর্চা করোনি, তা নিয়ে তোমার পক্ষে কিছু বলা ঠিক নয়। কেননা, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে। অনুভূতির সাহায্যে হয়তো কিছু বলতে পার, কিন্তু অনুভূতিও অনেক সময় তোমাকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে পারে।' কাজেই আমি মনে করি, আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু না বলাই শ্রেয়।"

ভাল কথা ! সুশীলবাবু যেহেতু ঈশ্বর নিয়ে চর্চা করেননি, তাই ঈশ্বর আছে, কি নেই, এ বিষয়ে কোনও রকম মত প্রকাশে নারাজ। তিনি আর এক প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টতই জানিয়েছেন, "ঈশ্বর আছেন কি না আমি জানি না।" এই বিষয়ে তাঁর চর্চা নেই তো, তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আশা করি, রামগবুড় ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্নের মুখোমুখি হলেও সুশীলবাবু বলতেন—রামগবুড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে কি না, আমি জানি না। থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

তবে সুশীলবাবু এ'কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, "ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা একটা বিজ্ঞান।"

এই জাতীয় কথা আর কোনও বিজ্ঞানীর লেখায় বা কথায় আজ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সুশীলবাবুর কথায়, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এই বিজ্ঞানের মিল নেই।"

"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানেই বাইরের জিনিস অর্থাৎ আমরা যে জিনিস দেখতে পাচ্ছি, স্পর্শ করতে পারছি সেই জিনিস। সবই ফিজিক্যাল ব্যাপার। এ দিয়ে ঈশ্বরের পরিমাপ হয় না, এ দিয়ে ঈশ্বর আছে কি নেই বলা যায় না।"

"ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ভিতরের জিনিস নিয়ে—নিজের ভিতরটা দেখা ও বোঝার চেষ্টা করাই এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য।"

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই অধ্যাত্মবাদ নিয়ে চর্চা করেই এ'সব কথা বলেছেন। চর্চা করে দেখেছেন, আত্মা অমর। ভূত-প্রেত-পরমাত্মা-ঈশ্বর-

আত্মা-পরলোক, ইত্যাদি সবেরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে! ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্তিকা গবেষণাপত্র শ'র উপর প্রকাশিত হয়েছে। নামী বিদেশি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেও কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যা প্রকাশিত হয়েছে, সবই তো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জিনিস। প্রাচ্য বিজ্ঞান অর্থাৎ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে তাঁর চর্চা ও গবেষণাপত্র অপ্রকাশিত রেখে তিনি কি প্রাচ্য-বিজ্ঞান, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও তামাম বিশ্ববাসীকে বিশালভাবে বঞ্চিত করছেন না? আমজনতার পক্ষ থেকে, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট মৃত্তিকাবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানী ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি বিনীত নিবেদন, তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর চর্চা ও গবেষণার সঙ্গে জনগণের পরিচয় ঘটাবার সুযোগ করে দিন। তাঁর প্রাচ্য বিজ্ঞানচর্চার অসাধারণ দিকটি জনগণের কাছে, জনগণের স্বার্থে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

যে সুশীলবাবু সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, "ঈশ্বর আছেন কি না আমি জানি না", সেই সুশীলবাবুই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা রেখেছেন, "ভারতীয় অধ্যাত্মিকতাও একটা বিজ্ঞান", অর্থাৎ "ভারতীয় আত্মা পরমাত্মা ও পরলোক তত্ত্ব বিজ্ঞান"। যাঁরা সুশীলবাবুর এমন চূড়ান্ত স্ববিরোধিতায় হতবুদ্ধি ও হতবাক, তাঁদের অবগতির জন্য সুশীলবাবুর আরও কিছু কৌতূহল উদ্দীপক বা 'মজার ছত্রিশ ভাজা' মার্কা উক্তি তুলে দিচ্ছি ঃ

(এক) "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঈশ্বর লাভ করেছিলেন এবং নরেনের মতো ঐরকম ঘোর নাস্তিককেও ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন, সুতরাং নিশ্চয় তাঁর মধ্যে একটা প্রতীতি (প্রত্যয়) জন্মেছিল। এই প্রতীতিই আসল কথা। বিজ্ঞানীদেরও এইরকম প্রতীতি জন্মায়, তবেই তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।"

(দুই) "দেখুন, বিজ্ঞানে সকলের ভাষা সকলে বোঝেন না। স্পেশালাইজেশনের দরুন বিজ্ঞানের ভাষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এক বিজ্ঞানের লোক আর-এক বিজ্ঞানের ভাষা খুব বেশি বুঝতে পারেন না। যেমন ধরুন, আমি সয়েল কেমিস্ট্রির লোক, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ভাষা আমি ঠিক বুঝি না—অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে এমনসব টার্মিনোলজি ব্যবহার করা হয় যা আমার বোধগম্য হয় না। কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে কিছু বুঝি। আধ্যাত্মিক জগতেও এইরকম আছে।"

(তিন) "রামকৃষ্ণদেবের কথা দিয়েই বলি। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে দূরদূরান্ত থেকে অনেক সাধুসন্ত আসতেন। গঙ্গাতীরে এক পরম সাধক আছেন শুনেই তাঁরা আসতেন। তাঁরা তাঁর ভাষা জানতেন না। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁদের হয়তো দু-চারটে কথা হত—এছাড়া বেশিরভাগই আকার-ইঙ্গিত, চোখের ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা। এইভাবেই তাঁদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হত, এক ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীর আর-এক ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীর মধ্যে যেমন হয়। কাজেই এ-ও একটা বিজ্ঞান।"

(তখন খড়গপুরের ট্রাফিক সেটেলমেন্টে থাকি। সীতানাথ মাথায় কয়লার ঝুড়ি নিয়ে কয়লা বেচতে আসত। বিয়ে করল দক্ষিণ ভারতীয় একটি মেয়েকে। মেয়েটিও কয়লা বেচতে আসত। কিন্তু তেলুগু ছাড়া আর সব ভাষাই তার কাছে ছিল পরম-রহস্যময়। আকার-ইঙ্গিত-চোখের ভঙ্গি-হাতের মুদ্রায় ভাববিনিময় করত। সীতানাথ ছিল ওড়িয়াভাষী।

সীতানাথ ও তার পরিবারের সকলের সঙ্গেই সীতানাথের জীবনসঙ্গিনীর ভাববিনিময়ের ভাষা ছিল আকার-ইঙ্গিত। এখন মনে হচ্ছে, আসল মানেটা বুঝতে পারছি। ওদের যে'ভাবে আকার-ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় হত, সেভাবেই এক ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীর সঙ্গে আর-এক ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীর ভাব বিনিময় হয়। কাজেই সীতানাথ ও তার জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপার-স্যাপারও আসলে বিজ্ঞান। ওরা ছিল খুব বড় মাপের বিজ্ঞানী।)

(চার) "জগৎ চলছে প্রকৃতির নিয়মে। জগৎ চালাবার জন্য আর-একজনের দরকার আছে বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। আবার যদি জিজ্ঞাসা করেন, জগৎ সৃষ্টি হল কী করে, উত্তরে বলব, সে-ও প্রকৃতির নিয়মে। কেউ একজন জগৎ সৃষ্টি করেছে ভাবলে সমস্যা বাড়ে। তখন প্রশ্ন ওঠে, তাঁকে সৃষ্টি করেছেন কে? এ প্রশ্নের উত্তর পাব না। তখন যেতে যেতে সেই ইনফিনিটিতে গিয়ে পৌঁছতে হবে। অত গোলমালের মধ্যে না যাওযাই ভালো। প্রকৃতির নিয়মে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ও প্রকৃতির নিয়মে জগৎ চলছে মেনে নিলে কোনো গোল থাকে না।"

(পাঁচ) "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, সেইটেই আমার ধর্ম।"

সুশীলবাবুর এই পাঁচমিশেলি বক্তব্য বিষয়ে মন্তব্য নিঃস্প্রয়োজন।

ছয়ঃ গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় গত তিরিশ বছর ধরে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন গবেষণাপ্রকল্পের কর্ণধার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। জীবরসায়নের নানা শাখায় তাঁর প্রায় পৌনে দু'শোর মত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে দেশ বিদেশে। এক সময় তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভিজিটিং ফেলো ছিলেন।

গোরাচাঁদবাবুর কথায়, "আমাদের সৌরমণ্ডলের কথা ধরুন, সূর্যের চারপাশে গ্রহরা তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে। এই যে তাদের মুভমেন্ট, এর একটা আশ্চর্য সিংক্রোনাইজেশন আছে। ধরুন, আজ থেকে দশ বছর পরে একটা চন্দ্রগ্রহণ কি সূর্যগ্রহণ হবে। আমাদের ম্যাথাম্যাটিক্যাল সায়েন্স এত উন্নতি করে গেছে যে, আমরা অঙ্ক কষে বলে দিতে পারি, অমুক দিন অমুক সময় এই গ্রহণ হবে। এ একটা ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার। আমার মনে হয়, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে গতিশীলতা, কোনো এক অতিপ্রাকৃত শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই যে একটা স্যুপারন্যাচারাল ফোর্স বা গাইডিং ফোর্স—এটা কিন্তু সামথিং মিরাকিউলাস।"

গোরাচাঁদবাবুর এমন বক্তব্যকে কাঁধ থেকে পোকা ঝাড়ার মতই ঝেড়ে ফেলেছেন বি. ডি. নাগচৌধুরী, পাল্টা যুক্তির টোকায়। বি. ডি.'র পুরোটা বাসন্তীদুলাল, তবে বি. ডি. নামেই বেশি পরিচিত। ডঃ নাগচৌধুরী সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্সের ডিরেক্টর ছিলেন। ছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ছিলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। ভারতের পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষেত্রে ডঃ নাগচৌধুরীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতির চূড়োয় উঠেছেন। বিদেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও অতিপরিচিত একটি নাম।

ডঃ নাগচৌধুরীর যুক্তি, "সুপারন্যাচারাল ফোর্সেরও তো প্রমাণ চাই। প্রমাণ না পেলে বিজ্ঞানী হিসেবে আমি মানি কী করে ? বিজ্ঞানে অনেক রকম এনার্জির কথা বলা হয়েছে। একটা এনার্জি আর একটা এনার্জিতে ট্রান্সফার করা যায়, তাকে বলে ট্রান্সফর্মেশন অব এনার্জি। আমি যদি সুপারন্যাচারাল ফোর্স বা এনার্জির কথা ধরি, তাহলে কোন্ এনার্জিকে সুপারন্যাচারাল এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করব ? আবার সুপারন্যাচারাল এনার্জিকেই বা কোন্ এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব হবে ? সুতরাং ঈশ্বরকে সুপারন্যাচারাল ফোর্স হিসাবেও ভাবতে পারি না।"

○

যদি সুপারন্যাচারাল ফোর্স বা এনার্জির কথা ধরি, তাহলে কোন্ এনার্জিকে সুপারন্যাচারাল এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করব ? আবার সুপারন্যাচারাল এনার্জিকেই বা কোন্ এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব হবে ? সুতরাং ঈশ্বরকে সুপারন্যাচারাল ফোর্স হিসাবেও ভাবতে পারি না।"

○

গোরাচাঁদবাবুর জবানীতে, "রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ স্যুপারম্যান ছিলেন জানি, অতি সাম্প্রতিক কালে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর কথাও শুনেছি। শুনেছি তাঁদের বহু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। থাকতেই পারে, কারও ক্ষমতা থাকতেই পারে—নইলে এত লোক তাঁদের কাছে ছোটে কেন ?"

তাঁর এই তিনটি বাক্যের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাচ্ছি—এক ঃ গোরাচাঁদবাবু জানতেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কীভাবে জানতে পেরেছিলেন ? কীভাবে ওঁদের অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ? দুই ঃ "নইলে এত লোক তাঁদের কাছে ছোটে কেন ?"—কী সহজ-সরল উত্তর ! যুক্তির পরিবর্তে সংখ্যাগুরুদের মতামতে কী গভীর বিশ্বাস ! আঃ হাঃ এমন সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের কৃপাতেই সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা আটকে ছিল শত-সহস্র বছর।

বিশ্বাস যদি 'ডগমা' হয়, অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর না হয়ে বদ্ধমূল ধারণার উপর গড়ে ওঠে, তখন তা অন্ধ হয়ে যায়। গোরাচাঁদবাবু পেশায় বিজ্ঞানী হলেও

বাস্তব জীবনে অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত একটি পিছিয়ে পড়া মানুষ-বই কিছু নন।

গোরাচাঁদবাবু আরও বলেছেন, "ধরুন, রামকৃষ্ণ পরমহংস যদি আজ জন্মাতেন, আমরা কি তাঁর মেট্যাবলিক ইভেন্ট দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারতাম ? কখনই না। বায়োকেমিস্ট্রি যে এখন অ্যাটামিক লেভেল ছাড়িয়ে আরেও অনেক ফাইনার লেভেলে চলে গেছে, তবু রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য আমরা ভেদ করতে পারতাম না।"

কী মুশকিল বলুন তো ! অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হলে তবে তো তার কারণ খুঁজে বের করার ও ব্যাখ্যার প্রশ্ন আসবে ! গোরাচাঁদবাবু আগেই ঘোষণা করে বসে রইলেন, রামকৃষ্ণ প্রমুখদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য ভেদ করতে তিনি পারতেন না। তিনি অবশ্য 'আমরা' কথাটা ব্যবহার করেছেন। জানিয়েছেন, "আমরা ভেদ করতে পারতাম না"। এই "আমরা" বলতে বোধহয় তাঁর মত অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে নতজানু বিজ্ঞানীদের কথা বলেছেন। 'বিশ্বাস' যেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুধুমাত্র বদ্ধমূল ধারণার উপর গড়ে ওঠা, সেই বিশ্বাস কখনই সত্যানুসন্ধান করতে পারে না। রহস্য ভেদ করতে পারে না। অতএব, গোরাচাঁদবাবুরা বিজ্ঞানী হয়েও যে পারবেন না, এটা তো সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। তবে অলৌকিক রহস্য ভেদের ব্যাপারে গোরাচাঁদবাবু বাস্তবিকই আন্তরিক হলে একটি কাজ করতে পারেন। অলৌকিক ক্ষমতাবান কারও খবর পেলে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতিকে খবর দিতে পারেন। গ্যারান্টি দিচ্ছি, রহস্য ভেদ করে দেব-ই।

সাত : বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাস কলিকাতা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা। মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে তাঁর কাজ। দুটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার তিনি পেয়েছেন, ভাটনগর পুরস্কার ও শ্রীনিবাসাইয়া পুরস্কার। আমেরিকার বিখ্যাত মলিকিউলার বায়োলজিস্ট আলেকজান্ডার হলেন্ডা মনে করেন ডঃ বিশ্বাস একদিন নোবেল পুরস্কার পাবেন, তার কর্মকাণ্ডের জন্য।

বীরেন্দ্রবাবু তাঁর এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছেন। তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, "আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলি, অনেকের বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। আছে কি নেই, বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারেনি।"

কী মজার ব্যাপার বলুন তো ! দাবিদার একবার দাবি করলেই 'কেল্লা ফতে'। এ'বার বিজ্ঞানকেই আদা-জল খেয়ে প্রমাণ করতে হবে—তার দাবির অসারতা। নতুবা বীরেন্দ্রবাবুব মত ডাক-সাইটে নামী-বিজ্ঞানীরাও শোরগোল তুলবেন—দাবি অসার কি না বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারেনি।

দাবি প্রমাণের দায়িত্বটা দাবিদারের নয়—বীবেন্দ্রবাবুর এমন বালখিল্যের

মত কথায় আমার বন্ধু মিস্টুন বলেছিলেন, "আমাদের পাড়ার ফুচকাওয়ালা ঝুন্নু বলে, ও নাকি এক রকম পাতার রস খাইয়ে বেশ কয়েকজন এইডস রোগীকে একদম সারিয়ে দিয়েছে! কোন্ গাছের পাতার রস খাওয়ায়? না, ঝুন্নু এ'বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। বলে, 'এতবড় আবিষ্কারটা আমি বলি, আর তোমরা ফোকটাই নাম কেন। নোবেল প্রাইজ দিলে তবে নাম বলব।' ভাল হয়ে যাওয়া রোগীদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেই হাসে আর বলে, 'আমি কি পাগল যে রোগীদের নাম বলব? ওদের নাম বলি, আর পাবলিক ওদের পিছনে লেগে পড়ুক?' এতদিন ঝুন্নুকে আধা-পাগলা ভাবতাম। এখন তোমার মুখে বীরেন্দ্রবিজয়বাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ'ভাবে ঝুন্নুর দাবিকে উড়িয়ে দেওয়াটা আদৌ ঠিক নয়। কারণ, ঝুন্নুর এইডস সারাবার ক্ষমতা আছে কি নেই, বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারেনি। এই যুক্তিতে ঝুন্নুকে এইডসের ওষুধের আবিষ্কারক হিসেবে সত্যিই নোবেল প্রাইজ দেওয়া যেতেই পারে। বীরেন্দ্রবাবুর বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক নাম আছে। উনি এ ব্যাপারে ঝুন্নুকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন। বীরেন্দ্রবাবু তাঁর অকাট্য যুক্তিতে নিশ্চয়ই নোবেল পুরস্কার কমিটিকে প্রভাবিত করতে পারবেন। আর তারপর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার আনবে ঝুন্নু ফুচকাওয়ালা। ঝুন্নু ও নোবেল পুরস্কার—এই দুয়ের মধ্যে যে দূরত্ব, সেটা ঘোচাতে এখন শুধু দরকার, বীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ঝুন্নুর আলাপ করিয়ে দেওয়া।"

'ঐশ্বরিক ক্ষমতা' বলে কিছু আছে কি নেই, বিজ্ঞান যদি প্রমাণ করতে পারত, তা হলে কী হত? বীরেন্দ্রবাবুর কথায়, "তাহলে প্রমাণ হয়ে যেত ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর থেকেই তো ঐশ্বরিক! ঈশ্বর না থাকলে ঐশ্বরিক হয় কী করে?"

ভাল! ভাল! কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বীরেন্দ্রবাবু প্রকারান্তরে এ'কথাও স্বীকার করলেন—অবতার নামে চিহ্নিতদের কেউই আজ পর্যন্ত তাঁদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারেননি। তেমনটা পারলে তো ঈশ্বরের অস্তিত্বও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যেত।

ঐশ্বরিক ক্ষমতার অস্তিত্ব বিষয়ে বীরেন্দ্রবাবুর দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি প্রমাণহীন, যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস—এ কথা রূঢ় শোনালেও সত্যি।

বীরেন্দ্রবিজয়ের কথায়, "হয়তো মহাপুরুষরা সাধনার দ্বারা তাঁদের মস্তিষ্ককে অনেক বেশি কাজে লাগাতে পারেন। তাতে তাঁদের ক্ষমতা বেড়ে যায়, তখন তাঁরা অনেক অসাধারণ কাজ করতে পারেন। এমন কি ভবিষ্যৎও দেখতে পারেন। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তা অসম্ভব কিছু নয়।"

শুধুই 'হয়তো' দিয়ে কেন? তাহলে একথাও তো বলা যায়—"হয়তো সাধনার দ্বারা অসাধারণ কাজ বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রকাশ আদৌ সম্ভব নয়"।

'হয়তো', 'যদি', 'তবে' দিয়ে বীরেন্দ্রবাবুর এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার পক্ষে

ওকালতির ভিতটা বড় বেশি ঠুনকো। আরও মারাত্মক ব্যাপার হল এই যে, বীরেন্দ্রবাবু মনে করেন—বিজ্ঞান মেনেই মানুষের ভবিষ্যৎও দেখা সম্ভব! ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত না হলে তাত্ত্বিকভাবেই ভবিষ্যৎ দেখা সম্ভব নয় (এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত জানতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ৩য় খণ্ড পড়তে পারেন)। পূর্বনির্ধারিত কথার অর্থ যা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, কোনওভাবেই যার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত না হলে 'ভবিষ্যৎ দেখা'র পর তা পাল্টে যেতেই পারে। আর তেমনটা ঘটলে ভবিষ্যৎ দেখা ভুল হতে বাধ্য। অতএব, তাকে আর 'বিজ্ঞানের দিক থেকেই সম্ভব', এমনটা বলা যাবে না। 'ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত' হওয়াটা যদি সম্ভবই হয়, তবে সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বীরেন্দ্রবাবু, আপনি অসুস্থ হলে কি ডাক্তার দেখান? ওষুধ খান? যদি দেখান, যদি খান, তবে বলতেই হয়, আপনি স্ববিরোধী চিন্তার শিকার। কারণ রোগ-ভোগ, সুস্থতা, মৃত্যু সবই যখন পূর্বনির্ধারিত, তখন ডাক্তার ও ওষুধের ভূমিকা শূন্য হতে বাধ্য নয় কি?

বীরেন্দ্রবাবু, এক সময় যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, টাইফয়েড সহ অনেক রোগেরই কোনও চিকিৎসা ছিল না। এইসব রোগীর ভাগ্যে তখন নির্ধারিত হত মৃত্যু। ওষুধ আবিষ্কার হতেই নির্ধারিত মৃত্যু পিছু হটেছে। নির্ধারিত ভবিষ্যৎ এ'ভাবেই প্রচেষ্টার কাছে, বিজ্ঞানের কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

বীরেন্দ্রবাবু, ঐশ্বরিক শক্তি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একান্তভাবেই অসম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে বা বাস্তবে কোনওভাবেই এই অসম্ভবকে আপনি সম্ভব করতে পারবেন না। কখনই পারবেন না।

অধ্যায় ঃ সাত

ঈশ্বর বিশ্বাস : একটি যুৎসই সংজ্ঞার খোঁজে মাথার চুল পাকানো

ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী ?

যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে ওঠার পর গোড়ার দিকে আমাকে অনেকেই বলতেন— বুজরুকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, খুব ভাল। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, সত্যিই দারুণ! ঈশ্বরকে তো মানেন ?

শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষ থেকে উচ্চশিক্ষিত, সাধারণ বুদ্ধির মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী—অনেকেই এ'জাতীয় প্রশ্ন অবিরল ধারায় হাজির করেই চলেছেন।

○

আমি ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার জানাটা খুবই জরুরী—ঈশ্বর কাকে বলে ? অর্থাৎ, ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী ? আপনি ঈশ্বর বলতে কী বোঝেন ?
কারণ, ঈশ্বর বলতে সকলে তো এক জিনিস বোঝেন না! ঈশ্বর সম্বন্ধে এক-এক-জনের ধারণা এক এক রকম!

○

এ'জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেককেই বলি—আমি ঈশ্বর মানি কি না, অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার জানাটা খুবই জরুরী—ঈশ্বর কাকে বলে ? অর্থাৎ, ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী ? আপনি ঈশ্বর বলতে কী বোঝেন ?

কারণ, ঈশ্বর বলতে সকলে তো এক জিনিস বোঝেন না ! ঈশ্বর সম্বন্ধে এক-এক-জনের ধারণা এক এক রকম ! এমন কি একটা ধারণাকে মেনে নিলে অন্য ধারণাকে বাতিল করতে হয় ; এছাড়া উপায় থাকে না। ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণায় ধারণায় এমন ঠোকা-ঠুকির মধ্যে কোন্ ধারণাটা আপনার, জানাটা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে।

আজ আমরা একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি—যখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রশক্তি, প্রচারমাধ্যম ও ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবী জুড়ে প্রচারে নেমেছে—ঈশ্বর আর বিজ্ঞানের দীর্ঘ সংঘর্ষ এত দিনে শেষ হচ্ছে। বিজ্ঞান মেনে নিচ্ছে ঈশ্বরকে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসীর সংখ্যা শতকরা কত ভাগ ? (বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী পল ডেভিস জানিয়েছেন, তিনি কৌতূহলবশত এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, পাশ্চাতের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসীর সংখ্যা এতই কম যে, শতকরা হিসেবে আসেন না।) তবু প্রশ্ন থাকে, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ঈশ্বর মানলেই বাস্তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি না, বা বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে—বলা যায় কি না (মানার মধ্যে যুক্তি প্রমাণ থাকতে পারে, আবার অনেকসময় আমরা মানি যুক্তি প্রমাণ ছাড়া) ? এ'জাতীয় কূট প্রশ্নে না গিয়েও আমরা বলতে পারি—এ যাবৎ যে দীর্ঘ বিশ্লেষণ ঈশ্বর প্রসঙ্গে আমরা করেছি, তাতে এটা অতি স্পষ্ট যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-রাষ্ট্রশক্তি-প্রচারমাধ্যমগুলোর বিশাল প্রচারের পুরোটাই ফাঁপা। আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সোচ্চারে বলতে পারি, ঈশ্বর আর বিজ্ঞান, দু'য়ের দূরত্ব আগেও অপরিসীম ছিল, আজও অপরিসীমই আছে। 'ঈশ্বর' আগেও বিশ্বাস নির্ভর ছিলেন, আজও বিশ্বাস নির্ভরই আছেন। "ঈশ্বর আর বিজ্ঞানের দীর্ঘ সংঘর্ষ এত দিনে শেষ হচ্ছে"—কথাটা অবশ্য উড়িয়ে দেবার মত নয়, বরং কথাটায় বিশ্বাস করতেই মন চাইছে। এমনটা চাওয়ার পিছনে জোরালো যুক্তিও আছে। ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি সংগ্রহে আন্তরিক ছিলাম। এ'বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে আমার সহযোদ্ধারা এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর খোঁচা। প্রতিটি যুক্তিই খণ্ডিত হয়েছে বলাই বাহুল্য। এর অনিবার্য পরিণতি—ঈশ্বরে বিশ্বাসের মৃত্যু। এরপর আমরাও সোচ্চারে ঘোষণা করছি, "ঈশ্বরের বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের দীর্ঘ সংঘর্ষ এত দিনে শেষ হচ্ছে"।

ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি সংগ্রহে আন্তরিক ছিলাম। এ'বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে আমার সহযোদ্ধারা এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর খোঁচা। প্রতিটি যুক্তিই খণ্ডিত হয়েছে বলাই বাহুল্য। এর অনিবার্য পরিণতি—ঈশ্বরে বিশ্বাসের মৃত্যু। এরপর আমরাও সোচ্চারে ঘোষণা

করছি, "ঈশ্বরের বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের দীর্ঘ সংঘর্ষ এত দিনে শেষ হচ্ছে"।

)

'হচ্ছে'কে 'হল' করতে আসুন এবার 'ঈশ্বর' নিয়ে নানা স্ববিরোধী ধারণার 'মজার ছত্রিশ ভাজা' পরিবেশন করি।

এক ঃ ঈশ্বর কি মানুষেরই মত ?

অনেকেই মনে করেন ঈশ্বরকে দেখতে মানুষের মত। তাঁদেরও হাত পা মাথা নাক চোখ কান মুখ দাঁত চুল ইত্যাদি সবই আছে। তাঁরা বেলায় বেলায় খাবার খান, রাতের বেলা নিদ্রা যান। পোশাক-টোশাকও পাল্টান। ঈশ্বররাও কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ ইত্যাদির উর্ধ্বে নন। তাঁরাও আনন্দ দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির দ্বারা চালিত হন। আগেকার দিনের রাজা-মহারাজাদের মত বেজায়রকম খামখেয়ালি। দুম্ করে রেগে যান, শাপ দেন, কখনও বা দয়া বরফের মতই গলে গলে পড়তে থাকেন।

বাইবেলে 'জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ'—এ রয়েছে, "ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন"।

বাইবেলে দেওয়া ঈশ্বরের সংজ্ঞায় বিশ্বাস করলে হিন্দু-দেবতা গণেশ'কে বাতিল করতে হয় ! কী করেই বা মানি মাছরূপী, কচ্ছপরূপী, নৃসিংহরূপী হিন্দু দেবতাদের ? কী করেই বা মেনে নিই মুসলিমদের নিরাকার ঈশ্বর ধারণাকে ? এ'যে ঈশ্বরের রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের হাজির করা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় দারুণ রকম ঠোকাঠুকি ! আমরা কোন্ সংজ্ঞা ছেড়ে কোন্ সংজ্ঞা ধরব ? কোন্ যুক্তির নিরিখে এই সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে অন্যগুলো বাতিল করব ? ধর্ম বিশ্বাসের নিরিখে ? ধর্ম পাল্টালে যে তবে ঈশ্বরের সংজ্ঞাও ডিগবাজি খাবে, রূপ যাবে পাল্টে !

)

ঈশ্বরের রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের হাজির করা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় দারুণ রকম ঠোকাঠুকি ! আমরা কোন্ সংজ্ঞা ছেড়ে কোন্ সংজ্ঞা ধরব ? কোন্ যুক্তির নিরিখে এই সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে অন্যগুলো বাতিল করব ?

)

দুই ঃ ঈশ্বর সাকার ? অথবা নিরাকার ?

খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন ঈশ্বরের আকার আছে, অর্থাৎ 'সাকার'। মুসলিম ধারণায় আল্লাহ 'নিরাকার'। হিন্দুদের ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত। 'সাকার' 'নিবাকার', দুই মতই চালু। তবে 'সাকার' মতটাই এখনও প্রবলতর।

ভারতে আর যারই অভাব থাক, অবতারদের অভাব কোনও কালেই নেই। আর, সব হিন্দু অবতাররাই ঈশ্বর দেখেছেন ! হিন্দুদের আবার তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাদের মধ্যে কয়েকশো দেবতা অবতারদের দেখা-টেখা দিয়েছেন বলে শোনা গেছে। পশ্চিমবাংলার অবতাররা প্রধানত দেখেছেন কালী, তারা, আদ্যামা, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, শিব, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, গোপাল ইত্যাদি আরও বহু দেবতা। হিন্দীভাষী অবতাররা দেখেছেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-হনুমান ও রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত কাল্পনিক আরও বহু চরিত্র। ওড়িয়াভাষী অবতাররা দেখে থাকেন প্রধানত জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা'কে। এ'ভাবেই বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষি অবতার বা ভক্তরা দেখা পান তাঁদের অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবতাদের। দক্ষিণ ভারতে মরুগাণ থেকে ভেঙ্কটেশ্বর প্রমূখ দেবতাদের আধিপত্য। হিন্দু দেবতাদের ক্ষমতা আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে, ভাষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ।

হিন্দু দেব-দেবীদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ধর্মের ঈশ্বরদের মধ্যে অনুপস্থিত ; তা হল, হিন্দুদের দেবী ভক্তের মেয়ের রূপ ধরে ভক্তের সঙ্গে বেড়া বাঁধেন (এই বেড়া বাঁধা যে বাস্তব সত্য—বহু বাংলাভাষী হিন্দু তা বিশ্বাস করেন), ভক্তের হাত থেকে খাবার খাওয়া নিয়ে খুনসুটি করেন, মান-অভিমানের পালা চলে, ভক্তের সঙ্গে গ্রাম্য বাংলায় কথাও বলেন।

হিন্দুদের ঈশ্বর ও বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, চৈতন্য প্রমুখ অবতারদের নিয়ে যে সব কাহিনী 'সত্যি' বলে প্রচলিত আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের আকার আছে, দেখতে মানুষেরই মত।

খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যে বলা হয়েছে ঈশ্বর মানুষের মতই দেখতে, অর্থাৎ ঈশ্বর সাকার—এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

মুসলিম ধর্মের ঈশ্বর 'আল্লাহ' কিন্তু নিরাকার। যদিও তিনি নিরাকার কিন্তু তাঁর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সিংহাসনে বসার প্রয়োজন হয় (আল্লাহতালা'র সিংহাসনকে বলে 'আরশ')। নিরাকারের বসার জন্য সিংহাসনের কেন প্রয়োজন হবে, অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এটা !

এই পরম ধর্মীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—কোনও হিন্দু যদি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে কি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঈশ্বর সাকার থেকে ভেঙে বিমূর্ত নিরাকার হয়ে যাবেন ? আর কোনও মুসলমান হিন্দু হলে তাঁর নিরাকার ঈশ্বর কি একটু একটু করে আকার পাবেন ?

কোনও হিন্দু যদি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে কি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঈশ্বর সাকার থেকে ভেঙে বিমূর্ত নিরাকার হয়ে যাবেন ? আর কোনও মুসলমান হিন্দু হলে তাঁর নিরাকার ঈশ্বর কি একটু একটু করে আকার পাবেন ?

বাস্তবে এমনটা হলে তো বলতেই হয়, মানুষই ঈশ্বরের নিয়ন্তা। মানুষের ইচ্ছেয় ঈশ্বর 'সাকার' বা 'নিরাকার' হতে বাধ্য হন।

নিরাকার আল্লাহকে তাহলে কী রূপে দেখা যায়? এ'বিষয়ে মুসলিম ধর্মযাজকদের মত—আলো রূপে, জ্যোতি রূপে।

আর হিন্দু দেবীদের দেখতে মেগাস্টার হিরোইনের মত। দেবতাদের বেশিরভাগের চেহারাই সুপার হিরোর মত।

এত আলোচনার পরও সংজ্ঞার সমস্যাটা থেকেই গেল—ঈশ্বর সাকার? অথবা, নিরাকার?

তিন : ঈশ্বর কি 'শক্তি'? তিনি সর্বব্যাপী, না জীবব্যাপী?

বিজ্ঞানী অরুণকুমার শর্মার সঙ্গে সহমত পোষণ করে যাঁরা মনে করেন—'ঈশ্বর একটা শক্তি', তাঁদের এই ধারণা বা ঈশ্বরের সংজ্ঞাকে মেনে নিলে মানতেই হবে—ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, ঈশ্বর শুধু শক্তিতেই ব্যাপ্ত। আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে—আলো জল বায়ু উদ্ভিদ প্রাণী মাটি পাহাড় মরু বিভিন্ন বস্তু ও পদার্থ—সবেতেই ঈশ্বর অনুপস্থিত।

○

যাঁরা মনে করেন—'ঈশ্বর একটা শক্তি', তাঁদের এই ধারণা বা ঈশ্বরের সংজ্ঞাকে মেনে নিলে মানতেই হবে—ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, ঈশ্বর শুধু শক্তিতেই ব্যাপ্ত।

○

ঈশ্বরের এই ধারণাকে মেনে নিলে "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত বাণীটিকে 'ফালতু কথা' হিসেবে বাতিল করতে হয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার সিংহ খুবই নামী গণিতজ্ঞ। দিলীপবাবুর ঈশ্বর-ধারণায় যে বিবেকানন্দ কিছু প্রভাব ফেলেছেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই, যখন দিলীপবাবু বলেন, "মানুষের মধ্যেও তো আমি ঈশ্বর খুঁজতে পারি, ঈশ্বর কোনও বাইরের জিনিস বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু না-ও হতে পারে!"

ডঃ সিংহের ঈশ্বর বিশ্বাস প্রগাঢ় হলেও, 'ঈশ্বর' কি—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা যথেষ্টই নড়বড়ে। ডঃ সিংহের কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, তাঁর ধারণায়—ঈশ্বর বাইরের জিনিস বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু হ'তেও পারে।

'ঈশ্বর' বলতে ডঃ সিংহ যে কী বোঝেন, এটা তাঁর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়; অথচ 'ঈশ্বর' যে আছেন, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। 'এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ...'

দুই বিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞার টানাপোড়েনে স্বভাবতই বিভ্রান্তি জাগে!

আমরা কোন্ সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করব ? ঈশ্বর কি **শক্তি** ? **ঈশ্বর** কি সর্বব্যাপী ? ন্যাকি ঈশ্বর শুধু জীব-ব্যাপী ?

চার ঃ ঈশ্বর কি অস্পৃশ্য মানুষ ও অভক্ষ্য বস্তুতেও বিদ্যমান ?

হিন্দু ধর্মের বিধানমত কিছু মানুষ ব্রাত্য, অস্পৃশ্য। আবার কিছু বস্তু অস্পৃশ্য, যেমন মৃতদেহ, গু, ময়লা ইত্যাদি ; যা ছুঁলে স্নান করে, গঙ্গা জল ছিটিয়ে আবার নাকি পবিত্র হতে হয়। কিছু খাদ্য বস্তু অভক্ষ্য। যেমন গোমাংস। অনেক হিন্দু বা হিন্দু ব্রাহ্মণদের কাছে মাস-মাংসও অভক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে গোমাংস অভক্ষ্য নয়। অভক্ষ্য শূয়োরের মাংস। গোময় হিন্দুদের কাছে পবিত্র হলেও মুসলিমদের কাছে অপবিত্র। পুকুরে মানুষ মল-মূত্র ত্যাগ করলে অপবিত্র হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষ সে জল স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়।

এইসব অপবিত্র মানুষ ও বস্তু কি **ঈশ্বর**-আল্লাহের কাছেও অপবিত্র ? তাই যদি হয়, তবে কেন এইসব অপবিত্রের সৃষ্টি করলেন **ঈশ্বর** ?

ঈশ্বর বাস্তবিকই কি সর্বত্র বিরাজমান ? এইসব অপবিত্র মানুষ ও বস্তুর মধ্যেও বিরাজ করছেন ? তাহলে কিছু কিছু মানুষ ও বস্তুকে, ধর্ম কী করে 'অপবিত্র' বলে বিধান দেয় ?

নাকি **ঈশ্বর**-আল্লাহের সর্বত্র বিদ্যমান থাকার ক্ষমতা নেই ?

পাঁচ ঃ ঈশ্বর কি শুধুই অনুভবের ব্যাপার ?

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ডঃ দিলীপকুমার সিংহের ধারণায়, "**ঈশ্বর** তো আসলে একটা সেন্স অভ রিয়ালাইজেশন !" অর্থাৎ, **ঈশ্বর** আসলে শুধুই অনুভবের ব্যাপার। ঈশ্বরের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই বলেই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনওটিতেই ঈশ্বরকে ধরা যায় না। শুধু ভাবুন—'**ঈশ্বর** আছেন', তাহলেই 'আছেন'।

দিলীপবাবুর দেওয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এই সংজ্ঞাটি বিজ্ঞান ও যুক্তির কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য। **ঈশ্বর** শুধুই এক বিশ্বাসের ব্যাপার। 'আছেন' ভাবলে আছেন ; 'নেই' ভাবলে নেই।

ঈশ্বর শুধুই এক বিশ্বাসের ব্যাপার। 'আছেন' ভাবলে আছেন ; 'নেই' ভাবলে নেই।

ছয় ঃ ঈশ্বরকে কি দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না ?

ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্স আকাদেমির প্রাক্তন সিনিয়ার সায়েনটিস্ট মৃণাল দাশগুপ্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বলেছেন, "সৃষ্টি থাকলেই স্রষ্টা থাকে, এটা মানতে

হয়। আমি যখন বিশ্ব-রহস্যের কথা ভাবি তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। এই যে বিশাল সৃষ্টি, এর স্রষ্টা নিশ্চয় আছেন একজন! তিনি কে? তাঁকে তো ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না, দেখতে পারি না! তাহলে তিনি কে?"

মৃণালবাবু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে ঈশ্বরকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মৃণালবাবুর ধারণার এই ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা এবং এই ঈশ্বরকে ধরা, ছোঁয়া, দেখা যায় না। সৃষ্টি থাকলেই স্রষ্টার থাকাটা আবশ্যিক শর্ত হলে, সেই স্রষ্টার-ও একজন স্রষ্টা থাকাটা জরুরী হয়ে পড়ে। তারপর সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে? তার স্রষ্টা কে? এইভাবে প্রশ্নে প্রশ্নে মৃণালবাবুকে জেরবার করাই যায়। কিন্তু এখানে আমরা মৃণালবাবুর দেওয়া ঈশ্বর সংজ্ঞার সেই দিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে তিনি বলেছেন, এই বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বরকে ধরা ছোঁয়া দেখা যায় না। কেন দেখা যায় না? তার উত্তরে মৃণালবাবু বলেছেন, "তিনি (ঈশ্বর) দেহধারী কেউ নন। তাঁকে দেহধারী বলে ভাবলে ভুল হবে।"

মৃণালবাবুর দেওয়া ঈশ্বরের এই সংজ্ঞাকে মেনে নিলে বলতেই হয়—প্রত্যেকটি ধর্মের প্রতিটি ঈশ্বর দর্শনের দাবিদারদের দাবিই অসার, অলীক বা মিথ্যে। অর্থাৎ মোদ্দা কথায়—এইসব ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া ধর্মগুরুরা হয় মানসিক রোগী, নতুবা প্রতারক।

সাত : ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের আগোচর?

ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অরুণ কুমার শর্মার ধারণায়—ঈশ্বর শুধু ধরা ছোঁওয়া দেখার বাইরে নন, 'ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর'।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন ধারণায় পৌঁছুতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, না নেহাতই 'মনে হয়েছে তাই' বলেছেন—সে কথা আমাদের জানা নেই। শুধু জেনেছি, অরুণবাবুর দৃঢ় ধারণা—আমাদের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, (হ্যাঁ শুধু পাঁচটি, ছ'টি নয়। ছ'নম্বর ইন্দ্রিয়ের অবস্থান শুধুই কল্পনায়) তার কোনওটির দ্বারাই ঈশ্বরকে অনুভব করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরকে কোনওভাবেই অনুভব করা যায় না।

অরুণবাবুর দেওয়া ঈশ্বরের এই সংজ্ঞা (যা কিছুকিছু ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদেরও দেওয়া সংজ্ঞা) মেনে নিলে মানতেই হয় রামকৃষ্ণের ঈশ্বরের সঙ্গে গপ্পো-সপ্পো করা থেকে মোজেসের ঈশ্বরের বাণী শোনা পর্যন্ত সবই নেহাতই গপ্পো কথা।

কিন্তু শুধু 'না' দিয়ে তো আর সংজ্ঞা তৈরি হয় না, ঈশ্বর তাহলে অরুণবাবুর ধারণায় কেমন?

অরুণবাবুর জবাব, "একটা শক্তি নিশ্চয়।"

কেমন সে শক্তি?

অরুণবাবুর জবাব, "জানি না।"

তাহলে অরুণবাবু কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন উইদাউট নলেজ? যুক্তি ছাড়া? আদৌ কিছু না জেনে-বুঝে?

এমন প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার কারণ, অরুণবাবু মনে করেন—ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কারও পক্ষেই ঈশ্বরকে দেখা, ছোঁয়া বা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার যখন অসম্ভব ও অবাস্তব বলে রায় দিচ্ছেন অরুণবাবু, অর্থাৎ এমন দাবিদারকে ভণ্ড বা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে চিহ্নিত করছেন, তখন তিনিই আবার বলছেন, "আমার গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ।" এবং তিনি মত প্রকাশ করেছেন—রামকৃষ্ণ ঈশ্বরোপলব্ধির পথপ্রদর্শক।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন, কী অদ্ভুতুড়ে স্ববিরোধিতায় বোঝাই অরুণবাবুর ধারণা!

আট : ঈশ্বর কি অতিপ্রাকৃত শক্তি?

"অতিপ্রাকৃত শক্তিই আমার কাছে ঈশ্বর।" ঈশ্বরের এমন সংজ্ঞা যিনি দিয়েছেন, তাঁর নাম ডঃ সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশী। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজির ডিরেক্টর ডঃ পাকড়াশী এ'দেশের বহু নামী-দামি বিজ্ঞানসংস্থার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত।

কেউ যদি মনে করেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে কিছু, প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে যা খুশি করার ক্ষমতা তাঁর আছে, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তি—তা ভাবতেই পারেন। কোনও কিছু ভাবার উপরই যখন 'রেশন' নেই, তখন ভাবতে অসুবিধেও নেই! হোক না সে ভাবনা যুক্তিহীন।

কিন্তু এমন ভাবনা বা ধারণা যে বাস্তবিকই যুক্তিহীন, তা বোঝাতে একটা সহজ উদাহরণ হাজির করছি।

হাতের কলমটা ছেড়ে দিন নিচে, মাটিতে পড়বে। একটা বেলুনে হাইড্রোজেন ভরে ছেড়ে দিলে উপরে উঠতে থাকবে। এই যে কলমটা নিচে পড়ছে, বেলুনটা উপরে উঠে যাচ্ছে, দুটোই নিয়মেই হচ্ছে; প্রকৃতির আলাদা আলাদা নিয়মে। 'ঈশ্বর' নামক কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির সাধ্য নেই প্রকৃতির এই নিয়মকে পাল্টে দেবার।

হাতের কলমটা ছেড়ে দিন নিচে, মাটিতে পড়বে। একটা বেলুনে হাইড্রোজেন ভরে ছেড়ে দিলে উপরে উঠতে থাকবে। এই যে কলমটা নিচে পড়ছে, বেলুনটা উপরে উঠে যাচ্ছে, দুটোই নিয়মেই হচ্ছে, প্রকৃতির আলাদা আলাদা নিয়মে। 'ঈশ্বর' নামক কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির সাধ্য নেই প্রকৃতির এই নিয়মকে পাল্টে দেবার।

আর এক দিক থেকে ভাবুন—অতিপ্রাকৃত শক্তি (যা কি না ঈশ্বর) যে আছেন, তার তো প্রমাণ চাই! যুক্তিহীন ও বিশ্বাস-নির্ভর গোলা-গোলা কথার মাঝখানে মাঝখানে বিজ্ঞানের কিছু 'টার্ম' যোগ করে কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে, কিন্তু তা কখনই প্রমাণ হয়ে উঠতে পারে না। বিজ্ঞান নির্ভর প্রমাণের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান' অনুপস্থিত থাকলে তো চলবে না! বিজ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। বিজ্ঞানে অনেক রকম শক্তি বা এনার্জির কথা রয়েছে। একটা শক্তিকে আর একটা শক্তিতে ট্রান্সফর্ম করা যায়। আমি যদি অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা ধরি, তাহলে কোন্ শক্তিকে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে ট্রান্সফর্ম করব? আবার অতিপ্রাকৃত শক্তিকেই বা কোন্ শক্তিতে ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানা বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব।

নয় : দেব-দেবীদের মূর্তি কি ঈশ্বরের মডেল বা প্রতীক?

ঈশ্বর-বিশ্বাসী বহু বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এই বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে তিনপো ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে এক-পো প্রগতিশীলতা মিশিয়ে বলেন—ঈশ্বরের মূর্তি হল একটা 'মডেল' বা 'প্রতীক'। যাঁরা নিরাকার ভেবে তাঁর উপাসনা করেন, তাঁরাও এই ধরনের মডেল বা প্রতীককে উপাসনা করে ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হন।

অর্থাৎ, দেব-দেবীদের মূর্তি প্রতীক বা মডেল মাত্র। বাস্তবে তা কখনই আকার ধারণ করতে পারে না।

বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের যুক্তি হাজির করেন, তাঁরা হিন্দু বাঙালি হলে একটি বার জিজ্ঞেস করুন-"তাহলে রামকৃষ্ণদেবের মা-কালী দেখার ব্যাপারটা আপনি একেবারেই 'বোগাস' বলছেন?" অমনি দেখতে পাবেন, ওদের একপো প্রগতিশীলতা মুহূর্তে 'ভ্যানিস' হয়ে স্ববিরোধিতার মূর্খতা প্রকট হয়ে ওঠেছে। ওঁরা একই সঙ্গে ঈশ্বরের মূর্তিকে 'মডেল' বলেন এবং রামকৃষ্ণের কালী দেখা, কালীর সঙ্গে কথা বলাকেও 'সত্যি' বলেন। অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে রামকৃষ্ণের স্থান নেন অন্য কোনও অবতার—যাঁরা একইভাবে ঈশ্বর দেখার দাবিদার।

ঈশ্বর ধারণাকে স্পষ্ট করতে স্পষ্ট সংজ্ঞা চাই—দেব-দেবীর মূর্তি কি 'প্রতীক' মাত্র? না কি বাস্তব সত্য?

দশ : ঈশ্বর কি শক্তি, না মানুষের মতই চিন্তা করতে পারেন?

অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষ আছেন, বহু ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী আছেন, যাঁদের ধারণায়, ঈশ্বর একটা শক্তি এবং তন্ত্রে-মন্ত্রে-ধ্যানে ঈশ্বরকে তুষ্ট করে মানসিক জোর, শক্তি পথনির্দেশ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের এই সংজ্ঞাকে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এর মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা রয়েছে। ঈশ্বর 'শক্তি' হলে ঈশ্বরের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ থাকার প্রশ্ন নেই। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি 'রিচুয়াল' সব ব্যাপার-স্যাপারই অর্থহীন হতে বাধ্য। আর, ঈশ্বরের মানুষের মত চিন্তা করার ক্ষমতা আছে ধরে নিলে, ঈশ্বরকে 'একটা শক্তি' সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না।

○

ঈশ্বর 'শক্তি' হলে ঈশ্বরের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ থাকার প্রশ্ন নেই। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি 'রিচুয়াল' সব ব্যাপার-স্যাপারই অর্থহীন হতে বাধ্য।

○

এগারো : বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক শক্তির আর এক নামই কি ঈশ্বর?

"এই যে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে, বিশ্বের প্রতিটি কাজ-কর্মকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধে রেখেই সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে যে শক্তি সেই শক্তিরই আর এক নাম ঈশ্বর।"—এমনতর যুক্তি পেশী ফোলাচ্ছে অভিজাত, ইন্টালেকচুয়াল আর সেলিব্রেটিদের অজ্ঞতার জোরে। সাদা-মাটা যুক্তিতে নির্বোধ অজ্ঞতার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে সাফ করলেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে কিছু প্রশ্ন। আসুন, প্রশ্নগুলো নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি।

যুক্তির খাতিরে আমরা মেনে নিচ্ছি—স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপী ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব এক সময় সৃষ্টি করেছিলেন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। ধরে নিচ্ছি, তারপর থেকে আজও ঈশ্বর মহাবিশ্বের সবকিছুকে সুনির্দিষ্ট এক নিয়মতন্ত্রের মধ্যে চালনা করে চলেছেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ঘটিয়ে চলেছেন শক্তির রূপান্তর। আমরা এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে তিনটি বিষয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে অতি প্রয়োজনীয় আলোচনাটুকু সেরে নেব।

•

সময় বা কাল : সময় বা কালকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। অতীত বা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। 'অতীত' বা 'ভূত' মানে—যা ঘটে গেছে। 'ভবিষ্যৎ'—যা ঘটবে। 'বর্তমান', অর্থাৎ যা ঘটে চলেছে। অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলই হল 'বর্তমান'। আবার এ'কথাও ঠিক, সময় এত দ্রুতগতিতে অতীতে চলে যায় যে 'বর্তমান' শব্দটি উচ্চারণ করার সময়টুকু পর্যন্ত 'বর্তমান' অপেক্ষা করে না। বস্তুত, এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ও 'সময়' বা 'কাল' দাঁড়িয়ে থাকে না, 'বর্তমান' শব্দটিকে সার্থক করে তুলতে।

আমরা বলি 'বর্তমান বছরে', 'বর্তমান দশকে', 'বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' ইত্যাদি শব্দ। একইভাবে আমরা বলি—"মারাদোনা বিদ্যুৎগতিতে বলটা কাটিয়ে নিয়ে গেল"। কিন্তু এ'কথার মানে যেমন বাস্তবিকই মারাদোনার

বল নিয়ে ছোটার গতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার নয়, তেমনই 'বর্তমান বছর' ও 'বর্তমান দশক'-এর মধ্যেও ঢুকে আছে অতীত সময়।

ঈশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন কোনও এক সময়। কিন্তু সেই 'সময়'কে সৃষ্টি করলেন কোন্ সময়ে? 'সময়' কি সৃষ্ট? না, অসৃষ্ট? 'সময়' কি ঈশ্বরের সৃষ্টি? না, ঈশ্বরের মতই স্বয়ম্ভু? 'স্বয়ম্ভু' হলে 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর'—এই বক্তব্যই মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না কি? আর, স্বয়ম্ভু না হলে আবার সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে—ঈশ্বর সময়কে সৃষ্টি করলেন কোন্ সময়ে?

○

ঈশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন কোনও এক সময়। কিন্তু সেই 'সময়'কে সৃষ্টি করলেন কোন্ সময়ে?

○

স্থান ঃ এই যে আপনি আমি হাঁটছি, চলছি-ফিরছি, প্রতিটি মুহূর্তেই আপনার আমার শরীরের অস্তিত্ব কোনও না কোনও স্থান দখল করে থাকছে। এই স্থান কখনও বাড়ি, কখনও অফিস, কখনও বা বাসের পাদানিতে। শুধু আপনি বা আমি নই, প্রতিটি পদার্থই কোনও না কোনও স্থান দখল করে রয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। পৃথিবী সৃষ্টির পর তার সূর্য-পরিক্রমার গতিপথ ক্রমপর্যায়ে যে স্থানসমূহ দখল ও ত্যাগ করে চলেছে, সেই স্থানসমূহের অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্মের আগে অবশ্যই ছিল। শুধুমাত্র পৃথিবীর ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি উপগ্রহ-গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। এরা সৃষ্টি থেকেই কোনও না কোনও 'স্থান'--এ অবস্থান করছে। এরা ধ্বংস হয়ে গেলেও 'স্থান' সমূহ ধ্বংস হবে না। একইভাবে থেকে যাবে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বরই যদি 'স্থান'—এর (Space) স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তবে সেই 'স্থান'কে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন কোন্ 'স্থান'-এ বসে? নাকি 'স্থান' ঈশ্বরের মতই স্বয়ম্ভু? স্বয়ম্ভু হলে সব কিছুরই স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া যায় না।

○

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বরই যদি 'স্থান'—এর (Space) স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তবে সেই 'স্থান'কে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন কোন্ 'স্থান'-এ বসে? নাকি 'স্থান' ঈশ্বরের মতই স্বয়ম্ভু? স্বয়ম্ভু হলে সব কিছুরই স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া যায় না।

○

নিয়মতন্ত্র ঃ আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকে নিয়মতন্ত্রে বেঁধে রেখেছে যে 'শক্তি', সেই শক্তির নাম 'ঈশ্বর'। এইবার আসুন দেখি, ঈশ্বর কতটা নিয়মতান্ত্রিক। 'নিয়মতন্ত্র' হল একটি নির্ধারিত বিধান

বা নিয়মের অনুসরণ। এই নিয়ম বা বিধান লঙ্ঘনের অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা। ঈশ্বর নিয়মতান্ত্রিক হলে তাঁর কৃপালাভের জন্য পূজা, ধ্যান, যোগসাধনা সহ সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই অমূলক ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ ঈশ্বর নিয়মতান্ত্রিক হলে তিনি ভক্তের অনুরোধ রাখতে কোনও ভাবেই কৃপা বিলোতে পারেন না। অন্যের অনুরোধ রক্ষার অর্থই হল আপন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ কবা। নিজের নিয়ম মত যা করতেন, তা না করা। নিয়মতান্ত্রিক ঈশ্বর ভজনার ফল সব সময়ই শূন্য হতে বাধ্য।

ঈশ্বর একই সঙ্গে 'নিয়মতান্ত্রিক' ও 'ভক্তের ভগবান' হতে পারেন না। দুটি একই সঙ্গে হওয়া সোনার পাথরবাটির মতই অসম্ভব।

○

ঈশ্বর একই সঙ্গে 'নিয়মতান্ত্রিক' ও 'ভক্তের ভগবান' হতে পারেন না। দুটি একই সঙ্গে হওয়া সোনার পাথরবাটির মতই অসম্ভব।

○

এত সবের পরও ঈশ্বরকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক শক্তি বলাটা হাস্যকর পর্যায়ে দাঁড়ায় না কি?

'সৃষ্টি থাকলে স্রষ্টা থাকতেই হবে'—যাঁরা এমন যুক্তির অবতারণা করে ঈশ্বরকে 'জগৎ স্রষ্টা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি হাজির করে জিজ্ঞেস করা যায়, ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?

উত্তর—'স্বয়ম্ভু' হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে স্বয়ম্ভু ভাবতে অসুবিধে কোথায়—এ' প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসবে যুক্তির হাত ধরে। অধ্যাত্মবাদী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা এই যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়ে উঠুন, নতুবা তাঁদের ঈশ্বর, জিজ্ঞাসার মুখে বার বার মুখ থুবড়ে পড়বেন।

বারো : প্রকৃতির নিয়ম-ই কি ঈশ্বর? না, নিয়মের কর্তা ঈশ্বর?

'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অসীমা চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, "এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে চলছে, গ্রহ-উপগ্রহ-তারকারা ঠিকমতো ঘুরছে—দিন হচ্ছে, রাত্রি হচ্ছে ; ভোর হতেই পাখিরা ডেকে উঠছে, আবার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে যাচ্ছে ; মানুষ জন্মাচ্ছে এবং যে জন্মাচ্ছে সে মারা যাচ্ছে—গোটা জগৎ যে একটা নিয়মবন্ধনে চলছে, এর নিশ্চয় একজন কর্তা আছেন। কর্তা ছাড়া তো কর্ম হয় না! বিশ্বনিয়ন্ত্রণের এই যে মহাকর্তা, তিনিই ঈশ্বর। তাঁকে আপনি পরমব্রহ্ম বলুন বা মহাশক্তি বলুন বা উপনিষদের মহালক্ষ্মী বলুন, আমি তাঁকে ঈশ্বর বলছি।"

অনেক বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতির নিয়মের একজন কর্তা আছেন ধারণা করে সেই কর্তাকেই 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা দিচ্ছেন।

অনেক বুদ্ধিজীবী আবার প্রকৃতির নিয়মকেই 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা দিচ্ছেন। আমরা কোন্ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করব? প্রকৃতির নিয়ম-ই ঈশ্বর? না, নিয়মের কর্তা ঈশ্বর?

প্রকৃতির নিয়মকে কেউ যদি 'ঈশ্বর' বলেন, বলতে পারেন। অসুবিধে দেখি না। 'না-ঈশ্বর'ও বলতে পারেন। তাতেও অসুবিধে দেখি না। সেই একটা কথা আছে না, 'গোলাপকে যে নামেই ডাকুক...'। তবে প্রকৃতির নিয়মকে যাঁরা ঈশ্বর বলেন, তাঁরা আবার একই সঙ্গে মন্ত্রে-তন্ত্রে-ধ্যানে বা ঈশ্বর-দর্শনে বিশ্বাসী হলেই বেজায় গণ্ডগোল দেখা দেবে। স্ববিরোধিতার গণ্ডগোল।

প্রকৃতির নিয়মকে যাঁরা ঈশ্বর বলেন, তাঁরা আবার একই সঙ্গে মন্ত্রে-তন্ত্রে-ধ্যানে বা ঈশ্বর-দর্শনে বিশ্বাসী হলেই বেজায় গণ্ডগোল দেখা দেবে। স্ববিরোধিতার গণ্ডগোল।

যাঁরা প্রকৃতির নিয়মের কর্তাকে ঈশ্বর বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে একটি বিনীত প্রশ্ন আছে—বিশ্বকে চালাবার জন্য যদি একজন কর্তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে সেই কর্তাটিকে চালাবার জন্যেও তো একজন কর্তার থাকাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এভাবে তাঁর কর্তা, তাঁর কর্তা করতে করতে ব্যাপারটা চলতেই থাকবে।

আমাদের এমন বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা যদি বলেন, "ওই কর্তা বা ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ", তাহলে আমরাও একই যুক্তির সাহায্য নিয়ে বলব—এই 'স্বয়ম্ভূ' শব্দটা প্রকৃতির বা প্রকৃতির নিয়মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অসুবিধে কোথায়? না, তাত্ত্বিকভাবেই কোনও অসুবিধে নেই।

তেরো : ঈশ্বর দয়ালু না ন্যায়পরায়ণ?

ঈশ্বরকে 'শক্তি' বা 'প্রকৃতির নিয়ম' ইত্যাদি সংজ্ঞায় আটকালে তাত্ত্বিকভাবেই ঈশ্বরকে 'দয়ালু' বা 'ন্যায়পরায়ণ' ইত্যাদি গুণে ভূষিত করা যায় না। ঈশ্বর দয়ালু বা ন্যায়পরায়ণ হলে সেই ঈশ্বর কখনই শক্তি জাতীয় কিছু না হয়ে সাকার হতে বাধ্য।

ঈশ্বর সাকার হলেও তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে 'দয়ালু' ও 'ন্যায়পরায়ণ' হওয়া সম্ভব নয়। ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে যাকে যে কর্মফল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ন্যায়বিচারক ঈশ্বর, তা শাস্তিপ্রাপ্তের প্রার্থনায় লাঘব করে দিলে ন্যায়কে বজায় রাখা হয় না।

ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে যাকে যে কর্মফল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ন্যায়বিচারক ঈশ্বর, তা শাস্তিপ্রাপ্তের প্রার্থনায় লাঘব করে দিলে ন্যায়কে বজায় রাখা হয় না।

ভাবুন না, আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থাকেই উদাহরণ ধরে নিয়ে ভাবুন। বিচারক একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হলেন, সে একজন বালিকাকে খুন করেছে। অপরাধী বিচারকের তুষ্টি সাধন করে যদি নিজের শাস্তিকে লঘু বা লাঘব করতে সক্ষম হয়, তারপরও কি আমরা বিচারককে 'ন্যায়পরায়ণ' বলব ? না কি বলব 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ? আমাদের চোখে যা 'দুর্নীতি', অপরাধীর চোখে তা 'দয়া' বলে মনে হতে পারে। এই 'দয়া'-ই 'ন্যায়'-এর প্রতিবন্ধক। একই সঙ্গে 'দয়ালু' ও 'ন্যায়পরায়ণ' হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা স্পষ্ট সংজ্ঞা দিন—ঈশ্বর 'দয়ালু' অথবা 'ন্যায়পরায়ণ'।

ঈশ্বর 'দয়ালু' না 'ন্যায়পরায়ণ' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনটি প্রধান ধর্মের তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কী জবাব আমি পেয়েছিলাম, আপনাদের সামনে তা তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না।

মাদার টেরিজা তখনও নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি। তবে, পাবেন পাবেন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের পত্রিকা 'ধনধান্যে'র হয়ে মাদারের কাজ-কর্মের উপর কিছুটা হদিস পেতে হাজির হয়েছিলাম টেরিজার কাছে। এক সময় টেরিজা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বলেছিলেন, "যিশু তোমাদের মঙ্গল করুন।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "যিশু কি সত্যিই দয়ালু ?"

—"নিশ্চয়ই। উনি পরম দয়ালু, পরম মঙ্গলময়।"

—"যিশু কি ন্যায়পরায়ণ ?"

—"নিশ্চয়ই। যিশু ন্যায়ের প্রতীক।"

সালটা ১৯৯০। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে মহম্মদ আলিতে রূপান্তরিত। আল্লায় নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহর গুণকীর্তনে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। ডিসেম্বরের শীতেও সাংবাদিকদের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঞ্চি চারেক শূন্যে উঠে গিয়ে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, না ম্যাজিক নয়। আল্লার কৃপায় শূন্যে ভেসে থাকছেন।

দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে ভিড় করা সাংবাদিকরা যা দেখছেন, তা কোনও স্টেজে দেখাননি আলি। দেখিয়েছিলেন কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলের লাউঞ্জে।

এই শূন্যে ভাসার পিছনে আল্লার কৃপা, না লৌকিক কৌশল কাজ করেছিল, সেটা খুঁজে বের করতেই আমি তাজ বেঙ্গলে গিয়েছিলাম 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে।

কারণটা খুঁজে বের করে সাংবাদিকদের সামনে একইভাবে শূন্যে ভেসে ছিলাম। প্রমাণ করেছিলাম আলির শূন্যে ভেসে থাকার পিছনে আল্লার কৃপা ছিল না, ছিল লৌকিক কৌশল। সে খবরও ছবি সহ প্রকাশিত হয়েছিল

আজকাল-এর পাতাতেই। কিন্তু সেই লৌকিক কৌশল বর্ণনার জন্য বর্তমানে আমার কলম গতিশীল নয়। এই সময় আমার সঙ্গে আলির যে দারুণ আড্ডা জমে উঠেছিল, তাতে আল্লাহ'র প্রসঙ্গ এসেছিল। প্রশ্ন রেখেছিলাম, "তোমার কি ধারণা, আল্লাহ পরম দয়ালু ও পরম মঙ্গলময়।"

আলি দৃঢ় মত প্রকাশ করেছিলেন, "নিশ্চয়ই।"

—"আল্লার ন্যায়পরায়ণতার উপর তোমার কতখানি বিশ্বাস আছে?"

—"আমার অস্তিত্বে আমি যতখানি বিশ্বাস করি।"

পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য ঈশ্বর প্রসঙ্গে আমাকে যা বলেছিলেন, তাতে টেরিজা ও আলির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিল ছিল। তখনও শঙ্করাচার্য নারীদের বেদ পড়ার অধিকার নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি। প্রফুল্ল চিত্তে রাজনৈতিক নেতাদের মাথায় আপন পা ঠেকিয়ে এবং বাবরি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে মাঝে-মধ্যে সাজেশন-টাজেশন দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গা ঘষাঘষির মধ্যে নিজের কর্মকাণ্ডকে কিঞ্চিত ব্যাপ্ত করেছেন। দক্ষিণ কলকাতার ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে দুটি জিনিস পোষার যেন হুজুগ লেগেছে। এক, কুকুর ; দুই, গুরু। এমনই এক পরিবারে জগৎগুরুর আবির্ভাবের খবর পেয়ে ছুটতে হয়েছিল। জগৎগুরু শঙ্করাচার্যকে অনেক প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ে। শঙ্করাচার্য স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন—ঈশ্বর পরম দয়ালু। পরম মঙ্গলময়। শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ।

এমনতর উত্তর শুনে এর আগে টেরিজা ও আলির কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিলাম, সেই প্রশ্নই রাখলাম, "তাত্ত্বিকভাবেই কারও পক্ষেই একই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়া সম্ভব নয়। ন্যায় বিচারে যে মানুষের যেমনটি প্রাপ্য, তা পাল্টে দেয় 'দয়া'। তাই একই সঙ্গে দয়ালু ও ন্যায়বিচারক হওয়া বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়। এমন একটি চরিত্র (যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈশ্বর') শুধুমাত্র যুক্তিহীন কল্পনা বিলাসীদের পক্ষেই আঁকা সম্ভব। এ বিষয়ে আপনার যুক্তি থাকলে রাখুন। আগ্রহের সঙ্গে শুনব।

"দ্বিতীয়ত তাত্ত্বিক ভাবেই ঈশ্বরকে 'পরম মঙ্গলময়' বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যখন একজন নারী ধর্ষিতা হন, তখন সমাজের বা নারীটির কোন্ মঙ্গল সাধিত হয়, জানাবেন? প্রতিটি দুর্নীতির পিছনেই যদি ঈশ্বরের মঙ্গলাশিসকে মেনে নিতে হয়, তাহলে আপনারা সুনীতির উপদেশ-টুপদেশ দেন কেন? একি আপনাদের স্ববিরোধিতা নয়? দুর্নীতির পিছনে ঈশ্বরের মঙ্গলাশিস আছে, আবার ঈশ্বর ন্যায়নীতির ধারক-বাহক--এমন একটা স্ববিরোধী চরিত্রের বাস্তব অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। তাই নয় কি?"

তিন জনই আরও একটি বিষয়ে কাঁটায় কাঁটায় মিল দেখিয়ে ছিলেন। প্রত্যেকেই আমার প্রশ্নের ক্ষেত্রে কঠোর নীরবতা পালন করেছিলেন।

চোদ্দ : ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান ?

বহু ঈশ্বর বিশ্বাসীর ধারণায় 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান'। ঈশ্বর সম্বন্ধে আরোপিত এই সংজ্ঞা কতটা গ্রহণযোগ্য দেখা যাক। দেখা যাক, বাস্তবিকই 'সর্বশক্তিমান' কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি না ?

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলে যা-ইচ্ছে-তাই করার ক্ষমতা তাঁর থাকা উচিত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি পারেন পৃথিবীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে 'দুধ-ভাতে' রাখতে ? ঈশ্বর কি পারেন একটা পাথর খণ্ড ফেললে নীচে পড়তে না দিয়ে উপরে উঠিয়ে নিতে ? 'ঈশ্বর' নামক এই 'সর্বশক্তিমান' না পারেন সমাজনীতি পাল্টাতে, না পারেন অর্থনীতি পাল্টাতে, না পারেন প্রকৃতির নিয়ম পাল্টাতে।

O

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি পারেন পৃথিবীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে 'দুধ-ভাতে' রাখতে ?

O

ঈশ্বরের 'সর্বশক্তি' পুরোপুরি মানুষ-নির্ভর। মানুষ যেদিন এইডসের ওষুধ আবিষ্কার করতে পারবে, সেদিন থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পাবেন এইডস রোগী সারাবার ক্ষমতা, তার আগে রোগী সারাবার সামান্য ক্ষমতাও ঈশ্বরের নেই।

এরপরও কি ঈশ্বরকে 'সর্বশক্তিমান' সংজ্ঞায় ভূষিত করা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে ?

পনের : 'ঈশ্বর-বিশ্বাস' ও 'পুরুষকারে-বিশ্বাস' একই সঙ্গে থাকতে পারে কি ?

আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাসী ? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে, পরের প্রশ্নটা হবে—আপনি কি বিশ্বাস করেন 'পুরুষকার'—এ ? এ'বারও উত্তরটা অবশ্যই 'হ্যাঁ' হবে, যেমনটি প্রতিটি ধর্মগুরু ও অধ্যাত্মগুরুদের বেলায় হয়েছে। ১৯৮৫-র ১৮ এপ্রিল প্রচারিত এক বেতার অনুষ্ঠানে স্বঘোষিত জ্যোতিষ সম্রাট ও অধ্যাত্মবাদী নেতা শুকদেব গোস্বামী আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, বশিষ্ঠ্য মুনি রামচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন—হে রামচন্দ্র, পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছে ও গ্রহ-নক্ষত্র নির্ধারিত ভাগ্যকে অতিক্রম করা সম্ভব।

'৯২-এর অক্টোবরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিশাল মাপের খ্রিস্ট ধর্মগুরু মরিস সেরুলো কলকাতায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানালেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন প্রভু যিশু। আবার পুরুষকারের প্রশ্নে জানালেন—পুরুষকার দ্বারা অনেক 'না' কেই 'হ্যাঁ' করা যায়।

বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা ধর্মগুরু হুজুর সাঈদাবাদী, যিনি মনে করেন, আল্লাহের ইচ্ছা হলে পুরুষের পেটেও সন্তান আসতে পারে, তিনি আবার এ'কথাও মনে করেন—পুরুষকারের একটা ভূমিকা আছে।

যিশুর পরম ভক্ত মাদার টেরিজা, যিনি কিনা সবেতেই পরম করুণাময় যিশুর হাত দেখতে পান, তিনিও কিন্তু পুরুষকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। একবার টেরিজার সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। টেরিজা শেষে জনগণের উদ্দেশে যিশুর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ে জনগণকে আর্তের সেবায় এগিয়ে আসতে বললেন।

টেরিজাকে বললাম, পরম করুণাময় যিশু একটু কৃপা করলেই তো আর্তরা আর আর্ত থাকে না। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যিশু এমনটা করছেন না কেন ? নিদেনপক্ষে পরমকরুণাময় যিশু জনগণকে আর্তের সেবায় তো নামিয়ে দিতে পারতেন ? হয় তো যিশুর ইচ্ছে নয় বলেই অ-আর্তেরা আর্তের সেবায় নামছে না।

টেরিজা জানালেন, আমি যেভাবে ভাবছি, সেটা ভুল। আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গের জন্য মানুষের চাই আর্তের প্রতি ভালবাসা, আর্তের জন্য কিছু করার ইচ্ছে ও সেটাকে কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টা।

অর্থাৎ কিনা, টেরিজাও মানুষের কাজ করার ইচ্ছে বা পুরুষকারকে স্বীকার করে নিলেন।

এইসব ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্মগুরু বা আধা-ধর্মগুরুদের অদ্ভুত স্ববিরোধিতা কেমনভাবে বেরিয়ে এসেছে, দেখলেন তো ? একবার বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া কিচ্ছুটি হবার নয় ; আর একবার বলেন, মানুষের প্রবল ইচ্ছেয় অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছেকেও পাল্টে দেওয়া সম্ভব, অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছে প্রবল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ঈশ্বরের তৈরি মানুষ যদি পুরুষকার প্রয়োগ করে যখন তখন ঈশ্বরের ইচ্ছেকে নাকচ করে দেবার ক্ষমতাই রাখে, তবে তো বলতেই হয়, মানুষের ইচ্ছেই ঈশ্বরের ইচ্ছের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এমন এক দুর্বল শক্তিকে 'সর্বশক্তিমান' বলাটা কি তবে নেহাতই পাগলামী নয় ?

○

ঈশ্বরের তৈরি মানুষ যদি পুরুষকার প্রয়োগ করে যখন তখন ঈশ্বরের ইচ্ছেকে নাকচ করে দেবার ক্ষমতাই রাখে, তবে তো বলতেই হয়, মানুষের ইচ্ছেই ঈশ্বরের ইচ্ছের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এমন এক দুর্বল শক্তিকে 'সর্বশক্তিমান' বলাটা কি তবে নেহাতই পাগলামী নয় ?

○

এই যুক্তির পরও কোনও কোনও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলতে পারেন, বলেও থাকেন—পুরুষকারেই কি সব কিছু হয় ? কিছুটা পুরুষকার ও কিছুটা ভাগ্যবিধাতার ভাগ্যের লিখন, এই দুয়ে মিলে আসে সাফল্য।

এই কথাকে সত্য বলে ধরে নিলেও কিন্তু 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান'—জাতীয়

একচেটিয়া ক্ষমতার উপর আঘাত আসছেই। এবং স্বীকার করতেই হচ্ছে, ঈশ্বর একচেটিয়া শক্তির অধিকারী নন।

এ'বার আসুন, আমরা দেখি, 'কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা' ব্যাপারটা কী? দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা না হয় রামচন্দ্রকেই বেছে নিই। এও ধরে নিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছে ও জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ অনুসারে রামচন্দ্রের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল—রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়। কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে রামচন্দ্র প্রচেষ্টার দ্বারা সেই পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেছিলেন। এখানে রামচন্দ্রের ভাগ্যে পূর্বনির্ধারিত ছিল পরাজয়, আধা-পরাজয় ও আধা-জয় নয়। অতএব রামচন্দ্রের জয়ের পিছনে যদি পুরুষকার ছিল বলেই ধরে নিতে হয়, তবে এও ধরে নিতে হবে, সেই পুরুষকার নির্ধারিত ভাগ্যকেই পাল্টে দিয়েছিল। আধা-নির্ধারিত ভাগ্যকে নয়।

'পুরুষকার' নিয়ে আলোচনায় আরও দু'একটা কথা বলে নেওয়া সঙ্গত বলে মনে করছি। 'পুরুষকার' কথার অর্থ যে 'উদ্যোগ', 'কর্মপ্রচেষ্টা' সে'কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করব উদ্যোগের পরিণতিতে সাফল্যলাভের সম্ভাবনার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে।

প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক সুপরিবেশযুক্ত সমাজে মানুষের উদ্যোগ সার্থকতা খুঁজে পায়। কিন্তু অনুন্নত দেশে, দুর্নীতির হাতে বন্দী দেশে, যেখানে জীবনযুদ্ধে পদে পদে অনিশ্চয়তা, ন্যায়নীতির অভাব, সেখানে পুরুষকার বা কর্মপ্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রেই ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয় বারবার।

উদাহরণ হিসেবে আসুন না কেন, আমাদের দেশকেই বেছে নিই। ভাবুন তো, আগামী বছর এ 'দেশের বারো লক্ষ বেকারের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হল। দেশের বেকার সংখ্যা বারো কোটি। অর্থাৎ শতকরা একজনের বেকারত্ব ঘুচবে। শতকরা নিরানব্বইজনই থেকে যাবে বেকার। শতকরা দশজন বেকার যদি কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা, পুরুষকার দ্বারা চাকরি পেতে বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়েও তোলে, তবুও প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনের পুরুষকারই জীবনযুদ্ধে বয়ে নিয়ে আসবে কেবলই ক্লান্তি ও ব্যর্থতা। আমাদের দেশের বাস্তব চিত্রটা আরও করুণ। এ'দেশে স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেতে নির্বাচিত হবার পরও লাখখানেক টাকা ডোনেশনের নামে ঘুস দেবার ক্ষমতা থাকা চাই; ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকার ডোনেশনের নামে ঘুস বা মন্ত্রীর কোটা ভাঙাবার ক্ষমতা থাকলেও চলে; অনেক প্রদেশেই সরকারি চাকরির নিলাম হয়। এদেশে নিলাম হয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে সীমান্তে চোরাচালানের অধিকার। নিলাম হয় কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে কনস্টেবলের ডিউটি।

একজন মানুষের উদ্যোগ, কর্মপ্রচেষ্টা বা পুরুষকার কতটা সাফল্য পাবে, সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সেই মানুষটি কোন্ সমাজ ব্যবস্থায়, কোন্ সমাজ কাঠামোয় বাস করছে, তার উপর।

শেষে তাত্ত্বিকভাবে এ'কথা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, ঈশ্বর দ্বারা ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হলে পুরুষকার কেন, কোনও কিছুর দ্বারাই মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বহু মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে আপনার বা আমার জীবনের ঘটনাও জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে থাকবে। প্রতিটি মানুষ সমাজ ও পরিবেশের নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। একটি মানুষও যদি পুরুষকার দ্বারা তার ঈশ্বর নির্ধারিত ভাগ্যকে পাল্টে দেয়, তবে সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়বে। সেই ভাগ্য পাল্টে দেওয়া মানুষটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত মানুষদের জীবনের অনেক ঘটনাই বদলে যেতে বাধ্য। তখন দেখা যাবে, পুরুষকার প্রয়োগ না করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের ঠিক করে দেওয়া ভাগ্য যাচ্ছে পাল্টে।

○

একটি মানুষও যদি পুরুষকার দ্বারা তার ঈশ্বর নির্ধারিত ভাগ্যকে পাল্টে দেয়, তবে সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়বে। সেই ভাগ্য পাল্টে দেওয়া মানুষটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত মানুষদের জীবনের অনেক ঘটনাই বদলে যেতে বাধ্য। তখন দেখা যাবে, পুরুষকার প্রয়োগ না করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের ঠিক করে দেওয়া ভাগ্য যাচ্ছে পাল্টে।

○

ষোল ঃ ঈশ্বর কি ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন?

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ঈশ্বর নিয়ে কথিত আছে, তাঁরা খুবই জাগ্রত। তাঁদের কাছে যে প্রার্থনা নিয়েই যাওয়া হোক, প্রার্থনা পূরণ হবেই। অনেকের ধারণায়—ঈশ্বরের সমস্ত রকম প্রার্থনা পূরণের শক্তি আছে।

এমন ধারণার বাস্তব রূপ থাকা কি আদৌ সম্ভব? ধরুন, 'বাদী' ও 'বিবাদী' দু'পক্ষই আদালতে মামলা জেতার জন্য কোনও জাগ্রত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। দু'জনেরই প্রার্থনা পূরণ কি বাস্তবে আদৌ সম্ভব? না, কখনই সম্ভব নয়।

হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এক দারুণ নামী দামি পীর—হুজুর সাইদাবাদী। তিনি দাবি করে থাকেন, সন্তানহীনাকে সন্তান দান করতে পারেন আল্লার দোয়ায়। দম্পতিকে একটি মুরগির ডিম আনতে হত। হুজুর সাহেব আল্লার দোয়া প্রার্থনা করতেন। আল্লার দোয়ায় কারও কারও হাতের কাঁচা ডিম অমনি অমনি সেদ্ধ হয়ে যেত! তারপর সেই সেদ্ধ ডিম খেলেই অবধারিত বাচ্চা।

আমাদের সমিতির এক সদস্য দম্পতি ডিম নিয়ে গিয়েছিলেন, ডিম সিদ্ধও

হয়েছিল! বর বলু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ'বার ডিমটা কে খাবে? আমি, না আমার বউ জয়া?"

বলুর কথা শুনে 'হা-হা' করে উঠেছিলেন হুজুর সাহেব। বলেছিলেন—"আপনি খাইলে আল্লার দোয়ায় আপনার প্যাডেই বাচ্চা হইব।"

হুজুরের ডিম সিদ্ধ করে দেওয়া ও মা হতে ইচ্ছুককে মাতৃত্ব দানের পিছনে কোনও রহস্য ছিল না, ছিল বিজ্ঞান। সে রহস্য আমরা উন্মোচিত করেছিলাম। 'আজকাল' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে, আরও বিস্তৃতভাবে 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' গ্রন্থে প্রকাশিত হবে। এখানে প্রসঙ্গ হুজুরের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্যভেদ নয়, প্রসঙ্গ—আল্লার দোয়ায় পুরুষের পেটে আদৌ বাচ্চা হওয়া সম্ভব কি না?

একদমই নয়। কোনও পুরুষ যত আন্তরিকতার সঙ্গেই যে কোনও ধর্মের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন না কেন—'আমার পেটে সন্তান এনে দাও', কোনও ঈশ্বরেরই ক্ষমতা নেই সেই প্রার্থনা পূরণ করার।

আচ্ছা, আমি যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এক মাসের মধ্যে পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে যুক্তিবাদী করে দাও, করতে পারবেন ঈশ্বর? আমি যদি প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এক বছরের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত কর, পারবেন ঈশ্বর? আমি যদি প্রার্থনা করি এই শতকের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে দাও, গড়ে দিতে পারবেন ঈশ্বর? না, পারবেন না। আমার বদলে পৃথিবীর যতবড় অবতারই এই প্রার্থনা করুন না কেন, ঈশ্বর পারবেন না।

আমি যদি প্রার্থনা করি এই শতকের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে দাও, গড়ে দিতে পারবেন ঈশ্বর? না, পারবেন না। আমার বদলে পৃথিবীর যতবড় অবতারই এই প্রার্থনা করুন না কেন, ঈশ্বর পারবেন না।

তিনটি প্রার্থনাই রাখলাম সব ধর্মের তাবৎ ঈশ্বরদের কাছে। বই প্রকাশের দিন থেকে মাস আর বছর গোনা শুরু হবে। তারপর দেখুন, হাতে কলমে পরীক্ষা নিয়ে দেখুন ঈশ্বরের প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে।

যে তথাকথিত অবতাররা আমার এই ধরনের প্রার্থনা বিষয়ে বলবেন, "আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাসী যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা পূরণ করতে যাবেন?"—তাঁদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি, বেশ তো হে সব মানব-দরদী ঈশ্বর-স্নেহধন্য অবতারবৃন্দ, আপনারাই মানুষের স্বার্থে ঈশ্বরের কাছে তিনটির যে কোনও একটি প্রার্থনা রেখে (আর তিনটি প্রার্থনা রাখলে তো অতি উত্তম) প্রমাণ করুন আপনাদের সততা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সতেরো : ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সব কিছু হলে প্রচেষ্টা, পাপ-পুণ্যের কোনও মানে থাকে কি ?

অনেকেরই দৃঢ় ধারণা—ঈশ্বর হলেন তিনি, যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘটনা ঘটান। যাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও ঘটনা ঘটে না, ঘটবেও না। গাছের পাতাটি পর্যন্ত পড়ে না, নড়বেও না। আমরা যন্ত্র, তিনি (ঈশ্বর) যন্ত্রী।

এই ধরনের ধারণা পোষণ করেন ধর্মগুরুরা ও বহু সাধারণ মানুষ। ঈশ্বরকে এই ধরনের সংজ্ঞায় বাঁধলে সব কর্ম প্রচেষ্টাই নিরর্থক বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। ঈশ্বর বাঁচালে বাঁচবেন, মারলে মারবেন। অতএব চিকিৎসা করানো নিরর্থক। ঈশ্বর কাউকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাইলে ঠেকায় কে ? অতএব পড়াশুনার প্রয়োজন কোথায় ? চুরি যদি হবার থাকে, তাকে কি আটকানো যায় জানালার গ্রিল, দরজার আগল বা ভল্টের লোহার দরজার সাহায্য নিয়ে ? এ সবই অপ্রয়োজনীয় খরচ, বোকা-খরচ ! যুদ্ধে জেতায় যুদ্ধাস্ত্র ও সেনাদের শিক্ষা নয়। জেতার থাকলে পাটকাঠি দিয়েও মিসাইলকে ধ্বংস করা যায়।

'ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সব কিছু হচ্ছে' ধরে নিলে একদিকে সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই যেমন নিরর্থক হয়ে যায়, তেমনই কোনও ভাল কাজ বা খারাপ কাজের দায়-দায়িত্বও মানুষের উপর বর্তায় না। এই অবস্থায় পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, সবই অর্থহীন হয়ে যায়। ঈশ্বর তাঁরই খেয়াল খুশি মত মানুষকে দিয়ে ভাল-খারাপ কাজ করিয়ে নেবেন এবং মৃত্যুর পর মানুষ ঈশ্বরের খেয়াল-খুশির ফল ভোগ করবে, এটা কোনও মতেই ন্যায়বিচার হতে পারে না। বরং এ বিচারের নামে প্রহসন।

'ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সব কিছু হচ্ছে' ধরে নিলে একদিকে সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই যেমন নিরর্থক হয়ে যায়, তেমনই কোনও ভাল কাজ বা খারাপ কাজের দায়-দায়িত্বও মানুষের উপর বর্তায় না। এই অবস্থায় পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, সবই অর্থহীন হয়ে যায়।

বহু মানুষ আছেন (যাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ ধর্মগুরু) যাঁরা একই সঙ্গে মনে করেন—ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সব কিছু ঘটে চলেছে এবং পৃথিবীটা পাপে ভরে গেছে। আরও মজার কথা, এঁরা দুর্নীতি ও পাপের জন্য মানুষকেই দায়ী করেন। যাঁর অকর্মণ্যতার জন্য এত অনাচার অসাম্য দুর্নীতি, সেই ঈশ্বরকে এঁরা দায়ী করেন না। কেন করেন না ? তবে কি এঁরা ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা দেন, সেই সংজ্ঞায় মোড়া ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না ?

আঠারো : ঈশ্বর কি 'মিস্টিক' ?

ডঃ ভাস্কর বালিগা এ'দেশের খুবই নামী বিজ্ঞানী। তাঁর বিষয় নিউক্লিয়র

ফিজিক্স। ডঃ বালিগা ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞানী। ডঃ বালিগার ধারণার ঈশ্বর অনেকটা বিজ্ঞানী মৃণাল দাশগুপ্তের ধারণার ঈশ্বরের মত।

ডঃ বালিগার কথায়, "যাঁরা ঈশ্বরকে সাকার বলেন তাঁরা ঈশ্বরকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এনে ফেলেন। ঈশ্বর তাতে ছোট হয়ে যান। পাহাড়ের আকার আছে, হিমালয় পাহাড়েরও ভর-ভার পরিমাপ করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর অপরিমেয়। আবার যাঁরা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার এক শক্তি, আমার মনে হয়, তাঁরাও ঈশ্বরকে মাপের মধ্যে নিয়ে আসেন। কারণ যতো বড়ো শক্তিই হোক, বিজ্ঞানের পন্থা অনুসরণ করে সেই শক্তি পরিমাপ করা যায়। অথচ ঈশ্বর অপরিমেয়।

"সুতরাং ঈশ্বরকে সাকার অথবা নিরাকার কোনোটাই বলা যায় না। ঈশ্বর দেহধারী কোনো পুরুষ নন, আবার তাঁকে যদি দেহহীন কোনো মহাশক্তি বলি তা-ও ঠিক হয় না।"

(এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, হিন্দুদের ঈশ্বর আবার মানুষের মত নারী-পুরুষ এই দু'ভাগে বিভক্ত।)

ডঃ বালিগার ধারণায় ঈশ্বর কেমন নন, এ-তো আমরা জানতে পারলাম। জানতে কি পারলাম, তাঁর ধারণায় ঈশ্বর কেমন?

এ ব্যাপারেও তিনি স্পষ্টবাদী। সাফ জবাব, "ঈশ্বর তো একটা মিস্টিক ব্যাপার যা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারি নি।"

ডঃ বালিগার মত ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য যে সুচিন্তিত মতামত পেলাম, তাতে বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আরও তালগোল পাকিয়ে গেল।

ডঃ বালিগার ধারণাকে মানলে সব ধর্মের অবতারদের ঈশ্বর দর্শনের দাবিকেই বাতিল করতে হয়। বালিগার ধারণায় ঈশ্বর কখনও আকার বা মূর্তিতে মূর্ত হয়ে দেখা দিতে পারেন না। তাঁর ধারণায়, "ঈশ্বর মূর্তি হল একটা মডেল"। বালিগার ধারণায়—ঈশ্বর একটা উপলব্ধির ব্যাপার। এটা ধরা, ছোঁওয়া বা দেখার ব্যাপার নয়।

কীভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়?

ডঃ বালিগার উত্তর, "ধ্যানে।"

ডঃ বালিগার ধারণার ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালেন? এক ঃ ঈশ্বর নিরাকার। দুই ঃ ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার কোনওটাই নয়। তিন ঃ ঈশ্বর মিষ্টিক বা রহস্যময়। চার ঃ ঈশ্বরকে ধরা, ছোঁয়া, দেখা যায় না। পাঁচ ঃ ধ্যানে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়।

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'ঈশ্বর আছেন' প্রমাণ করা খুব সোজা! খুব কঠিন!

যাঁরা 'ঈশ্বর আছেন' প্রমাণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা এইরূপ করুন ঃ

এক ঃ ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপন করুন।

দুই ঃ সংজ্ঞায় যেন কোনও ধরনের স্ববিরোধিতা না থাকে।

তিন ঃ বিরোধিতা মেটাতে বিভিন্ন ধর্মমতগুলো তাঁদের ঈশ্বর বিষয়ক সংজ্ঞাগুলো কিছু পাল্টে-টাল্টে নিন।

চার ঃ ঈশ্বরের মূর্তির ব্যাপারটা 'প্রতীক' বা 'রূপক' অথবা 'মডেল' কিনা জানান।

পাঁচ ঃ ঈশ্বরের কাজ-কর্মের পরিধি নির্ণয় করুন। এই নির্ণয়করণ খুবই জরুরী। কারণ, 'ঈশ্বর' শক্তি, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির কোনও একটি বলে বিবেচিত হলে তাঁর কাজ-কর্মের মধ্যে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। ফলে মন্ত্র-তন্ত্র ও ঈশ্বরের স্নেহধন্য অবতারদের ভূমিকা নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে। অবান্তর হয়ে পড়ে মৃত্যু পরবর্তী পাপ-পূণ্যের বিচার ব্যবস্থার ধারণা।

ছয় ঃ আত্মার সংজ্ঞা নিরূপণ করুন। আত্মা নিয়েও 'বারো রাজপুত্তুরের তের হাঁড়ি'। ধর্মে ধর্মে মতান্তরের যেমন শেস নেই, তেমনি একই ধর্মে 'আত্মা' নিয়ে কত-না স্ববিরোধিতা।

আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করে না, এমন ধর্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যাও বিপুল। সে ক্ষেত্রে পাপ-পূণ্যের বিচারের প্রশ্নই তো তামাদি হয়ে যাচ্ছে।

সাত ঃ পরলোকে পাপ-পূণ্যের ভোগ কি শারীরিক?

আট ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে অবতারদের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

নয় ঃ বাস্তবে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব কি না জানান।

দশ ঃ তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী?

এগারো ঃ মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদি উপাসনাস্থলগুলোর ভূমিকা কী? এইসব উপাসনাস্থলের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী? ঈশ্বর কি এই উপাসনাস্থলে বিরাজ করেন? তবে কি ঈশ্বর সব-কিছুতে অবস্থান করেন না?

বারো ঃ 'ঈশ্বর আছেন'—প্রমাণ হতে পারে অতি সহজেই। যাঁরা অবতার, যাঁরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবিদার, তাঁরা তাঁদের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ, ঈশ্বর থেকেই তো ঐশ্বরিক। ঈশ্বর না থাকলে ঐশ্বরিক হয় কী করে?

'ঈশ্বর আছেন' প্রমাণ করাটা সত্যিই খুব সোজা, খুব কঠিন!

এত কিছুর পর আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি ঃ

'ঈশ্বর' সর্বকালের সেরা গুজব।

অধ্যায় ঃ আট

ঈশ্বর বিশ্বাস : নাস্তিকতা-মানবতা-যুক্তিবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

'নাস্তিকতা' ও 'মানবতা'

ধর্ম যাদের 'মানবতা', তাদের নাস্তিক বলে চিহ্নিত করলে একটা বড় রকমের ভুল করা হবে। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝাতে যা প্রয়োজন তা হল, 'নাস্তিকতাবাদ' ও 'মানবতাবাদ' নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'নাস্তিকতাবাদ' ও 'মানবতাবাদ' শব্দ দুটি সমার্থক তো নয়ই, বরং সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য রয়েছে। 'নাস্তিকতাবাদ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Atheism'। 'Atheism' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নিরীশ্বরবাদ'। অর্থাৎ 'ঈশ্বরের অস্তিত্বকে না মানা মতবাদ'।

'নাস্তিক' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ অবশ্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' বলছে, ১) যে বেদ মানে না ; যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করে না ; ২) যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদ ও পরকাল স্বীকার করে না ; ৩) দেশাচার যে মানে না।

'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত অভিধানের লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ হিসেবে যখন বলেন, 'যে বেদ মানে না ; যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করে না' তখন সেই বলার মধ্যে প্রকাশিত হয় হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের দেওয়া 'নাস্তিক' শব্দের ব্যাখ্যা।

হিন্দু ধর্মের দেওয়া 'নাস্তিক' শব্দের সংজ্ঞাটি আমরা প্রথমেই বাতিল করছি।

কারণ, এই সংজ্ঞাকে মেনে নিলে হিন্দু ধর্ম ছাড়া যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসীকেও 'নাস্তিক' বলে চিহ্নিত করতে হয়। অথচ বাস্তবে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাবলম্বীরা কেউই 'atheist'-এর দেওয়া সংজ্ঞায় পড়েন না।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যদিও 'নিরীশ্বরবাদী' অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরমাত্মায় বিশ্বাসী নয়, তবু এই দুই ধর্মকে 'নাস্তিক' বলে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। কারণ, এই দুই ধর্মই আত্মায় বিশ্বাসী এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবে, জন্মান্তরে বিশ্বাসও প্রবল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে বিশ্বাসীরাও তাঁদের ধর্মের বিধানকে তাঁদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার বা দেশাচার বলে মান্য করেন।

সাংখ্য ও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অবস্থা বেশ গোলমেলে। চিন্তায় কিছুটা বস্তুবাদের ছোঁয়া থাকলেও আত্মা-অদৃষ্ট-কর্মফল-পুনর্জন্ম-চতুর্বর্ণ ইত্যাদি বিষয়কে মেনে নিয়ে স্ববিরোধিতার আবর্তে পাক খাচ্ছে।

'নাস্তিকতাবাদ' শব্দটি আমরা কখনও কখনও 'যুক্তিবাদ' বা 'বস্তুবাদ' শব্দের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন—'বিজ্ঞান যতই এগুচ্ছে, ততই নাস্তিকতার পথে হাঁটছে'। বাক্যটিতে 'নাস্তিকতা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'যুক্তিবাদ' বা 'বস্তুবাদ' শব্দটি নিয়ে এলে বাক্যটি আরও সুবিন্যস্ত হতো। কারণ, সাধারণভাবে, মূলগতভাবে 'নাস্তিকতাবাদ' বলতে বুঝি সেই মতবাদ, যা আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে মান্য করে না। 'মানবতাবাদ'-এর সঙ্গে 'নাস্তিকতাবাদ'-এর মিল এইখানে যে, মানবতাবাদও আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে মান্য করে না। অমিলও প্রচুর।

নাস্তিকতাবাদে যুক্তিহীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁজ যতখানি উপস্থিত, ততখানিই অনুপস্থিত ভবিষ্যৎমুখী মানবতাবাদী সমাজ সচেতনতা বোধ। বহুক্ষেত্রেই নাস্তিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নাসিকতা, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক বিষয়ে স্বচ্ছ ও সুসংবদ্ধ চিন্তার অভাব। যাই হোক, আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, শুধুমাত্র আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে অস্বীকার করাই সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়ার পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট নয়। কারণ, 'নাস্তিকতাবাদ' শব্দটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাতে অনুপস্থিত থাকে মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে নিজের জীবনচর্যাকে পরিচালিত করে সমাজ-বিকাশকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা।

○

নাস্তিকতাবাদে যুক্তিহীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁজ যতখানি উপস্থিত, ততখানিই অনুপস্থিত ভবিষ্যৎমুখী মানবতাবাদী সমাজ সচেতনতা বোধ।

○

এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে এটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষের নাস্তিক্যবাদ দর্শনের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকা চার্বাক দর্শনে আর্থসামাজিক

কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ গড়ার কোনও চিন্তা ছিল না। তাই চার্বাক দর্শন গণশক্তি নির্ভর ও সক্রিয় রূপ ধারণ করতে পারেনি। এ'দেশের প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলো যেমন পরিপূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল, চার্বাকবাদীরাও ছিল তেমনই সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রীক শোষণ কাঠামোর সমর্থক। তাঁরাও মনে করতেন, "লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ"। অর্থাৎ রাজার উপরে কোনও পরমেশ্বর নেই।

O

এ'দেশের প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলো যেমন পরিপূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল, চার্বাকবাদীরাও ছিল তেমনই সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রীক শোষণ কাঠামোর সমর্থক।

O

একজন মানবতাবাদীর মধ্যে দার্শনিক আত্মোপলব্ধি রয়েছে। সে যুক্তির পথ ধরে সব কিছুকে বিচার করে। তার সংঘর্ষের মধ্যেও থাকে সুন্দর সমাজ বিকাশের প্রেরণা ; মানুষকে 'মানুষ' করে তোলার প্রেরণা। অর্থাৎ, মানবতাবাদ নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু।

নিছক নাস্তিকতাবাদ যে'হেতু এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, সে'হেতু এই মতবাদ কখনই মানুষের 'সুগুণ' বা 'সুবৈশিষ্ট্য'-এর পরিচয় বহন করে না। শুধুমাত্র 'নাস্তিকতাবাদ' বা 'নিরীশ্বরবাদিতা' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাস' মানুষের আদর্শ আচরণ বিধি বা আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে না। এবং শেষ পর্যন্ত 'নাস্তিকতাবাদ' মানুষের 'মানুষ' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, শেষতক্ 'নাস্তিকতাবাদ' মানুষের 'ধর্ম' হয়ে উঠতে পারে না।

O

শুধুমাত্র 'নাস্তিকতাবাদ' বা 'নিরীশ্বরবাদিতা' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাস' মানুষের আদর্শ আচরণ বিধি বা আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে না।

O

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই পারেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, রাষ্ট্রশক্তি ও প্রচারমাধ্যমগুলোর পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে। জনতার মগজ ধোলাইয়ের জন্য খরচ করা বিপুল শ্রম ও ব্যয়কে ফালতু করে দিতে। আপনারাই পারেন 'মানুষের ধর্ম'কে মানুষের কাছে শুভকর, ইতিবাচক ও মানবিক করে তুলতে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ থেকে চিন্তায়, কথায়, লেখায় 'ধর্ম'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করুন 'বৈশিষ্ট্য' বা 'গুণ'-এর নিরিখে। আর তবেই, এবং শুধুমাত্র তবেই, মানুষের একমাত্র 'ধর্ম' হয়ে উঠবে 'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা'।

'ধর্ম' যেখানে 'গুণ', মূল্যবোধ যেখানে 'মানবতা'

'ধর্ম' যেখানে অলীক চিন্তায় নুব্জ নয়, বেঁধে দেওয়া আচরণবিধিতে বন্দি নয়, স্থবির অনড় মূল্যবোধের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত নয়, 'ধর্ম' যেখানে 'বৈশিষ্ট্য' বা 'গুণ', 'ধর্ম' যেখানে 'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবতা' সেখানেই 'ধর্ম' শব্দটি অর্থবহ ও সার্থক হয়ে ওঠে।

যুক্তির পথ হাঁটা মানবতাবাদী মানুষের 'মূল্যবোধ' কোনও ছক বাঁধা বিধান নির্ভর হতে পারে না। সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোধ পাল্টায়। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎমুখিতার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধও পাল্টে যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধান মেনে যিনি জীবনকে চালিত করেন, তিনি ধার্মিক। 'ধার্মিক মানুষ' সমাজ সচেতন মানুষদের চোখে 'আদর্শ মানুষ' হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তার মানে এই নয় যে, 'নাস্তিক মানুষ' অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্মীয় বিধানে অবিশ্বাসী মানুষ মানেই আদর্শ মানুষ (অবশ্য হিন্দু ধর্মের বিধান-দাতা মনুর কথা মত—যে 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'র একটিকেও অবজ্ঞা করে, তাকে বেদবিরোধী ও নাস্তিক বলে গণ্য করতে হবে। ফলে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস মতে 'হিন্দু' ভিন্ন অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রেই 'নাস্তিক')।

'আদর্শ মানুষ' হতে গেলে মানুষটিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তেমনই 'মানবিক মূল্যবোধ' দ্বারা নিজের আচরণবিধিকে পরিচালিত করতে হবে।

○

'আদর্শ মানুষ' হতে গেলে মানুষটিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তেমনই 'মানবিক মূল্যবোধ' দ্বারা নিজের আচরণবিধিকে পরিচালিত করতে হবে।

○

'মূল্যবোধ' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও শব্দটির অর্থ বা সংজ্ঞা অনেকের কাছেই অধরা। সত্যি বলতে কি, প্রায়শই শব্দটি ব্যবহারকারিদের কাছেও অধরা। তাই 'মূল্যবোধ' নিয়ে আলোচনা এ'ক্ষেত্রে অতি প্রাসঙ্গিক।

'মূল্যবোধ' শব্দটি 'মূল্য' এবং 'বোধ' শব্দদুটির সমষ্টি। 'মূল্য' বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কোনও কিছুর সঙ্গে মুদ্রার বিনিময় হার। কিন্তু আমরা যদি বলি—'পথের পাঁচালী' বিদেশ থেকে সম্মান আনার আগে আমরা সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম", এই বাক্যটির ক্ষেত্রে 'মূল্য' শব্দটি 'মুদ্রার বিনিময় হার' হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে 'মূল্যায়ন' শব্দটি 'যোগ্যতা নিরূপণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'বোধ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান', 'বুদ্ধি', 'চৈতন্য', 'বোঝা' অর্থাৎ কোনও ঘটনা মস্তিস্ক-স্নায়ুকোষে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—তাই হল সে সম্পর্কে আমাদের বোধ।

'মূল্যবোধ' শব্দটির একটা গ্রহণযোগ্য অর্থ আমরা পেলাম—'যোগ্যতা বোঝা' বা 'যোগ্যতা নিরূপণ'-এর ক্ষমতা এবং প্রবণতা। Value-র বাংলা অর্থ 'যোগ্যতা'। 'Sense of value'-র বাংলা হিসেবেই আমরা 'মূল্যবোধ' শব্দটি ব্যবহার করি, 'Price'-এর বাংলা অর্থ হিসেবে নয়। এই 'মূল্যবোধ' শব্দটির সাহায্যে আমরা কোনও কিছুর ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির যোগ্যতা পরিমাপ করি।

এই 'বোধ' বা 'যোগ্যতা' বোঝার ক্ষমতা সবার সমান নয়। তথাকথিত অলৌকিক রহস্য ভেদের ক্ষেত্রে আমার যা বোধশক্তি তা একজন জারোয়ার চেয়ে যতগুণ বেশি, তারচেয়েও বোধহয় বেশিগুণ বেশি আমার ফুটবল বোধশক্তির তুলনায় পেলে বা মারাদোনার ফুটবল বোধশক্তি।

'মূল্যবোধ' আপেক্ষিক। মূল্যের যে পরিমাপ আপনি করছেন, অর্থাৎ 'যোগ্যতা নিরূপণ' করছেন, তা অন্যের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, আবার ভালও মনে হতে পারে। আপনার কাছে যা আদর্শ, অন্যের কাছে তা অনাদর্শও হতে পারে। সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোধ পাল্টায়। আবার একই দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধ পিছিয়ে থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয় মনে হতেই পারে। এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ। এক সময় নারী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি অনগ্রসর ও রক্ষণশীলদের চোখে সমাজের অবক্ষয় বলেই ঘোষিত হয়েছে। রামমোহন রায় সতীদাহ-প্রথা রোধে আন্দোলন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন অনেকের চোখেই খারাপ ঠেকেছে। তাদের মনে হয়েছে, এই আন্দোলন সমাজের অবক্ষয় ঘটাবে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তায় প্রভাবিত মানুষদের চোখে এই আন্দোলন মোটেই অবক্ষয় ছিল না, ছিল শ্রেয় মূল্যবোধ, যা সমাজ পোষণ করছে না। 'মূল্যবোধ' আপেক্ষিক বলেই বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা কারও চোখে ভাল, কারও চোখে খারাপ বলে মনে হয়েছে।

○

একই দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধ পিছিয়ে থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয় মনে হতেই পারে। এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ।

○

'মূল্যবোধ' বিষয়টিকে এবার আমরা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ভাববার চেষ্টা করি আসুন। মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যৌথ ভাবনাকে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, ব্যক্তির সমষ্টিকে নিয়েই যখন সমাজ, তখন অনেক ব্যক্তি-ভাবনার ব্যাখ্যা থেকেই

তো সমষ্টির ভাবনার হদিশ মেলা উচিত অথবা গোষ্ঠীর ভাবনা ধরে আমরা পৌঁছতে পারি ব্যক্তি ভাবনায়। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন অতি সরলীকৃত নয় যে, সবসময় ব্যক্তি ভাবনা থেকে গোষ্ঠী ভাবনায় অথবা গোষ্ঠী ভাবনা থেকে ব্যক্তি ভাবনায় পৌঁছে যাওয়া যায় সহজ সরল নিয়মের সহায়তায়। অফিস টাইমের ট্রেনের একটি লেডিজ কামরায় যদি সমীক্ষা চালান, দেখতে পাবেন, এঁদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সুকুমারবৃত্তি, সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা, নাচ, গান, সাহিত্য, নাটক, সিনেমার প্রতি টনটনে টান। এঁরাও ব্যক্তিজীবনে কারও না কারও স্নেহময়ী জননী, ভগ্নী, কারও প্রেমময়ী প্রেমিকা, কারও স্ত্রী, কারও বা কন্যা। ব্যক্তি ভাবনার এমন মহিলাদেরই সমষ্টিগত অন্য এক চেহারার পরিচয় পেয়েছি মাঝে-মধ্যে। কখনও কখনও খবরের কাগজের খবর হয়েছে—লেডিজ কম্পার্টমেন্টে হঠাৎ উঠে পড়া কোনও পুরুষকে মহিলা গোষ্ঠীর তীব্র অপমান ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। কম্পার্টমেন্টে একটি পুরুষকে একা পেতেই সম্মিলিত মহিলাদের যে নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়েছে, তার হদিশ পেতে ব্যক্তি ভাবনা ছেড়ে যৌথ ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হলেও বাড়ি যেমন শুধুমাত্র ইটের পর ইট সাজানোর ব্যাপার নয়, তেমনই ব্যক্তি নিয়ে সমাজ হলেও, সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়, বাড়তি কিছু। তাই শুধুমাত্র মনস্তত্ত্বের সাহায্যে সমাজ জীবনের ভাবনা বা সমাজ জীবনের ধারাকে ধরা নাও যেতে পারে।

অনেক সময় এমন হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে, বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার রেশ। এই ভাবনা এক থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাতে রূপ পাওয়ার মধ্যে যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা তত্ত্ব রয়েছে—সেও সমাজতত্ত্ব।

○

অনেক সময় এমন হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে, বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার রেশ।

○

'মূল্যবোধ' বিষয়টি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একটু ভাববার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের প্রকাশ ও বিকাশ তার সামাজিক পরিবেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। পরিবেশগতভাবে কিছু মানুষের মনে হতেই পারে—ঈশ্বরে অবিশ্বাস নীতিহীনতারই পরিচয়, যুক্তিহীনতারই পরিচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই পরিচয়। আবার এই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই কেউ কেউ মনে করতে পারেন—যুক্তিহীন ঈশ্বর বিশ্বাস, অদৃষ্ট-বিশ্বাস, নীতিহীন অন্ধ কুসংস্কার বই কিছুই নয়। বিপরীত মানসিকতার এই দুই শ্রেণীর মানুষই

কিন্তু পরিবেশগত ভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে, পরিচিত মানুষ, আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, প্রচারমাধ্যম, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, আলোচনা সভা, বই-পত্তর, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি অনেক কিছুই, বা এরই কোনও একটি যা মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে।

এমন বক্তব্য পেশ করার পর কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারেন, আমাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য যদি পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত না হয়ে পরিবেশ দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ আমাদের মানসিক বৃত্তির উপর বংশগতির চেয়ে পরিবেশই যদি বেশি প্রভাবশালী হয়, তবে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রেখে পশুদের মধ্যেও তো মানবিক-গুণ বা মানবিক-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো সম্ভব—এমন তত্ত্বকেও মেনে নিতে হয়।

○

আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাবপ্রকাশ করি—এসবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো

○

দু-এককথায় উত্তরটা এই—মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষেরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাবপ্রকাশ করি—এসবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে, হাঁটা-চলায়, খাদ্যাভ্যাসে, পানীয় গ্রহণের কায়দায়, ভাব বিনিময়ের পদ্ধতিতে পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মত তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না; কারণ এই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দু'য়েরই প্রভাব বিদ্যমান।

আবার একই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পরিচয়ও আমরা পাই বই কি। কেন এমনটা হয়? এই প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আসবে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন প্রবণতার কথা। যমজ হওয়ার সুবাদে একই ধরণের গাত্র-বর্ণ, একই ধরনের দেহ-গঠন এবং একই ধরনের মুখাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র—'ইন্ডিভিজুয়াল'। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা, উত্তেজনা-নিস্তেজনা, আবেগপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ধর্মগুলো ভিন্নতর। তাই একই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বেড়ে ওঠার দরুণ সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাবেরও নানা তারতম্য ঘটে, রকমফের ঘটে। এমন কি ভিন্নতর, নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষও দেখা যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয় উভয়ের সঙ্গে একটা বিরোধের ভাব পোষণ করে থাকে, সমাজতত্ত্ব যেন একটা ধারণা উপর থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে। ব্যক্তির উপর বহুর চিন্তা বা শাসকশ্রেণীর চিন্তা চাপানোর মধ্যে অনেক সময় দেখা দেয় বিরোধ।

○

সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ-মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর।

○

যে সমাজে শোষণ আছে, সে সমাজে শোষিত থাকবেই। থাকবে শোষক। শোষকরা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই চালিয়ে থাকে শাসন। নির্বাচন নির্ভর গণতন্ত্রে বাক্সে জেতার মত ভোট ফেলতে 'বুথ জ্যাম', 'রিগিং', মস্তানবাহিনী, প্রচার, এজেন্ট নিয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়—যা বিপুল ব্যয়সাধ্য, এবং যে ব্যয়ভারের প্রায় পুরোটাই জোগায় শোষকশ্রেণী। তার ফলশ্রুতিতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণী শোষকশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে বহু নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়। এই নীতিবোধ বা মূল্যবোধ ব্যাপক প্রচারের ফলে, ব্যাপক মগজ ধোলাইয়ের ফলে বহুর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে অথবা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পড়ার ফলে, কিংবা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার ফলে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই—এক : দেশপ্রেম মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়, দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের প্রতি প্রেম। দুই : সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ-মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর। তিন : ঈশ্বর, ভূত,

কর্মফল, অদৃষ্টবাদ ও অলৌকিকত্বের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। শোষক ও শাসকশ্রেণী শোষণকে কায়েম রাখতেই শোষিতদের মধ্যে এই ভ্রান্ত চিন্তাগুলোর প্রসারকামী। চার ঃ দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, যৌন স্বত্বাধিকার নয়—ইত্যাদি আরও বহুতর মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণায়, তবে এই পরিবর্তনটা হবে অবশ্যই কাম্য। পূর্বতন পুরুষদের কাছে, সংখ্যাগুরু মানুষদের কাছে, পশ্চাৎবর্তী মানুষদের কাছে, মগজ ধোলাইয়ের শিকার মানুষদের কাছে আমাদের অগ্রবর্তী চিন্তার ফসল হিসেবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধকে 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী, সুস্থচেতনার মুক্তিকামী মানুষদের কাছে এই যুগোচিত পরিবর্তিত চিন্তা মূল্যবোধের উত্তরণ, এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার অর্থ অবৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ক্ষয়। মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই 'অবক্ষয়' অবশ্যই নয়। শাসকশ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া নীতির ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আপনার, আমার সবার সব সময়ই থেকে যাবে। এই প্রতিবাদকেই আপনি, আমি সক্রিয় চেষ্টার ফলে যৌথ চেহারা দিতে পারি। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একই সঙ্গে বিরোধ এবং সংহতির।

O

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতে পারে।

O

'মানবিক মূল্যবোধ' বা নিপীড়িতের স্বার্থে, সাম্যের স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে, যুক্তির পথ ধরে উঠে আসা মূল্যবোধ-এর সঙ্গে ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের বিপরীতমুখিতা বা বিরোধ এ'কথাই প্রমাণ করে—ধর্ম যাঁদের মানবতা, তাঁদের যুক্তির বিচারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নির্দেশ মানা মূলগতভাবেই মানবিক নয়, বরং বহুক্ষেত্রেই মানবতা বিরোধী এবং আদর্শ বিরোধী জীবন যাপন পদ্ধতি।

'যুক্তিবাদ'-এর বিরুদ্ধে 'জ্ঞানবাবা'দের ষড়যন্ত্র বুর্জোয়া মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখতেই।

গভীর বিস্ময় ও শঙ্কার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, এক সময়ের টুকটুকে লাল বিপ্লবীদের কেউ কেউ এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ। এঁদের কেউ কেউ এখন 'জ্ঞানবাবা'। যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে জ্ঞানবাবারা এখন খুব ভাবছেন-টাবছেন। 'যুক্তিবাদ' নিয়ে অফুরন্ত ধারায় জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন। কারা

খাঁটি যুক্তিবাদী, কারা যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, সে বিষয়ে ওঁরা নিদান দিচ্ছেন। নিদানটা বড়ই বিচিত্র। ধর্মের ও ঈশ্বরের জায়গাটা সুরক্ষিত রেখে তারপর যাঁরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গেয়েছিলেন, গেয়ে চলেছেন, তাঁরাই এইসব বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর বিবেচনায়—একেবারে খাঁটি যুক্তিবাদী।

এইসব জ্ঞানবাবারা ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং বিপরীত চিন্তায় সহাবস্থানকারী পাশ্চাত্যের অতীতের কিছু চিন্তাবিদ্‌কে 'যুক্তিবাদের জন্মদাতা', 'যুক্তিবাদী চিন্তার পথিকৃত' ইত্যাদি বিশেষণ সহযোগে লাগাতারভাবে জনগণের সামনে পেশ করে চলেছেন। আড়কাঠির নির্দেশ মেনে এমন বক্তব্য পেশ করার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে। ধর্মে-ঈশ্বরে-যুক্তিবাদের জয়গানে সহাবস্থান করা বর্তমানের সংগঠনগুলোর দু'বাহু তুলে গুণকীর্তন করার গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁদের আছে। নীতিবোধকে বিক্রি করে দিয়ে অবস্থান পাল্টে সুবিধাবাদী হওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। সেই পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকারকেই তাঁরা কিছুদিন হল লাগাতারভাবে প্রয়োগ করে চলেছেন।

বিষয়টি স্পষ্টতর করতে একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি। পেশ করছি এক 'পত্রবীর জ্ঞানবাবা'র কিছু 'জ্ঞানগর্ভ' বক্তব্য। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আজকাল' পত্রিকায় ২৯ জুলাই ১৯৯৫।

"সপ্তদশ শতাব্দীতে গণিতবিদ রেনে দেকার্তের মননে প্রথম জন্ম নেয় যুক্তিবাদ। গ্যালিলিও গ্যালিলাই ঠিক এই সময়েই তাঁর ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যা যুক্তিবাদকে একটা শক্ত জমির উপর দাঁড় করায়। দেকার্তের পর বেনেডিক্ট স্পিনোজা এবং তাঁর সমসাময়িক লিবনিজ এবং তারও পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে এমানুয়েল কান্ট ও হেগেলের বিশ্ববীক্ষার পথ ধরেই আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদ বিস্তারিত এবং বিকশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফায়ারবাখও তুলে ধরেছেন যুক্তিবাদী তথা র‍্যাশানলিস্ট আন্দোলনের ধ্বজা। এমনকি ফরাসি যুক্তিবাদের জনক হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভলতেয়ারকেও গণ্য করা হয়।"

আধুনিক অর্থে এঁরা কেউই যুক্তিবাদী ছিলেন না। দেকার্তে ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। গ্যালিলিও ঈশ্বরের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পরম বিশ্বাসী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শন-ও ছিল ঈশ্বর-অস্তিত্বকে সঙ্গী করেই। লিবনিজ তাঁর দর্শনে সমর্থন জানিয়েছিলেন ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ক ধর্মীয় মতবাদকে। কান্ট ঈশ্বর ও আত্মার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। হেগেলীয় দর্শনের বুনিয়াদও ছিল ভাববাদী বা অলীক-কল্পনাবাদী। ভলতেয়ারও স্পষ্টতই ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। এইসব বিশিষ্ট দার্শনিক ও ব্যক্তিত্বরা তাঁদের সময়ে অন্য অনেকের থেকেই চিন্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন ; ধর্মগ্রন্থের ও ধর্মগুরুদের কিছু কিছু যুক্তি-বিরোধী বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, এ'কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও আমরা বলতে পারি—কিন্তু তাই বলে ওঁদের ভাববাদী প্রবল চিন্তার দিকটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে 'যুক্তিবাদী' বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।

এমন একটা তথ্যগত ভুলে ভরা পাতি বাজে লেখা বুঝিবা অসতর্কতায় প্রকাশিত হয়ে গেছে, ভেবে আমাদের সমিতির তরফ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক দেবাশিস্ ভট্টাচার্য এবং 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র অন্যতম সম্পাদক সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আজকাল'-এ দুটি চিঠিও দিয়েছিলেন। চিঠি দুটিতে প্রকাশিত বক্তব্যকে খণ্ডণ করে অতি স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছিল ষড়যন্ত্রের এক আভাসকে। চিঠি দুটি রেজিস্ট্রি ডাকেই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের জন্য আরও কিছু বিস্ময় বুঝিবা অপেক্ষায় ছিল। চিঠি দুটি প্রকাশিত হয়নি। পত্র না ছাপবার গণতান্ত্রিক অধিকার পত্রিকার আছে। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁরা একটুও শিথিল হতে দেননি। এই অধিকার রক্ষার মধ্য দিয়ে এটুকু অবশ্য আমাদের ভাবার সুযোগ দিয়েছে, তথাকথিত এইসব বুদ্ধিজীবীদের এ'জাতীয় হাস্যকর লেখার পিছনে তাদের সমর্থন আছে।

তা, সমর্থন থাকতেই পারে, আর পাঁচটা পত্রিকার থেকে তাদের আলাদা করে 'বিপ্লবী' বা 'প্রগতিশীল' ইত্যাদি বলে কখনই আমরা ভাবিনি। কারণ, এই পত্রিকার পিছনেও মূলধন খাটছে কোটিপতি ব্যবসায়ীর। তাঁর কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এটাও একটা ব্যবসা। কাস্টমার ধরার জন্য প্রগতিশীলতা'র মুখোশ মুখে সাঁটা হয়েছে মাত্র। আর সম্পাদক থেকে সাংবাদিক প্রত্যেকেই মালিকের আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র। এঁরা স্বাধীন মালিকের পরাধীন কর্মচারী।

আমাদের কাছেও আমরা পরিস্কার। আমরা চাই প্রতিটি প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমাদের মতাদর্শকে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

এমন একটি উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবেন না, যেখানে আমাদের দিয়ে প্রচার মাধ্যম এই সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কিছু বলাতে পেরেছেন বা লেখাতে পেরেছেন।

○

এমন একটি উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবেন না, যেখানে আমাদের দিয়ে প্রচার মাধ্যম এই সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কিছু বলাতে পেরেছেন বা লেখাতে পেরেছেন।

○

'জ্ঞানবাবা' চিহ্নিত যুক্তিবাদীরা আধুনিক যুক্তিবাদের মাপ-কাঠিতে 'যুক্তিবাদী' কিনা, এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকতে আধুনিক যুক্তিবাদ কী, তা এখানে বোঝাতে বসব না। 'যুক্তিবাদ' প্রসঙ্গে যাঁরা বিস্তৃত জানতে ইচ্ছুক, তাঁদের অনুরোধ করব, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর চতুর্থ খণ্ডে অথবা 'সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ' গ্রন্থে চোখ বোলাতে।

যাঁরা বিভিন্ন দর্শন নিয়ে পড়াশুনো করেননি, 'যুক্তিবাদ' বিষয়ে ভাসা-ভাসা কিছু শুনেছেন, সেই আমজনতাও তাঁদের সাধারণ বোধবুদ্ধির সাহায্য নিয়েই বুঝে নিতে পারবেন, কিছু যুক্তিহীন বিশ্বাসের বিরোধিতার পাশাপাশি কিছু যুক্তিহীন

বিশ্বাসকে মেনে নেওয়া আর যাই হোক, যুক্তিবাদী মানসিকতার লক্ষণ নয়। দর্শন সম্পর্কে অতি অল্প জানা মানুষও জানেন, আলোচ্য ওইসব দার্শনিকদের কেউই আধুনিক অর্থে 'যুক্তিবাদী' ছিলেন না।

সাধারণ বুদ্ধির মানুষদের যা জানা, তা কি এইসব বুদ্ধিজীবী জ্ঞানবাবাদের অজানা ?

একজন 'জ্ঞানবাবা' এমনটা লিখলে না হয় সেটা তাঁর অজ্ঞানতা বলে ভাবার অবকাশ থাকলেও বা থাকতে পারত। কিন্তু তা তো নয় ! সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা-পত্তরে চোখ বোলালেই দেখতে পাব এমন হাস্যকর মিথ্যে একগুচ্ছ 'জ্ঞানবাবা'দের কলম থেকে নিঃসারিত হয়েই চলেছে।

কেন এমন ছেলেমানুষী মিথ্যে প্রচার করা হচ্ছে ? উদ্দেশ্যহীন কোনও পাগলামী কি প্রচার মাধ্যমগুলোতে ভর করেছে ? নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও গভীর গোপন উদ্দেশ্য ?

কেউ কেউ এর পিছনে উদ্দেশ্যের পরিবর্তে লেখকদের অজ্ঞতাকে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু এ'সব লেখা যে অজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়, তারই একটা প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি।

স্পিনেজো থেকে হেগেলকে যুক্তিবাদী বলে 'আজকাল' পত্রিকায় সোচ্চার হওয়া এই লেখকটি ১৯৯২ সালের 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় স্পিনোজা থেকে হেগেলকে ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

মাত্র তিন বছরে কী এমন হল যে 'পত্রবীর' বাবুটিকে ডিগবাজি খেতে হল ?

বাবু-বিপ্লবীটির গভীর গোপন ষড়যন্ত্র বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না, যখন দেখি তিনি 'আজকাল'-এর ওই লেখাটিতেই জানাচ্ছেন, "কার্ল-মার্কস তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কান্ট, হেগেল এবং ফয়ারবাখকে দুরন্ত খণ্ডণের মধ্য দিয়ে।"

অর্থাৎ, লেখক পাঠক-পাঠিকাদের মগজে ঢোকাতে চাইলেন—যুক্তিবাদের এইসব পীর-পয়গম্বরদের কুযুক্তিকে খণ্ডন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন। অর্থাৎ কার্ল মার্কসের দর্শন ছিল যুক্তিবাদ বিরোধী। কিন্তু বলাই বাহুল্য, মার্কসীয় দর্শন যুক্তিবাদের পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই জ্ঞানদানকারী লেখক নিঃসঙ্গ নন। সঙ্গী আরও অনেক 'জ্ঞানবাবা'ই এই একই নিপাট মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন।

ওই লেখক 'আজকাল'-এর ওই লেখাটিতে শুধু এ'পর্যন্ত বলেই কিন্তু থেমে থাকেননি। আরও একটু এগিয়ে বলেছেন—অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদী আন্দোলন আখেরে বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করবে।

এতক্ষণে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরুল ! মজাটা হল, এই একই ধরণের বক্তব্য অনেক 'জ্ঞানবাবা'দের কণ্ঠে ও কলমে সম্প্রতি উৎসারিত। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যুক্তিবাদী চিন্তার আগ্রাসনকে

ঠেকানো। এই ষড়যন্ত্রের আর এক অগ্রণী অংশীদার দেড় যুগ জেল খেটে আপসের রোদে গায়ের টুকটুকে লালকে এখন গোলাপী করার সুবাদে সব রকম লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে গর্বিত ঘোষণা রাখেন, "ইসলাম ইজ দ্য কমিউনিজম অব টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি।" [কোরক সাহিত্য পত্রিকা, মে—আগস্ট, '৯৫ সংখ্যা, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা-৩৬]

ওই মৌলবাদী 'গোলাপী জ্ঞানবাবা' তাঁর সাম্প্রতিক একটি লেখায় আর একটি বিস্ফোরক ঘোষণা রেখেছেন—যুক্তিবাদ যে বুর্জোয়া মতাদর্শকেই টিকিয়ে রাখে, তাই নিয়ে একটি বই লিখবেন।

'যুক্তিবাদ'-এর প্রবল জয়যাত্রাকে রুখতে পরিকল্পনা মাফিক এইসব সুবিধাবাদী জ্ঞানবাবাদের দিয়ে একদিকে বলানো হচ্ছে—'যুক্তিবাদ' বুর্জোয়া মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখে, মার্কস যুক্তিবাদের পথিকৃৎদের দর্শনকে দুরন্ত খণ্ডণের মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এক দিকে তাঁদের এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে 'না-যুক্তিবাদী'দের 'যুক্তিবাদী' বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে'সব সংগঠন ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গাইছে, তাদেরকে 'যুক্তিবাদী' আন্দোলনের শরিক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ নিশ্ছিদ্র নিরীশ্বরবাদিতা-বস্তুবাদিতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠতা, আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ। 'জ্ঞানবাবা'রা অধুনা যে'সব ব্যক্তি ও সংস্থার গায়ে 'যুক্তিবাদী' শিলমোহর দেগে দিচ্ছেন, তাঁদের সবার মধ্যেই আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ অনুপস্থিত।

○

যে'সব সংগঠন ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গাইছে, তাদেরকে 'যুক্তিবাদী' আন্দোলনের শরিক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ নিশ্ছিদ্র নিরীশ্বরবাদিতা-বস্তুবাদিতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠতা, আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ।

○

মজাটা হল, এইসব তথাকথিত যুক্তিবাদীদের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে গেলেই জ্ঞানবাবারা ও তাঁদের আড়কাঠি বেজায় রকম চেঁচামেচি শুরু করে দেন—"কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি হচ্ছে" বলে। জ্ঞানবাবারা যখন 'না-যুক্তিবাদী'-দের 'যুক্তিবাদী' বলেন, দেশি-বিদেশি টাকা খাওয়া বিজ্ঞান আন্দোলনকে, মতাদর্শহীন সরকারের লেজুড় বিজ্ঞান আন্দোলনকে, সব্জী সংরক্ষণে মাতোয়ারা বিজ্ঞান আন্দোলনকে, আড্ডায় পরিণত নপুংসক বিজ্ঞান আন্দোলনকে স্পট-লাইটের আলো ফেলে আলোকিত করার ষড়যন্ত্রে মাতেন, তখন তাঁরা সার্বিক যুক্তিবাদী আন্দোলনকে কী ছুঁড়ে দেন? বেইমানি। স্রেফ বেইমানি। শুধু যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি নয়, সমাজের কোটি-কোটি শোষিত মানুষদের প্রতি বেইমানি ছুঁড়ে দেন।

এককালের 'আগুন খাওয়া' বিপ্লবীদের বর্তমানে এমন উল্টো-পাল্টা লেখার

গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। নিজেদের বিপ্লবী মূল্যবোধকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাবার অধিকার আছে। ধর্মে-মার্কসবাদে-যুক্তিবাদে খাবলা খাবলা অবস্থান করার অধিকার আছে। অসাম্যের এই সমাজ কাঠামোকে সমর্থন জানাবার অধিকার আছে। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার, কুৎসা ছড়াবার, স্ববিরোধিতায় ভরা হাস্যকর মিথ্যে লেখার অধিকার আছে। 'জ্ঞানবাবা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার আছে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনার-আমার-আমাদেরও অধিকার আছে এঁদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের শত্রু, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শত্রু, সাম্যের সুন্দর সমাজের শত্রু এবং শোষক ও শাসক শ্রেণীর দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার ও ঘৃণা করার।

পরিকল্পনা দ্বিবিধ। এক : যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কাড়া। দুই : 'যুক্তিবাদ'কে বুর্জোয়া মতাদর্শের সহায়ক প্রমাণ করতে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্থা ও ব্যক্তিকে তুলে আনো।

এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ভাঙার চেষ্টা অনেকবার হয়েছে। বারুদের গন্ধ ভাসিয়ে, রক্তের হোলি খেলে সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখা অনেক কচি-সবুজ দামাল প্রাণ এখন ঘাসের তলায় ঘুমোচ্ছেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়নি। বরং তৈরি করে গিয়েছিলেন উত্তরণের সোপানের প্রয়োজনীয় কিছু ধাপ। আমরা শিখেছি—বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময়, বিপ্লবের পরে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। আমরা শিখেছি—এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ধাক্কা দিতে হলে, ভাঙতে হলে প্রথমেই অতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে—এই সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তি কে? কারাই বা তার সহায়ক শক্তি।

'৯৩-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হল, 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ'। অসাধারণ সুন্দর এক সাম্যের সমাজ গড়ে তোলা ও তাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন বোঝাতে, ইতিহাসের প্রয়োজনে বইটির প্রকাশ ঘটেছিল। বলতে পারা যায়, বইটি 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির 'ম্যানিফেস্টো'।

বইটি রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত কর্মী এবং সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাল। এই প্রথম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রথম শ্রেণীর নেতারা প্রকাশ্যে দলীয় কর্মী সমাবেশে যুক্তিবাদী সমিতির লাইন মেনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। সি. পি. আই. (এম) দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু তাঁদের গণসংগঠনের দলীয় কর্মী সম্মেলনে এ'কথাও বললেন, সাক্ষরতা আন্দোলনের চেয়েও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

'৯৫-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হল, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড। এই গ্রন্থে স্পষ্ট ও গভীরভাবে আলোচনা করে দেখানো হল আধুনিক কালের অসাম্যের সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম'-এর নিয়ন্তা কে? কারাই বা

নিয়ন্তার সহায়ক শক্তি। সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে এ'এক বিরাট অগ্রগামিতা, প্রয়োজনীয় উল্লম্ফন।

সমাজ কাঠামোকে আঘাত হানতে আন্তরিক বিভিন্ন রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল বইটির প্রকাশকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দিত করলেন। তাঁরা উদ্দীপ্ত হলেন। তারই পাশাপাশি এই সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তক শক্তি ধনকুবের গোষ্ঠী ও তাঁদের সহায়ক রাজনীতিক-পুলিশ-প্রশাসন-প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

প্রায় প্রতিটি সমাজসেবী সংগঠন বা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, অথবা সংক্ষেপে এন. জি. ও. যখন সরকার ও বিদেশি অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং প্রায় ক্ষেত্রেই যখন সংগঠনগুলোর পরিচালকরা ওই অর্থ ভাণ্ডারকে আপন পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দে ব্যয় করে চলেছেন, তখন যুক্তিবাদী সমিতি প্রথা ভেঙে সংসার খরচ ছেঁটে সেই পয়সা খরচ করে দেশের অন্যতম বৃহত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি চালাচ্ছে।

গত কয়েক বছরে 'যুক্তিবাদ'-এর বিশাল উত্থানে জনগণকে সমাবেশিত করার শক্তিতে সরকার শঙ্কিত হয়েছে। অন্য যে কোনও সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে আমাদের সমিতিকে এক করে দেখতে না পারাও বোধহয় শঙ্কার একটি কারণ। প্রায় প্রতিটি সমাজসেবী সংগঠন বা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, অথবা সংক্ষেপে এন. জি. ও. যখন সরকার ও বিদেশি অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং প্রায় ক্ষেত্রেই যখন সংগঠনগুলোর পরিচালকরা ওই অর্থ ভাণ্ডারকে আপন পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দে ব্যয় করে চলেছেন, তখন যুক্তিবাদী সমিতি প্রথা ভেঙে সংসার খরচ ছেঁটে সেই পয়সা খরচ করে দেশের অন্যতম বৃহত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি চালাচ্ছে। নিজেদের পকেটের টাকায় চালানো সংগঠন যদি জনমানসকে এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সমাবেশিত করতে থাকে, তাহলে বাস্তবিকই ভয়ের। সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তি ও তাঁদের সহায়কদের পক্ষে ভয়ের। ওঁরা ভাড়াটে আন্দোলনকারীদের ভয় করেন না। ভয় করেন আদর্শে পরিচালিতদের।

গত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর অন্যতম সি. বি. আই. 'যুক্তিবাদী সমিতি'র কাজকর্মে নজরদারি করছিল। ফাইল খুলেছিল। রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর আই. বি'র উপর দায়িত্ব রয়েছে আমাদের উপর নজরদারির। সেখানেও ফাইল খুলেছে। 'সিস্টেম'—এর বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতেই নজরদারির পরিধি ও ব্যাপকতা বিস্তৃত করা হল। সেইসঙ্গে যুক্তিবাদের আগ্রাসন বুঝতে, তাদের পাল্টা আঘাত হানতে অগ্রণী ভূমিকা নিল প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ। পরিকল্পনাকে সার্থক করতে দুটি লক্ষ্য স্থির করল। **এক :** প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে মেকী বিজ্ঞান আন্দোলনকে 'স্পনসর' করা, প্রচারের আলোকে তুলে এনে আমজনতা

ও আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করা। **দুই :** 'যুক্তিবাদ'কে বুর্জোয়া মতাদর্শের সহায়ক প্রমাণ করতে এমন সংস্থা ও ব্যক্তিকে তুলে আনা ও প্রজেক্ট করা, যারা একই সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও যুক্তিবাদের পক্ষে জয়ধ্বনি দেয়, যাদের তাগা-তাবিজ শোভিত বাহু যুক্তিবাদের পক্ষে আস্ফালন করে। এ সেই পুরনো কৌশল। এ সেই নকশালবাড়ি আন্দোলনে উদ্দীপ্ত আদর্শের মধ্যে সমাজ-বিরোধী ঢুকিয়ে 'নকশাল = সমাজবিরোধী' প্রমাণ করার মতই এক গভীর ষড়যন্ত্র।

আমরা জানি, 'যুক্তিবাদী' শব্দটা কারও একচেটিয়া নয়। 'যুক্তিবাদ' নিয়ে আন্দোলন করাটাও কারও একচেটিয়া নয়। তার-ই সঙ্গে এও মনে করি, অন্যান্য 'যুক্তিবাদী সংস্থা' বা 'যুক্তিবাদ' নিয়ে আন্দোলনে সামিল (!) সংস্থাগুলোর সঙ্গে আমাদের স্পষ্ট মতাদর্শগত যে পার্থক্য আছে, সেগুলো আন্দোলনের স্বার্থেই সাধারণের কাছে তুলে ধরা উচিত। 'যুক্তিবাদ'-এর সংজ্ঞাও এইসব সংস্থার চোখে ভিন্নতর। এদের চোখে 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এদের কাছে 'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন ও কিছু কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার। এরা 'যুক্তিবাদ' বলতে কী বোঝেন ? কেমনভাবে বোঝেন ? আসুন দু'চার কথায় বুঝে নিই। সংগঠনগুলোর সংগঠকদের প্রকাশিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বুঝে নিই। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, তারপর আপনারাই ঠিক করবেন, আপনাদের 'সমর্থন', 'অসমর্থন' কোন্ পক্ষে যাবে। আমরা অতি আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করি, 'জনগণই শেষ কথা বলেন'। আর এই পরম বিশ্বাসই আমাদের বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস, অসাম্যের শক্তিশালী সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা।

ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ

প্রতিষ্ঠা ১৯৯৪ সালে। প্রতিষ্ঠাতা নেতারা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের একটি জব্বর মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের বা তার কোনও না কোনও গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক দলটি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনে জনগণকে সামিল করতে একটি 'বিজ্ঞান মঞ্চ' খুলেছে। তারপর একই কাজে বকলমে আবার একটা গণসংগঠন খোলা—একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। যুব-ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-রাজ্যসরকারী কর্মচারী-লেখক-শিল্পী ইত্যাদি প্রত্যেকটি পরিধিতে কাজ করতে রাজনৈতিক দলটির একটি করেই গণসংগঠন। শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি গণসংগঠন কেন ? রাজনৈতিক দলটি রাজ্যসম্মেলনে স্বীকার করেছে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনগণের উপর তাদের গণসংগঠনের প্রভাব খুবই সামান্য।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' বিজ্ঞান আন্দোলনকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন হিসেবে জনমানসকে প্রভাবিত করায় এবং যুক্তিবাদী

আন্দোলনে জনগণকে বিশালভাবে সমাবেশিত করে মূলস্রোত তৈরি করায় সরকারি বা বিদেশি সাহায্য পুষ্ট কোনও ভাড়াটে আন্দোলকদের পক্ষে আমাদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া ছিল একান্তই অসম্ভব। তাই কি আমাদের সমিতির কাছাকাছি নাম রাখা হয়েছে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ফায়দা তুলতে?

'ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডঃ বেলা দত্তগুপ্তের 'কুসংস্কার' প্রসঙ্গে রাখা একটি সাম্প্রতিক বক্তব্যের দিকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের নজর আকর্ষণ করছি।

"শিশুদের কোমরে তামার পয়সা বাঁধার চল আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। অনেকেই তা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এ'কথা এখন চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বজনবিদিত যে মানুষের দেহে তামা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু এবং সুস্থ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তা অত্যন্ত দরকারও। তাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে অনেক সময়ই যা বলা হয় তা নিতান্তই অসার, অনেকটাই বৃটিশদের কাছ থেকে যান্ত্রিকভাবে ধার করা চিন্তার পরিণতি।"

বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর '৯৪-এর 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকায়। যে প্রতিবেদনে বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার লেখক 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক শমিত কর। অতএব বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগ এখানে খাটে না।

আসুন, এবার আমরা দেখি ডঃ দত্তগুপ্তের বর্ণিত 'চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বজনবিদিত' বাস্তবিকই কতটা 'সর্বজনবিদিত'।

তারিখটা ২৬জুন। সাল ১৯৮৬। কলকাতার রাজাবাজারে অবস্থিত 'সাইন্স কলেজ'-এ দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতের বিশিষ্ট ১৮ জন বিজ্ঞানী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাবটির একটি অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"আমাদের শরীরে রক্ত আছে। প্রয়োজনে বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া রক্ত দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি হঠাৎ দাবি করিয়া বসেন—পশু বা মানুষের রক্ত গায়ে মাখিয়াই শরীরের রক্ত-স্বল্পতা দূর করা সম্ভব, তাহা হইলে তাহার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন—রক্ত-স্বল্পতার ক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়রণ ট্যাবলেট-ক্যাপসুল ইত্যাদির প্রয়োগবিধি আছে, অতএব লৌহ-আংটি ধারণে ওই একই কার্য সমাধা হইবে না কেন?—তবে প্রশ্নকর্তার কাণ্ডজ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হই। এইরূপ প্রশ্নকর্তা তাঁহার নিজের রক্ত-স্বল্পতা দেখা দিলে ভারি লৌহখণ্ড শরীরের সর্বত্র বাঁধিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিলেই তাঁহার প্রশ্ন ও বক্তব্যের অসারতা বুঝিতে পারিবেন।"

এই বিষয়ে পূর্ণ প্রস্তাব জানতে দেখতে পারেন, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।

এতো গেল বিজ্ঞানীদের সর্বজনবিদিত বক্তব্য, বিজ্ঞানের বক্তব্য। তা বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য রাখার অধিকার ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদের সভাপতির

নিশ্চয়ই আছে। তাঁর বক্তব্যকে প্রচার করার অধিকারও যুক্তিবাদী সংসদের আছে। ঘুনসি-তাগা-তাবিজ-ধাতু ও গ্রহরত্ন পরে যুক্তিবাদী আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারও যুক্তিবাদী সংসদের আছে। ওদের কাজ-কর্মের ফল ওদের জন্যই সংরক্ষিত থাকলে আমাদের শিরপীড়ার কোনও কারণ হত না। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়! প্রত্যাশা মতই একদিকে কিছু প্রচার মাধ্যম যখন যুক্তিবাদী সংসদের উপর প্রচারের আলো ফেলছে, রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্রের মত মহান যুক্তিবাদীদের উত্তরসূরী বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে তথাকথিত যুক্তিবাদী দৈনিক পত্রিকা (অবশ্য 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ'-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানিক পাল মহাশয় একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে রামমোহন, কেশব সেনকে আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা আনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী), তখন আর এক দিকে প্রচার মাধ্যম তাবিজধারী যুক্তিবাদীদের আস্ফালনকে হাসির খোরাক করে কার্টুনে পাতা ভরাচ্ছে (এমনই এক কার্টুন আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'তে প্রকাশিত হয়েছে ২৯ অক্টোবর ১৯৯৫)।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এমন ভাঁড়ামোতে দাঁড় করানোর জন্য তো আমাদের সমিতি দায়ী ছিল না। তবু যুক্তিবাদী আন্দোলন ষড়যন্ত্রের শিকার হল। আনন্দবাজার পত্রিকার বেশ কিছু পাঠক-পাঠিকাদের চোখে যুক্তিবাদী আন্দোলন 'ফালতু' হল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি—'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কেন্দ্রীয় বা কোনও শাখায় কার্যকরী সমিতির সদস্য হওয়ার অন্যতম প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাবিজ-কবজ-গ্রহরত্ন-ঈশ্বর-আত্মা-ভূত-জ্যোতিষ ইত্যাদিতে বিশ্বাস জাতীয় স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকতে হবে, এমনকি কোনও অজুহাতেও গ্রহরত্ন-টত্ন ধারণ করতে পারবেন না।

○

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কেন্দ্রীয় বা কোনও শাখায় কার্যকরী সমিতির সদস্য হওয়ার অন্যতম প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাবিজ-কবজ-গ্রহরত্ন-ঈশ্বর-আত্মা-ভূত-জ্যোতিষ ইত্যাদিতে বিশ্বাস জাতীয় স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

○

সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানিক পাল কর্তৃক প্রচারিত সাম্প্রতিক একটি প্রচারপত্র পাঠ করে জানতে পারলাম, ওঁদের সংগঠনটির পুরো নাম, 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ প. ব.'। এটা তো কোনও সর্বভারতীয় সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটি বা প্রাদেশিক শাখা নয়? তবুও কোনও শাখাহীন, আঙুলে গোনা সদস্য সংখ্যার এই 'যুক্তিবাদী সংসদ' নামের আগে 'ভারতীয়' ও পিছনে 'প. ব.' অর্থাৎ (সম্ভবত) 'পশ্চিমবঙ্গ' শব্দ দুটি কেন জুড়ে দিল? এ আমার কাছে বাস্তবিকই রহস্য! এ যেন 'জাপানী টেপ-রেকর্ডার, মেড ইন ইন্ডিয়া'!

ইণ্ডিয়ান র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

দিল্লীর ঠিকানা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রধান নেতা এডামারুকু। ওদের 'র‍্যাশানালিজম' বা 'যুক্তিবাদ'-এ মাঝে-মধ্যে চালেঞ্জ উপস্থিত। অনুপস্থিত অধ্যাত্মবাদ-ধর্ম-ঈশ্বর তত্ত্বের বিরোধিতা।

সম্প্রতি কিছু প্রচার মাধ্যমের মধ্যে ওদের শক্তিকে ফাঁপিয়ে দেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করছি। সংগঠন ছোট কি বড় তাতে কিছুই এসে যায় না, আমরা জানি। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর বিশাল আকার আমরা দেখেছি। আবার এমনও দেখেছি আদর্শের চারাবট এখন বনস্পতি—হাতের কাছেই উদাহরণ। দশ বছরে একটা মানুষ লক্ষ মানুষ হয়েছে। আমরা দেখেছি। অতএব 'এক' থাকাটা তত্ত্বগতভাবে কখনই গুণগতমানের দৈন্য প্রকাশ করে না। কিন্তু দীনতা প্রকাশ করে সেইসব প্রচার-মাধ্যমগুলোর, যারা এক'কে ফাঁপিয়ে লক্ষ করার চেষ্টায় মেতেছেন। এই দীনতারই আর এক নাম 'হলদে সাংবাদিকতা'।

বি. বি. সি-র চ্যানেল ফোরের জন্য ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে ছবি তুলতে '৯৪-এ তিন দফা ভারত সফরে এসেছিলেন ডিরেক্টর, প্রোডিউসর রবার্ট ঈগল। এডামারুকুর সঙ্গে ঈগল যোগাযোগ করলেন। ওঁর সংগঠনের কাজ-কর্মকে ক্যামেরা বন্দি করতে চাইলেন। এডামারুকু জানালেন—লোক কই? মাস তিনেক সময় পেলে কয়েকজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারি। শেখালেন। জনা চারেক ছাত্র ও জনা পঞ্চাশ দর্শক জোগাড় করতে মাস তিনেক সময় দিতে হয়েছিল।

সংস্থা আছে। কাজের লোক নেই। স্টাডি ক্লাশ নেই। সহযোদ্ধা তৈরির প্রক্রিয়া নেই। আমাদের চেয়েও অনেক প্রাচীন সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে এখনও পুরোপুরি কাগুজে সংগঠন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একবার প্রশ্ন করুন—তবু এইসব কাগুজে সংগঠনকে কেন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে আনা হচ্ছে? উত্তর আপনি নিজেই পাবেন। সেই দুটি উত্তর। আপনার-আমার-আমাদের উত্তর মিলবেই। সততার সঙ্গে খুঁজলে উত্তর যে এক-ই হবে।

'যুক্তিবাদী' শব্দটি নিজেদের নামের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিজ্ঞান আন্দোলন বা যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু সংগঠন। তাদের চোখে 'যুক্তিবাদী আন্দোলন' বা 'বিজ্ঞান আন্দোলন'-এর সংজ্ঞা কী? সংগঠকদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বুঝে নিই আসুন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

জন্ম ১৯৮৬-র নভেম্বরে। একটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের শাখা। 'বিজ্ঞান আন্দোলনের ভূমিকা' প্রসঙ্গে মঞ্চের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য,

"পরিবেশ দূষণ, রোগ প্রতিরোধ, জলসেচ, মৃত্তিকার পরীক্ষা, কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া, পারমানবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা, জ্বালানী ও শক্তির সমস্যা ইত্যাদি সময়োপযোগী সমস্যা বিষয়ে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালান বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ।"

আরও কাজের মধ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান মেলা, মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার কথা আছে। যে'সব কথা আছে সে সব কথা নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওদের সংগঠনের মূলগত পার্থক্য বিজ্ঞান আন্দোলনের সংজ্ঞা নিয়েই। ওরা মনে করেন—বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়াই বিজ্ঞান আন্দোলন। আমরা মনে করি—বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনই বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মঞ্চে কিছু বিধি নিষেধও আছে। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের চোখে ধর্মগুরু ও জ্যোতিষীরা শ্রদ্ধেয়। তাই ধর্মগুরু ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে 'রা'-কাটা বারণ। কারণ ওতে করে বিশ্বাসী মানুষদের বিশ্বাসে আঘাত হানা হবে। মঞ্চের লক্ষ্য, জনচেতনাকে উঠিয়ে আনা নয়। জনচেতনার মানে নিজেদের নামিয়ে আনা। নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলের গণসংগঠন হলে বুঝিবা এ'ভাবেই চলতে হয়। কারণ, ওদের কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষকে যুক্তিবাদী করার চেয়ে মানুষের ভোট পাওয়াটাই জরুরী হয়ে ওঠে। আর তাই তো, ওদের সংগঠনে আমজনতাকে সামিল করতে খোলা-মেলা মুক্ত হাওয়া। মঞ্চের আঞ্চলিক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই তাই পুজোকমিটি—তাগা তাবিজ—বিজ্ঞান আন্দোলন ইত্যাদি স্ববিরোধিতা পরম নিশ্চিন্তে সহাবস্থান করে।

'৯৪-এর কলকতা পুস্তক মেলায় মঞ্চ বইয়ের দোকান দেয়। নানা বইয়ের পাশে কুসংস্কারের ধারক-বাহক বইও স্টলে সহাবস্থান করে। এবং তা যে অনবধানতায় নয়, এটা বুঝতে পারি, যখন আমাদের সমিতির তরফ থেকে তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও দেখি যথা পূর্বং তথা পরং।

একটি ঘটনা। ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বর। রামকৃষ্ণ মিশন 'বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন'-কে রাজনৈতিক স্টার মেগাস্টারের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনকে নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট। শহর কলকাতার হোর্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম সম্মেলনে রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতির সদম্ভ ঘোষণা নিয়ে। ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ব্যাখ্যাকে পূর্ণ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারিদের 'বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে যুক্তিবাদী সমিতি তখন জোরাল আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আমাদের সমিতি সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কাছে, এবং দল ও নেতাদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা বাস্তবিকই আপ্লুত। ঠিক এমনি সময়ে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের আহ্বায়ক স্বামী লোকেশ্বরান্দ'র সুরে সুর মিলিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'-এর সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

প্রকাশিত হলো বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাতায় (৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক আমাদের আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করলেন। এ'ভাবে তিনি ধর্মের পিঠে জুড়ে দিতে চাইলেন বিজ্ঞানের পাখা।

১৯৯৫ এর ডিসেম্বরে মঞ্চের নেতৃত্বে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ জাঠা অনুষ্ঠিত হলো। খড়্গপুরে জাঠার উদ্বোধন হলো ঈশ্বরে প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র

জন্ম ১৯৮৯ সালে। সি. পি. এম. নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ যখন বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে নিজেদের দখলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন কিছু বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান পত্রিকাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে গড়ে উঠেছিল এই সমন্বয় কেন্দ্র। ঘোষিত কর্মসূচীতে ছিল—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গণস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা, পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা সহ আরও অনেক কিছুই।

এক বছর না যেতেই ২৫.৩.৯০ তারিখে ৮ নং সার্কুলার দিয়ে সমন্বয় কেন্দ্র যুক্ত সংগঠনগুলোকে জানাল—অদৃষ্টবাদ, কর্মফল বিশ্বাস, ভূত বা ঈশ্বরজাতীয় বিশ্বাস মানুষের মন থেকে দূর করা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। তাই বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্ত করার আন্দোলনের এখন কোনও প্রয়োজন নেই। আগে অলৌকিকতা বিরোধী, ঈশ্বরতত্ত্ব বিরোধী, অদৃষ্টবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার যে পথ নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ভুল পথ।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির লাইনকে পুরোপুরি বর্জন করল। বিজ্ঞান মঞ্চের লাইনকে সমর্থন করল। তারপর—ঈশ্বর বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে, অধ্যাত্মবাদকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ওদের কর্ণধারেরা কলম ধরতে লাগলেন।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকাগোষ্ঠী 'উৎস মানুষ' ১৯৯৪-এর অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় 'যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদীর মুখোমুখি' শিরোনামের প্রবন্ধে জানাল :

"ভূতের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের তুলনামূলক বিচারে গেলে ঈশ্বরবাদীরা হয়ত রুষ্ট হবেন, কারণ, যেখানে বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তির প্রবল প্রয়োগে ভূতকে আমরা প্রায় উৎখাত করে এনেছি, সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারে একই ধরণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। ঠিক একই সঙ্কোচ বা অস্বস্তির মুখোমুখি আমরা হই দেবমূর্তিকে দেবতাহীন বলে ঘোষণা করতে। এর কারণ আমাদের মজ্জাগত ধর্মীয় সংস্কার। যেহেতু এই সংস্কার সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক বোধ উন্মেষের কাজে সাহায্য করে, এই সংস্কারকে আমরা কুসংস্কার বলব না।"

অর্থাৎ, ঈশ্বর বিশ্বাস কুসংস্কার তো নয়ই, বরং এই বিশ্বাস সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করে এবং অধ্যাত্মিক বোধ বা আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ বিষয়ে বোধের উন্মেষে সাহায্য করে। এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে পরিচিত 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা ৯৫-এর কলকাতা পুস্তক মেলায় 'বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা' প্রকাশ করল। সেখানে 'বিজ্ঞানে অবগাহন' প্রবন্ধটির উপসংহারে লেখক জানালেন, *"বিজ্ঞানমনস্কতা একজন ব্যক্তি মানুষের আত্মিক উন্নতি ও অধিকার আদায়ের সহায়ক শক্তি হতে পারে, কিন্তু নৈতিকতা ছাড়াও আবেগ-অনুভূতির জগতে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এখনো স্পষ্ট নয়।...তাই ফের খেয়াল রাখতে হয় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতায়। বিজ্ঞান মানবপ্রজাতির বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সার্বিকমুক্তির মন্ত্র হাতে বসে নেই, বিজ্ঞান কোনো মুক্তিদাতা বা পরমাত্মার বিকল্প নয়।"*

প্রবন্ধটির লেখক 'উৎস মানুষ' পত্রিকার সম্পাদক। ধরে নিলাম লেখক অনবধানতায় 'আত্মিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আসলে 'মূল্যবোধ' বা 'নীতিবোধ'-জাতীয় কোনও শব্দ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবু বলব, এই ধরনের 'ভাববাদী' শব্দ ব্যবহার বিষয়ে তাঁর আরও একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারপর ? তিনি সরাসরি বিজ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্র নিয়ে 'লক্ষণের গন্ডি' টানলেন। ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিদান দিলেন, বিজ্ঞান সার্বিক মুক্তির পথ হতে পারে না।

বাস্তবে কিন্তু বিজ্ঞানই মুক্তি দেয়। অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। বিজ্ঞানের পথ ধরেই গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানই আমাদের নৈতিকতা বুঝতে সাহায্য করে এবং গড়তে সাহায্য করে, সাম্যের সমাজ গড়ার পথ দেখাতে পারে। মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারে আবেগ-অনুভূতির এবং দেয়ও। মানুষের মুক্তি যদি কেউ দিতে পারে, তবে তা বিজ্ঞানই। 'পরমাত্মা'-জাতীয় কেউ কখনও মুক্তিদাতা নয়। 'পরমাত্মা'-জাতীয় অতীক চিন্তা বরং শৃঙ্খলিত করে মানুষের মননকে, মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে।

বছর কয়েক আগে 'উৎস মানুষ' পত্রিকাতে একই সংখ্যায় দুটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' প্রথম খণ্ডের, আর একটি মার্টিন গার্ডনার-এর 'সাইন্স : গুড, ব্যাড অ্যান্ড বোগাস'। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি যে কত 'ওঁচা', কত 'ভুসি মাল' তা প্রচুর আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছিল। বইটি যে অনেকের কাছেই বেজায় বাজে লাগে, তা আমার অজানা নয়। সমালোচকের বাজে লাগার অধিকার নিশ্চয় আছে। স্বীকার করি। কিন্তু 'উৎস মানুষ'-এই করেই থামল না। একই বিষয়ের দুটি বইয়ে কত তফাৎ, দেখাতে 'মডেল' বা আদর্শ হিসেবে খাড়া করল মার্টিন গার্ডনারের বইটিকে। ছত্রে ছত্রে আবেগ ঢেলে বোঝাল গার্ডনার কী দারুন যুক্তিবাদী!

গার্ডনার কতখানি যুক্তিবাদী ? বোঝাতে শুধু এটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে, তিনি তাঁর বইতেই স্পষ্ট করে লিখেছেন, তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস ও আত্মায় বিশ্বাস করার কথা। 'উৎস মানুষ'-এর প্রেরণা পাওয়ার মত আদর্শই বটে!

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের এক নেতা 'গণদর্পণ' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৫ সংখ্যায়) বিভিন্ন স্কুলে 'ইস্কন' যে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখলেন—ইস্কনের বিলাস বহুল জীবন চৈতন্যের আদর্শের সঙ্গে মেলে না। ইস্কনের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে চৈতন্যের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

বাঃ! কী সুন্দর যুক্তি! এক অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার রুখতে আর এক অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসারের পক্ষে উমেদারি! অর্থাৎ, বিপ্লবী-আনা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষেই নির্ভেজাল দালালি।

আমরা মনে করি, ঈশ্বর বিশ্বাসের মত অলীক বিশ্বাসের পক্ষে দালালি করে আর যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন করা যায় না, এবং ইস্কনের মত ভাববাদীদের বিরুদ্ধে লড়া যায় না।

প্রচার মাধ্যম ও তার ভূমিকা

সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সাধরণভাবে এক ধরনের বিপদ্‌জনক ভুল ধারণা রয়েছে। অমুক পত্রিকা প্রগতিশীল, তমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। সংবাদপত্র এবং প্রচারমাধ্যমগুলো তাদের মালিকদের কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মত নিছকই ব্যবসা। উৎপাদন কর, খদ্দের ধর, বিক্রি কর। আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এখানেও সাধারণভাবে যত বেশি বিক্রি, তত বেশি লাভ।

○

সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সাধরণভাবে এক ধরনের বিপদ্‌জনক ভুল ধারণা রয়েছে। অমুক পত্রিকা প্রগতিশীল, তমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। সংবাদপত্র এবং প্রচারমাধ্যমগুলো তাদের মালিকদের কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মত নিছকই ব্যবসা।

○

বড় পুঁজি বিনিয়োগের আগে প্রতিটি শিল্পপতি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা চালান। প্রাথমিকভাবে বুঝে নেন বাজারের অবস্থা। তারপর নামেন উৎপাদনে।

বৃহৎ পত্র-পত্রিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সম্ভাব্য পুঁজি বিনিয়োগকারী বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষকরা কয়েক মাস ব্যাপী সমীক্ষা চালান নানাভাবে, যার একটা বড় অংশ জনমত যাচাই। তারপর তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে পত্রিকার চরিত্র কী কী ধরনের হলে সম্ভাব্য পাঠক কতটা হতে পারে, তার একটা হদিস দেওয়া হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে পুঁজিপতি ঠিক করেন তার পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, ঠিক করেন পেপার পলিসি।

কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন সম্পাদক থেকে সাংবাদিক। এঁরা প্রত্যেকেই বুঝে নেন পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, এই রূপরেখা ভাঙার কোনও স্বাধীনতাই থাকে না সম্পাদক থেকে সাংবাদিক কারুরই। 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' বলে যে শব্দটি আমরা অহরহ শুনে থাকি, যে শব্দটা নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে, সেই শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে; আর তা হলো সংবাদপত্র মালিকের পত্রিকা-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা, যা খুশি লেখার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠিতভাবে আঘাত হানার স্বাধীনতা।

O

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' বলে যে শব্দটি আমরা অহরহ শুনে থাকি, যে শব্দটা নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে, সেই শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে; আর তা হলো সংবাদপত্র মালিকের পত্রিকা-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা, যা খুশি লেখার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠিতভাবে আঘাত হানার স্বাধীনতা।

O

সম্পাদক থেকে সাংবাদিকরা মালিকের কাছে 'পেপার পলিসি' মেনে লেখার ও তা প্রকাশ করার অলিখিত চুক্তির বিনিময়েই চাকরিতে ঢোকেন। পেপার পলিসিকে অমান্য করার মত ধৃষ্টতা কেউ দেখালে, পরের দিনই তার স্থান হবে পত্রিকা অফিসের পরিবর্তে রাস্তায়।

এইসব পত্রিকাগুলোর সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতই—যখন যে দলে খেলবেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুঁদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝানু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একইভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল; প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী, প্রতিবাদী, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রিকার মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধন-সম্পদে আর একজনের টপকে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ওরা দারুণ রকম একাট্টা।

সংবাদপত্রগুলোর ভানের মুখোশটুকু সরালে দেখতে পাবেন, প্রতিটি

সংবাদপত্রই বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে জনমতকে পরিচালিত করে এবং বহিরঙ্গে এরা সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের কিছু কিছু দুর্নীতির কথা ছেপে সিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার মূল ঝোঁককে আড়াল করে। এমন সব দুর্নীতির কথা 'পাবলিক খায়' বলেই পত্রিকাগুলো ছাপে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাবিকাঠি যাদের হাতে, তারা জানে, এমন দু-চারটে দুর্নীতি ধরার লালিপপ্ হাতে ধরিয়ে দিয়ে কীভাবে অত্যাচারিতের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে হয়। তারা জানে, সিস্টেমের প্রেসার কুকারে নিপীড়িতদের ফুটন্ত ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার 'সেফটি ভালভ' হলো মাঝে-মধ্যে দু-চার জনের দুর্নীতি ফাঁস। পরে অবশ্য শাস্তি-টাস্তি না দিলেও ক্ষতি নেই। জনগণের স্মৃতি খুবই দুর্বল। ভুলে যাবে প্রতিটি ঘটনা, যেভাবে ভুলেছে বফর্স কেলেংকারি, শেয়ার কেলেংকারি। আর এর ফলে একআধটা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ বা প্রশাসক যদি বধ হয়, তাতেও অবস্থা একটুও পাল্টাবে না। ফাঁকা জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না, থাকবে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।

গত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখেছি। 'চিপকো', 'নর্মদা বাঁচাও'-এর মত বিভিন্ন দাবি বা ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আমাদের আছে। আমরা মনে করি, এইসব আন্দোলনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এইসব আন্দোলন যেহেতু অসাম্যের সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম' পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, তাই সমাজ কাঠামো জিইয়ে রাখার অংশীদার রাজনৈতিক দল, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিরা দলগত-স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তি ইমেজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক অঙ্ক কষে এই জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করেন।

এই বক্তব্যকে স্পষ্টতর করতে উদাহরণ হাজির করাটা বোধহয় বাহুল্য হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'কেই না হয় বেছে নেওয়া যাক। 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' কিসের আন্দোলন, আসুন একটু বুঝে নেওয়া যাক। নর্মদা নদীর উপর সর্দার সরোবর প্রকল্পে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করতে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে চল্লিশ হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিন রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এখনও প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এখন পর্যন্ত মাত্র ছ' হাজার পাঁচশো বাস্তুচ্যুত পরিবারের জন্য জমি বিলি হয়েছে। প্রতিটি বাস্তুচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে কেন্দ্রবিন্দু করে গড়ে উঠেছে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন।' কোনও সন্দেহ নেই, এই আন্দোলন চৌতিরিশ হাজার পাঁচশো পরিবারের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় এক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমিতির আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। তারপরও একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠে আসতে পারে। এই আন্দোলন যদি লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়, অর্থাৎ তিন রাজ্যের সরকার যদি বাঁধ তৈরির জন্য বাস্তুহারা প্রতিটি পরিবারকে

মি বিলি করে, তারপরে কীহবে ? উত্তর একটাই। জয়ের মধ্য দিয়ে 'নর্মদা বাঁচাও ান্দোলন'-এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের দেশের অসাম্যের সমাজ কাঠামোয় কটিও আঁচ না কেটেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামিল য়েছে, সে আন্দোলনের লক্ষ্য—অসাম্যের সমাজ কাঠামো ভেঙে সাম্যের সমাজ াঠামো গড়ে তোলা। এবং তারপরও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল রাখা। ারণ, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান থেকে আমরা এই শিক্ষা নিয়েছি যে, সাম্যের মাজ কাঠামো গড়ে উঠলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় া। অসাম্যের ঘুণ পোকার আক্রমণ থেকে মানুষের চেতনাকে বাঁচাতে, সাম্যের মাজ কাঠামোকে বাঁচাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিকল্পহীন।

আমাদের সমিতি বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনে বার বার সামিল হয়েছে। ন আন্দোলন কখনও জ্যোতিষী বা ধর্মগুরুদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে ; কখনও বা ারতীয় সংবিধানে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাকে পূর্ণ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা রতে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীদের 'বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত রতে ; আবার কখনও বা 'ড্রাগস্ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪'-কে আইনের বইয়ের পাতা থেকে তুলে নে প্রয়োগ করতে। প্রতিটি ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনেই একের পর এক জয় ামরা এনেছি। কিন্তু কোনও জয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের সমিতির আন্দোলন প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। এমনকি অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে চূড়ান্ত াঘাতে ভেঙে ফেলার পরও আমাদের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন রিয়ে যাবে না। সাম্যের সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার পরও নয়। কারণ ক্তিবাদী আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাবে ক্ষমতার ঘুণপোকা, নীতির ঘুণ পোকা সাম্যের সমাজ কাঠামোকে কুরে কুরে ফোঁপরা করে দেবে।

'নর্মদা বাঁচাও....'এর মত এইসব দাবি আদায়ের আন্দোলন সমাজ কাঠামো বা সস্টেম' পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, তাই এই জাতীয় আন্দোলন সরকার রোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থন যেমন অনেক সময়ই পেয়ে থাকে, তেমনই প্রচার ধ্যমগুলো নিজেদের প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে এদের প্রচার দেয়।

যদিও কোনও বাণিজ্যিক পত্রিকা দিব্যি গ্লেলে নিজেদের যুক্তিকামী ও সাম্যকামী ল ঘোষণা করেন, তাহলে তৎখনাৎ তা মন্ত্রী বা মাতালের 'ভাট-বকা' বলে ধরে য়ে বাতিল করতে পারেন। কারণ, এটাই পরম সত্য যে—পত্রিকায় পুঁজি নিয়োগ রা কোটিপতি ব্যবসায়ী কখনই চাইবেন না, যুক্তির পথ ধরে সাম্যের সমাজ গড়ে ঠুক, আর তিনি ধনকুবের থেকে সাধারণ মানুষের আর্থিক মানে নেমে আসুন। ই এঁরা সঠিক সাম্যের আন্দোলনকে ঠেকাতে ষড়যন্ত্রের সমস্ত রকম ফাঁদ পাতার াতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখেন ও প্রয়োগ করেন।

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নমুনা হিসেবে আপনাদের সামনে পেশ করছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যুক্তিবাদের প্রচারক বলে পরিচিত একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার স্ববিরোধী আচরণ, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সাম্যবাদের পক্ষে মননের বিকাশকামী গ্রন্থসমূহের প্রকাশ ও প্রচারকে ঠেকাতে পত্রিকাটি মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। সম্পাদক তাঁর কলমে (২৪ সেপ্টেম্বর '৯৫) এ'জাতীয় 'কেতাব' বছর বছর প্রকাশের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রুপের বিষ ছুঁড়ে দিলেন। আর তারপরই কিছু কিছু 'বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবী', পত্রিকা-সম্পাদকের সন্তোষ উৎপাদনই নিজেকে আলোকিত করার সহজ উপায় বিবেচনায়, সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের বই-পত্তর প্রকাশের বিরুদ্ধে বিষ উগড়ে দিতে শুরু করেছেন। এমনও হতে পারে, বুদ্ধিজীবীদের এমন অদ্ভুত আচরণের পিছনে রয়েছে সম্পাদকের সুস্পষ্ট নির্দেশ। বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরকারী পত্রিকাগুলো মাঝে-মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশ দেন এ'কথা তো বাস্তব সত্য।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনি আমি আমরা যখন চাইছি হাজার-হাজার বছর ধরে ভাববাদী চিন্তার লক্ষ-কোটি বই যেভাবে মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে, অসাম্যের শিকলে বন্দি করে রেখেছে, সেই শিকল ভেঙে মুক্তির স্বাদ দিতে যুক্তি-প্রসারী বই বেরিয়ে আসুক প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মুহূর্তে, ঠিক সেই সময় যুক্তিবাদের নিধন লিপ্সায় মত্ত ঘাতকেরা কাদের দালালি করছে? বাঁচার জন্যেই প্রয়োজন এঁদের চিনে নেওয়ার, এঁদের চিনিয়ে দেওয়ার, এঁদের প্রতি ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়ার।

কুসংস্কার বিরোধী, ভাববাদ বিরোধী লেখা প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানবাবারা অর্থ রোজগারের ধান্ধাও খুঁজে পান, এবং সে প্রসঙ্গ তোলেন-ও। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ, বড়ে গোলাম আলি থেকে আমজাদ আলির সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন বাণিজ্যের গন্ধ পাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন না? জেম্‌স্ র‍্যান্ডি থেকে কভুরের বুজরুকি ফাঁসের লেখাতে কেন অর্থের আঁশটে গন্ধ পান না? দেবীপ্রসাদ থেকে আজিজুল হকের লেখাকে বাতিল করতে কেন অর্থ মূল্যকে যুক্ত করেন না? যুক্তিযুক্ত নয় বরং আহাম্মুকী বলেই কী? এঁরা গণচেতনা বাড়াবার জন্য গাঁটের কড়ি দিয়ে বই ছাপিয়ে, বিনামূল্যে বিলিয়েছেন বলে তো শুনিনি! তাহলে কোন্ যুক্তিতে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী এবং সাম্যবাদী মননের বিকাশকামী গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই হাস্যকর অভিযোগের কাদা ছোঁড়া? শুধুমাত্র কাদা ছোঁড়ার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই কী?

কুসংস্কার বিরোধী, ভাববাদ বিরোধী লেখা প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানবাবারা অর্থ রোজগারের ধান্ধাও খুঁজে পান, এবং সে প্রসঙ্গ তোলেন-ও। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ, বড়ে গোলাম আলি থেকে আমজাদ আলির সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন বাণিজ্যের গন্ধ পাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন না? জেম্‌স্

র‍্যান্ডি থেকে কভুরের বুজরুকি ফাঁসের লেখাতে কেন অর্থের আঁশটে গন্ধ পান না? দেবীপ্রসাদ থেকে আজিজুল হকের লেখাকে বাতিল করতে কেন অর্থ মূল্যকে যুক্ত করেন না?

যাঁরা বেছে বেছে শুধুমাত্র যুক্তিবাদের পক্ষে, বুজরুকি ফাঁসের পক্ষে লেখা বই-পত্তরের ক্ষেত্রে লেখকের বাণিজ্যিক মানসিকতার গন্ধ পান, তাঁদের কিন্তু আদৌ অজানা নয়, বুজরুকি ফাঁসে বিরত থাকলে রোজগারটা লেখক অকল্পনীয় অংকে নিয়ে যেতে পারেন। আজ থেকে বছর দশেক আগে ফিলিপিনের ফেইথ হিলারের রহস্যকে উন্মোচন না করার জন্য পনের লক্ষ টাকার ভেট দিতে বাড়ি এসে ধনকুবেরের তোয়াজ করে যাওয়ার কাহিনী সেই কবে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' এর দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে লেখা হয়েছে। দশ বছর আগের পনের লক্ষ টাকা এখনকার কোটি টাকার সমান কি না, সে কূট প্রশ্নে না গিয়েও বলি—এটি একটিমাত্র উদাহরণ, সব নয়। পরিবর্তে আমরা কি দেখেছি? বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের নিউজ ম্যাগাজিনের জন্য একটি ছবি তুলেছে একটি প্রাইভেট কোম্পানী। ছবিটিতে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে হাজির করা কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নানা প্রশ্নের মুখে বিকল্প চিকিৎসকরা হাসির খোরাক হলেন। বিকল্প চিকিৎসকদের এক একজনের জ্ঞানের পরিধি বাস্তবিকই হাস্যকর ছিল। প্রযোজক ছবিটি দেখাবার দিন-ক্ষণও ঘোষণা করলেন। সেদিন ছবি দেখতে গিয়ে দর্শকরা বোকা বনলেন! স্বর্ণসন্ধানী ব্যবসায়ীর কাছে বোকা বনলেন। কারণ ছবিটি দেখান হয়নি। অন্য একটি অনুষ্ঠান জায়গা দখল করেছিল। এবং স্পনসরের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া গেল একটি বিকল্প চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাকে। অনেক চেঁচামেচিতে পরের সপ্তাহে ছবিটি যদিও বা এলো, তবে তখন পরিকল্পিত কাঁচি চালনার কল্যাণে সত্য হয়েছে বিকৃত এবং বিকল্প চিকিৎসা 'বিজ্ঞান-টিজ্ঞান', এবং স্পনসরের ভূমিকায় আবারও প্রবলভাবে হাজির হলো বিকল্প চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাটি।

প্রচারে ভারত বিখ্যাত মহারাষ্ট্রের এক ম্যাগনেটোথেরাপিস্ট কলকাতায় ক্যাম্প করেছিলেন কয়েকদিনের। ব্যবস্থাপত্র মিলছিল বিনি পয়সায়। চুম্বক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হচ্ছিল, এবং তা স্বপ্ন-মূল্যেই। প্রতিদিনের আয়টা স্বভাবতই ছিল কল্পনাতীত। ম্যাগনেটো-থেরাপিস্টের ডাক্তারী ডিগ্রিটা এক অস্তিত্বহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের। একটি বাংলা দৈনিকের পক্ষে সত্যানুসন্ধানে নেমেছিলাম। লেখায় হাজির করলাম ওঁর বুজরুকি ও বে-আইনি ব্যাপার-স্যাপার। লেখা শেষ হয়েছিল সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। তারপর কোথা থেকে কি হল—লেখাটি আজও প্রকাশের মুখ দেখেনি। পরিবর্তে শুনতে হয়েছে চুম্বক চিকিৎসা ক্যাম্পের এক ব্যবস্থাপকের বিদ্রূপ—লেখাটা পারলেন ছাপাতে?

এক ধনবান জাদুকরের একটি বিখ্যাত প্রতারণার খুঁটি-নাটি তথ্য-প্রমাণ

আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে কিছু সাংবাদিক যতটা সচেষ্ট হয়েছিলেন, প্রমাণগুলো পেতেই ততটাই নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, কোনও এক গভীর গোপন কারণে।

শুধু একটা-আধটা খবর চেপে দেওয়ার বিনিময়ে 'আলতু-ফালতু'দের অনেকেই যখন শান্তিনিকেতনে বাড়ি, কলকাতায় সাজান ফ্ল্যাট, ঝাঁ-চক্‌চকে দোকান কামিয়েছেন, তখন এই লেখক না লেখার বাজার দর কোথায় তুলতে পারতেন, চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ রাখার 'মুখ মাঙ্গে' দরটা কোথায় নিয়ে যেতে পারতেন—এটা একটু অনুমান করার চেষ্টা করুন প্রিয় পাঠক-পাঠিকা।

ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক যুক্তিবাদের যে বীজাঙ্কুর রোপিত হয়েছিল ভারত ভূমিতে, দশ বছরে তার শিকড় দ্রুত ছড়িয়েছে দেশ ও প্রতিবেশী দেশের শিরা শিরায়। যে সমাজ উত্তরণের পথে, সেখানে থাকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীসংগ্রাম। যুক্তিবাদের পথ ধরে সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগুতে আমাদের সমাজ আজ অনিবার্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের মুখোমুখি। যুক্তিবাদের এই প্রবল সম্ভাবনাময় উত্থানে সন্ত্রস্ত অসাম্যের সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তা ধনকুবের গোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক শক্তিগুলো। আর তারই পরিণতিতে আমজনতার সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাইয়ের জন্য নামান হয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, নির্বাচন নির্ভর আখের গোছান রাজনৈতিক দল, প্রচার মাধ্যম, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ এবং ধর্মীয় শিবিরকে। ওরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ময়দানে নেমেছে। পালন করে চলেছে নিজ নিজ কর্তব্য।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বিভাজিত করতে ও কালিমালিপ্ত করতে বিরোধ যাদের মূলধন, সেইসব যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বঘোষিত অভিভাবক ও প্রচার মাধ্যমের মুখেই অহরহ ঐক্যের বাণী। ওদের এই স্ববিরোধিতাকে ভণ্ডামি বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। কারণ ওদের এমন ভণ্ডামির পিছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক। ওদের কাছে 'ঐক্য' মানে একটা 'ছাঁচ'। মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সহাবস্থানের একটা ছাঁচ। 'না-যুক্তিবাদীদের' সঙ্গে 'যুক্তিবাদী'দের সহাবস্থানের একটা ছাঁচ।

যারা এই ছাঁচে নিজেদের ঢালতে রাজি নয়, লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। কাজটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।

সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে কাঁটার মুকুট মাথায় পরেই আসুন আমরা সংঘর্ষে নামি। নির্মাণ-কাজের আগে প্রয়োজনীয় সংঘর্ষে।